মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ গ্রন্থে বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বিধৃত হয়েছে। আজ যে ভূ-খণ্ডের নাম বাংলাদেশ, এক সময় তা-ই পরিচিত ছিল গঙ্গাঋদ্ধি নামে। খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিবর্তনের ধারা তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই বিবর্তন থেকে উদ্ভূত কিছু মৌল প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে।

গঙ্গাঋদ্ধি নিয়ে ইতিহাসে তেমন আলোচনা হয় নি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-উপাখ্যানে উল্লেখিত না হলেও কার্তিয়াস, দিওদোরাস, প্লুতার্ক প্রমুখ গ্রিক লেখকদের ইতিবৃত্তে, স্ট্রাবো ও টলেমির ভূগোলবৃত্তান্তে আর ভার্জিলের মহাকাব্যে এই নামটি ভাস্বর হয়ে রয়েছে। তারপর তৃতীয় শতকের শেষে বা চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে গুপ্তরাজদের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত বরেন্দ্র অঞ্চলে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই ক্ষুদ্র রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটায় বলে ধারণা করা হয়। চতুর্থ শতকে বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটে। পশ্চিম বাংলার সুসুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি থেকে জানা যায় দামোদর নদীর তীরে ছিল সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মাদের রাজধানী পুস্করণ, যার বর্তমান নাম পোখর্ণা গ্রাম। বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত ছিল এই রাজ্যের বিস্তৃতি। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা জয় করেন। সমতট প্রথমে ছিল করদ রাজ্য, পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চম শতকের অন্তর্বিদ্রোহ ও হুনদের আক্রমণের ফলে গুপ্তরাজ্য ভেঙে পড়ে। ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তর-বাংলায় গুপ্ত শাসন অব্যাহত থাকে। ৫০৭-এ সমতটের সামন্ত রাজা ছিলেন বৈন্যগুপ্ত। সপ্তম শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়্গ রাজবংশের চারজন রাজা খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ দেবখড়্গ ও রাজারাজভট্ট রাজত্ব করেন। এভাবে অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায়ের পর কিভাবে পাল সম্রাজ্যের উত্থান ঘটল, কিভাবে তাদের পতনের পর সেন রাজত্বের বিকাশ হলো এবং কিভাবে তুরস্কশক্তির আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ ঘটল— ইতিহাসের এসব যাবতীয় ঘটনা ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের জন্ম ভারতের মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের দয়ারামপুর গ্রামে, ১৯২৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯৪৫ সালে জঙ্গীপুর হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৪৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর ১৯৪৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক সম্মান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডের উর স্টার কলেজ থেকে আধুনিক ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৫৯ সালে লন্ডনের লিঙ্কন্‌স্‌-ইন থেকে ব্যারিস্টার–এট–ল ডিগ্রি লাভ করেন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও আইন বিষয়ে পাঁচ বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৬৪ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে এবং ১৯৮৫ সালের সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন । তিনি ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৯৯৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো : *যথাশব্দ* (১৯৭৪), *রবীন্দ্রপ্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার* (১৯৮৩), *মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ* (১৯৮৩), *কোরানসূত্র* (১৯৮৪), *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* (১৯৮৫), *বচন ও প্রবচন* (১৯৮৫), *রবীন্দ্ররচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যা* (১৯৮৬), *রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য* (১৯৮৬), *আমরা কি যাবো না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে* (১৯৯৬), *বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক* (১৯৯৬), *তেরই ভাদ্র শীতের জন্ম* (১৯৯৬), *কলম এখন নাগালের বাইরে* (১৯৯৬), *আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা* (১৯৯৭), *বাংলাদেশের সংবিধানের শব্দ ও খণ্ডবাক্য* (১৯৯৭), *বাংলাদেশের তারিখ* (১৯৯৮), *মনের আগাছা পুড়িয়ে* (১৯৯৮), *বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ* (১৯৯৯), *সরকার সংবিধান ও অধিকার* (১৯৯৯), *কবি তুমি নহ গুরুদেব* (১৯৯৯), *একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়* (১৯৯৯), *মৌসুমি ভাবনা* (১৯৯৯), *মিত্রাক্ষর* (২০০০), *জাগো ওঠো দাঁড়াও বাংলাদেশ* (২০০০), *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০০), *কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ* (২০০০), *চাওয়া-পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসেব* (২০০১), *স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ও বোবার স্বপ্ন* (২০০২), *রবীন্দ্ররচনায় আইনি ভাবনা* (২০০২), *বিষণ্ন বিষয় ও বাংলাদেশ* (২০০৩), *প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে* (২০০৪), *রবীন্দ্রনাথ ও সভ্যতার সংকট* (২০০৪), *সাফদেলের মহড়া* (২০০৪), *একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা* (২০০৫), *উন্নত মম শির* (২০০৫)।

তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও ২০০৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বাংলা একাডেমী

বাএ ৫০৬৭

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯২ / ডিসেম্বর ১৯৮৫। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ / জুন ২০০৮। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৯ / ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : মামুন কায়সার। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ২৬০.০০ টাকা।

GANGARIDDHI THEKE BANGLADESH [Bangladesh in History] by Muhammad Habibur Rahman. Published by Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning and Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Reprint : February 2013. Price : Taka 260.00 only.

ISBN : 984-07-5086-0

উৎসর্গ

তিন কন্যের জন্যে
রুবাবা, নুসরাত ও
রওনাক-কে

প্রসঙ্গ কথা

এখন থেকে প্রায় দেড় শতক আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, ... কতক উপন্যাস, কতক ... আমার পড়পীড়কদের জীবন চরিতমাত্র।' তাঁর অনুধাবনে ইতিহাসের মূল্য শুধু অতীতের প্রতিলিপি নয়, ভবিষ্যতের 'ভরসা'ও। তাই *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায় তাঁর উদাত্ত আহ্বান, 'আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি'।

উনিশ শতকে বাংলাভাষী অঞ্চলে আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার বিকাশ ঘটলেও বাঙালি ও বাংলার ইতহাস লেখার কাজ হয় নি। বিশের দশকে দীনেশচন্দ্র সেনের *আবহমান বাংলা* বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস* সে-অভাব অনেকটা মিটিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার আর যদুনাথ সরকারের *History of Bengal* বাংলার ইতিহাস নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাজ। তারপর নীহাররঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস*-এ দু'হাজার বছরকে উপস্থাপন করলেন সরলভাবে; অথচ তাতে ইতিহাসের পরিধি বাড়ল অনেক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তৈরি করলেন নীহাররঞ্জনের ইতিহাসের নতুন ভাষ্য—কিশোরোপযোগী করে সাধারণ পাঠকদের জন্য।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রণীত *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* এ-ধরনেরই একটি কাজ। বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম এ-গ্রন্থটি বেরিয়েছিল 'ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা'র অংশ হিসেবে। সেটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এখন যে *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি, তা একটি নতুন গ্রন্থ। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে একুশ শতকের শুরু পর্যন্ত ইতিহাসকে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান গ্রথিত করেছেন মাত্র তিনশ সাতাশ পৃষ্ঠার মধ্যে। বিস্ময়ের ব্যাপার, তাতে সংবিধান, রাজনীতি, সংসদ, প্রশাসন, আইন-আদালত, সরকার, সেনাবাহিনী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনীতি, সম্পদ, শিক্ষা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতি— কোনোকিছুর ইতিহাসই বাদ যায় নি। গ্রন্থটি গতানুগতিক ইতিহাসের আদলে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কিন্তু ready-reference হিসেবে হয়েছে অতুলনীয়।

বর্তমান প্রজন্ম মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে একটি সফল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে চেনে। সঙ্গে বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি হিসেবে। এ-সব পরিচয়ের আড়ালে অনেক সময় তাঁর ইতিহাসের অধ্যাপকের পরিচয়টি চাপা পড়ে যায়। আনন্দের বিষয়, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এখন অনেক লিখছেন। আমি নিশ্চিত, তাঁর গবেষক-লেখক পরিচয়ের নিচে অন্য সব পরিচয় গৌণ হয়ে যাবে।

'আমাদের দেশের রাজকাহিনীতে অনেক রঙ আছে, সাবধানে সে-রঙ সরিয়ে ঐতিহাসিক সত্যটি উদ্ধার করতে হবে'—গঙ্গাঋদ্ধির প্রথম পরিচ্ছেদেই কথাটি বলেছেন হাবিবুর রহমান। এই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ইতিহাস চর্চার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

বাংলা একাডেমী এ-প্রকাশনা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে গৌরবান্বিত। লেখক ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ গ্রন্থটির বর্ধিত সংস্করণে ১৯৭২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে সংযোজন করা হয়। এক্ষণে গ্রন্থটি যেমনটি ছিল তেমনটিই পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণের সময় গ্রন্থটির পরিবর্ধন-সংশোধনসহ হালনাগাদ করা সম্ভব হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাড়ি ৭-এ, সড়ক ১২৪
গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
mhrahman 1928@gmail.com

সূচিপত্র

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ

নাম ও পরিচয়

আমাদের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র। এই দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সব এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং যে সব এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হতে পারে সে সব এলাকা, সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। ১৯৭৪-এর সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইনে যে সব এলাকা অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত বলে উল্লিখিত সে সব এলাকা যথাক্রমে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত বা বাংলাদেশ থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য। এই আইনে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে আমাদের দেশের যে দীর্ঘ স্থলসীমানা রয়েছে সেই সীমান্ত অঞ্চলের ছিটমহলসহ অন্যান্য সীমানা–বিষয়ক প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৬ই মে ১৯৭৪ একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই চুক্তি এখনও চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়নি।

সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো সাংবিধানিক পদে কেউ নির্বাচিত বা নিযুক্ত হলে তাঁকে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করে নির্দিষ্ট শপথ-ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে হবে।

বাংলাদেশ তিস্তা, সুরমা, কর্ণফুলী, গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনার অববাহিকায় ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এদেশে রেনেল (১৭৭৭)–এর পূর্বে বাংলাদেশের কোনো মানচিত্র অঙ্কিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে জন ম্যাকের নেতৃত্বে বাংলা ভাষায় প্রথম মানচিত্র রচিত হয়। দেশকে ভালোবেসে বাংলার তরুণেরা স্বাধীনতার পতাকায় দেশের মানচিত্রকে স্থান দিয়েছিলেন। ব্যবহারিক দিক থেকে সেই মানচিত্র-লাঞ্ছিত পতাকাটি ছিল অসুবিধাজনক। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রের মানচিত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্থান সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর দেশের পতাকায় সেই মানচিত্র রক্ষা করার আর তেমন কোনো প্রয়োজন রইল না। জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্র ও তার ওপরে রক্তবর্ণের ভরাট বৃত্তটিকে ঘিরে রয়েছে আমাদের অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

জন্মের সময় আমরা আমাদের দেশের নাম দিয়াছিলাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। ছোট্ট করে আমরা আমাদের দেশকে 'বাংলা' বলে ডাকি, আদর করে বলি 'সোনার বাংলা'। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বেঁধেছিলেন। দেড়শ' বছর আগে যখন এই দেশে নীলচাষের বিরুদ্ধে মানুষের মন ক্ষেপে উঠেছিল, তখন 'নীলবাঁদরে সোনার বাংলা করে ছারখার' গানটার বেশ চল ছিল। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' আছে, 'হ্যালো সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমান'।

ভাষা বা জাতির সঙ্গে দেশ যোগ করে বহু দেশের নাম দেওয়া হয়েছে, আরবদের আরাবিয়া, ইংরেজদের ইংল্যান্ড, জার্মানদের ডয়েচলানট্ ইত্যাদি। ইংল্যান্ডকে ফরাসিরা বলে লাং়লেত্র্ । 'ল্যান্ড', 'লানট্', 'তের' স্থল ও দেশ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা 'বাংলা'র সঙ্গে 'দেশ' যোগ করেছি। সরকারি দলিলে এই নামকরণ হয়েছে ১৯৭১-এ। বেসরকারিভাবে এই নামের চল আরও একটু পুরোনো।

ইউরোপীয়দের বেঙ্গলা/বেঙ্গল, আরব-তুর্কি-মোগলদের বানজালা/বাঙ্গালা, চীনাদের মানচালা ইতিহাস ভূগোলে বহুদিন থেকে পরিচিত। আমাদের দেশের নামে দক্ষিণে যে সাগরটা রয়েছে তার উত্তরে যে ভূখণ্ডটি হিমালয়ের কোল পর্যন্ত পৌঁছেছে, ১৯৪৭-এর পূর্বে সাধারণভাবে তাকেই বাংলাদেশ বলা হতো। আমরাও তাই বলব। ১৯৪৭-এর পর 'বাংলাদেশ' বলতে বোঝাবে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে।

বাংলার উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বের উঁচু জমিগুলোই ছিল এখানকার সভ্যতার আদি বাস্তুভিটা। প্রাচীন জনপদ-কাহিনী আমরা সুহ্ম দিয়ে শুরু করি।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে আমরা যে সুহ্ম জনপদের উল্লেখ পাই তা ছিল পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশে। অজয় নদীর দক্ষিণে ছিল সুহ্ম/সুহ্মভূমি, পরবর্তীকালের দক্ষিণ রাঢ়, এবং উত্তরে ছিল সুহ্মোত্তর/ব্রহ্মোত্তর/বজ্রভূমি, পরবর্তীকালের উত্তর রাঢ়। উত্তর বাংলায় আরও খোঁড়াখুঁড়ি হলে হয়ত দেখা যাবে পুণ্ড্রই ছিল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ। পুন্ড্ররা শাক্-সবজি ও আখের চাষ করত। আখচাষ যাদের জীবিকা তাদেরকে মুর্শিদাবাদ-মালদহ অঞ্চলে এখনো পুঁড়্যা বলা হয়। পুণ্ড্রর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নগর ছিল পুণ্ড্রনগর, বর্তমান মহাস্থান। পুণ্ড্রের অপর দুটি প্রাচীন কেন্দ্র সোমপুর ও কোটিবর্ষ, বর্তমান বানগড়। পুণ্ড্র নামের কালক্রমে ব্যাপ্তি ঘটে এবং এক সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ পুণ্ড্রদেশ বলে পরিগণিত হয়। গঙ্গার উত্তরে ও করতোয়ার দক্ষিণে ছিল বরেন্দ্র পালরাজদের 'জনকভূ'।

ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চল হয়ত আখের জন্মভূমি। সাদামাটা 'গুড়' শব্দ থেকে কি 'গৌড়' নামের উৎপত্তি? একসময় বঙ্গ থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। 'গৌড়েশ্বর' নাম পরবর্তীকালে দিল্লিশ্বরের মতো গুরুত্ব লাভ করে। লক্ষ্মণসেন গৌড় থেকে বঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরও পরবর্তী সেনরাজারা 'গৌড়াধিপতি' উপাধির মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। এই গৌড়কে শশাঙ্কের সময় কর্ণসুবর্ণ বলা হয়। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। কর্ণসুবর্ণ ও রক্তমৃত্তিকার অপভ্রংশ নাম আজ ভাগীরথী তীরে কানসোনা ও রাঙ্গামাটি গ্রাম। সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ের অক্ষরডম্বর ও সংগীতে গৌড় রাগিণী গৌড়ের সমৃদ্ধ যুগের স্মৃতি বহন করছে।

বঙ্গের কথা আমরা শেষে উল্লেখ করব। তার আগে সমতটের কথা বলি। চতুর্থ শতক থেকে আমরা সমতটের উল্লেখ পাই। সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং এসেছিলেন সমতটে। মেঘনার পূর্বাঞ্চলে বর্তমান কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালির কিছু অংশ নিয়ে ছিল সেকালের সমতট। এই সমতটে রাজত্ব করেছেন চন্দ্র বংশ ও

খড়গ বংশের রাজারা। খড়দের রাজধানী ছিল কর্মান্তনগর, বর্তমানে বড়কামতা গ্রাম। এক সময় সমতটেশ্বরের রাজনৈতিক প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে, সমতট ও বঙ্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সমতটের লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের কাছে ছিল পট্টিকের/পট্টিকেরা রাজ্য।

সপ্তম শতকে বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালির দক্ষিণ-পূর্বে ছিল হরিকেল রাজ্য। চট্টগ্রাম এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম শতকে এই অঞ্চলে কান্তিদেব রাজত্ব করতেন। দশম-একাদশ শতকে চন্দ্ররাজদের উত্থানকালে হরিকেল বলতে সমগ্র বঙ্গকেও বোঝাত। তান্ত্রিক পীঠস্থান হরিকেল বলতে অবশ্য শ্রীহট্টকে বোঝায়।

গঙ্গার দুই প্রধান স্রোত, ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল বঙ্গনামে পরিচিত প্রায় গত তিন হাজার বছর ধরে। বঙ্গের এক অংশকে নাব্যও বলা হতো; চলতি কথায় আমরা ভাটি বলে থাকি। দক্ষিণ বঙ্গকে এক সময় উপবঙ্গ ও অনুত্তর বঙ্গ বলা হতো।

ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রে আছে, বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অন্ধমুনি দীর্ঘতমার ঔরসে নাকি পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম হয়—অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও সুহ্ম। ব্রাত্যজনের চরিত্রহননের জন্য এটি একটা চিত্তাকর্ষক ব্রাহ্মণ্য-প্রচার। মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীটা সাদামাটা। মহাপ্লাবনের নায়ক পয়গম্বর নুহের পুত্র ছিল হাম, হামের পুত্র ছিল হিন্দ এবং হিন্দের পুত্র ছিল বঙ্গ। বঙ্গ বঙ্গে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্থানমাহাত্ম্যের কাহিনী এই পর্যন্ত।

বঙ্গ শব্দের এক অর্থ কার্পাসতুলো। বঙ্গে কার্পাস জন্মাত বলে কি এদেশের নাম বঙ্গ, না বঙ্গে কার্পাস হতো বলে কার্পাসতুলোর আর এক নাম বঙ্গ?

অনেকে বলেন ভোট-চীন বা তিব্বতী ভাষায় 'বং' বা 'বন' (জলাভূমি) থেকে বঙ্গ নামের উৎপত্তি। পুরাকালে সুন্দরবনের উত্তর ও পূর্ব ভূখণ্ডটি ছিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। সেই বন কেটেই মানুষ বসতি করেছে ও গাঁ বসিয়েছে। আমাদের মনে হয় এই প্রাগ্রসর 'বন'ই বঙ্গের আদিরূপ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে উল্লিখিত বঙ্গাল হয় বঙ্গের সমার্থক শব্দ, নয় তা সমুদ্র-তীরবর্তী বঙ্গের অপর নাম। ত্রয়োদশ শতকে বাঙ্গালা নামে একক কোনো দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ বরেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন এবং বঙ্গকে লক্ষ্ণৌতি থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনি ইকলিমে/দিয়ারে লক্ষ্ণৌতির সঙ্গে ইকলিমে/দিয়ারে বাঙ্গালার উল্লেখ করেছেন। ক্রমে আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাঙ্গালার পরিচয় বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক শামশি সিরাজ আফিফ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে ইংলন্ডেরশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা করার মতো শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের শাহ-ই-বাঙ্গালা নামকরণ সে যুগের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পর্তুগিজদের বদৌলতে ইউরোপে বেঙ্গলা সুপরিচিত হলো। মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সুবা-বাঙ্গালা চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত চার'শ ক্রোশ ও উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে হুগলীর মান্দারণ পর্যন্ত দু'শ ক্রোশ

বিস্তৃত ছিল। আবুল ফজলের মতে প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া আল নির্মাণ করতেন এবং সেই আল থেকে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। আমরা মনে করি, বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' যোগ করে বঙ্গাল/বাঙ্গাল বলতে বঙ্গের অধিবাসীকেই বোঝাত। আর সেই বাঙ্গালদের দেশ আরবি-ফার্সি ভাষায় বানজালা/বাঙ্গালা রূপ নিল। রোমান, ডেন, অ্যাংগলস, জুটস্, স্যাকসন, নর্মান-ফ্রেঞ্চ বিভিন্ন জাত এসে ইংল্যান্ডের আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত অ্যাংগলসের ছাপটাই বড় হয়ে রইল, তাদের নামেই দেশের ভাষা ও দেশের নাম বাইরে পরিচিতি লাভ করল। আমাদের দেশেও তেমনি বহু জনপদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গা/বঙ্গাল/বাঙ্গাল–এর নামানুসারেই দেশের ভাষা ও দেশের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করছে। এর প্রধান কারণ বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান। উপকূলবাসী বঙ্গাল/বাঙ্গালদের সঙ্গে বিদেশি বণিক-সওদাগরের যে প্রথম পরিচয় ঘটে, সেই পরিচয়েই তাঁরা দেশের পশ্চাদভূমি চিনতে শুরু করেন।

২. ইতিহাসের ছিন্নপত্র

আমাদের দেশের লিখিত ইতিহাসের হাতেখড়ি যবনদের—সদর্থে গ্রিকদের হাতে। ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে আমাদের ইতিহাসের সন-তারিখ সব প্রায়ই আনুমানিক। তুরস্কদের আগমনের পূর্বে জ্যোতির্বিদ্যা বর্ষপঞ্জি-ঠিকুজি সম্পর্কে পণ্ডিতরা চুলচেরা চর্চা করলেও তখন তিথিবারে কৌতূহল ছিল সীমাবদ্ধ। সঠিক সন–তারিখ নির্ধারণে কোনো উৎসাহ ছিল না। কৃত্তিবাস 'আদিত্যবার শ্রী-পঞ্চমি পূণ্য মাঘ মাসে' জন্মে ছিলেন জানা থাকলেও তাঁর সঠিক জন্মতারিখ বের করতে পণ্ডিতদের হিমশিম খেতে হয়েছে। 'সন' ও 'তারিখ' আরবি শব্দ, 'সাল' ফার্সি। তারিখ-এর বহুবচন তাওয়ারিখ, যার এক অর্থ ইতিহাস।

পৃথিবীর বহুদেশের ইতিহাস পুরাণ-উপাখ্যান দিয়ে শুরু। সিংহলী পালি গ্রন্থ 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশে' উল্লেখ আছে, দুর্বিনীত রাজকুমার বিজয় সিংহ পিতা সীহবাহু কর্তৃক 'লাঢ়' দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সাত-আট'শ সঙ্গী নিয়ে লঙ্কা দ্বীপে উপস্থিত হন (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৪)। বাঙালি বিজয় কর্তৃক হেলায় লঙ্কাজয়ের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উপরোক্ত 'লাঢ়' নাকি পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় নয়। সেই 'লাঢ়' গুজরাটের সঙ্গে সনাক্ত হওয়ার পর এখন শুনি, বিজয় সিংহ নাগদ্বীপ-মহিলাদ্বীপ হয়ে দক্ষিণ গুজরাটের সুপ্রা বন্দরে পৌছেন এবং সুপ্রা থেকে ব্রোচ হয়ে লঙ্কা দ্বীপে যক্ষদের হত্যা করে লঙ্কার নাম পালটে সিংহল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাভারতে উল্লিখিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বঙ্গের চন্দ্রসেন, পুণ্ড্রের বাসুদেব ও তাম্রলিপির রাজা উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট জরাসন্ধের মৃত্যুর পর বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে আসে। বাসুদেব ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করে ভীম সমুদ্র-তীরবর্তী ম্লেচ্ছদের শায়েস্তা করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হাতে মারা পড়লে বঙ্গ ও পুণ্ড্র পাণ্ডবদের করতলগত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ দুর্যোধনের পক্ষ নেন। পাণ্ডবপক্ষ না নেওয়ার জন্যই কি বঙ্গ পাণ্ডববর্জিত দেশ? রামায়ণে অযোধ্যা রাজ্যের

সঙ্গে বঙ্গরাজদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে। রামের অভিষেক ক্ষুব্ধ কৈকেয়ীর মানভঞ্জনের জন্য বঙ্গ-সামগ্রীর প্রতিশ্রুতি দেন রাজা দশরথ।

মহাভারত ও রামায়ণের মূল উপাখ্যান তিন হাজার বছরের পুরোনো। একদিক থেকে সমাজ ও জীবনকে বোঝার জন্য উপাখ্যান ইতিহাসের চেয়ে বড় সত্য। কিন্তু ইতিহাসবিদ বেরসিক, সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেলে তাঁর মুখে কথা ফোটে না। মাটি খুঁড়ে তিনি দেশের আঁতের খবর জানতে চান। জেরা না করে কোনো কিছু গ্রহণ করতে তিনি নারাজ। ইতিহাস-রচনায় ব্যাস বা বাল্মীকিকে সাক্ষ্য মেনে তাঁদের কবিকল্পনাকে আমরা নাইবা বিব্রত করলাম।

দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন মাসিডোনিয়ার সেকান্দার শাহ, ইংরেজি পাঠকদের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। খ্রিষ্টপূর্বে ৩২৬ অব্দে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর আর এগুনো সম্ভব হলো না। তাঁর শিবিরে খবর পৌঁছলো, পূর্বে প্রাসিয়াই বলে এক দেশ আছে, আর সেই দেশের পূর্বে গঙ্গারিডি বলে আর একটা দেশ আছে। গঙ্গারিডির রণহস্তির জন্য কোনো রাজা সেই দেশ জয় করতে পারেননি। এ খবর পেয়ে সেকান্দার শাহের জয়ের নেশা বাড়ল, কিন্তু রণক্লান্ত সৈন্যদের তিনি মানাতে পারলেন না, ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। ঐতিহাসিক ক্যালিসথিনিস তাঁর পাণ্ডুলিপি সেকান্দার শাহের সামনে রেখে ভেবেছিলেন রাজা খুশি হবেন। প্রশস্তিকারের অতিরঞ্জনে বিরক্ত হয়ে পাণ্ডুলিপিটা সেকান্দার শাহ সিন্ধু নদে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদের বললেন, 'পাণ্ডুলিপির সঙ্গে লেখককেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে মন্দ হয় না।' সেকান্দার শাহ ব্যতিক্রম, রাজারা সাধারণত প্রশস্তিতে তুষ্ট হন। আমাদের দেশের রাজকাহিনীতে অনেক রঙ আছে, সাবধানে সে-রঙ সরিয়ে ঐতিহাসিক সত্যটি উদ্ধার করতে হবে।

প্রাসিয়াই (প্রাচ্য) ছিল আমাদের দেশের ঠিক পশ্চিমে। 'প্রাসিয়াই', 'গঙ্গারিডি' ভৌগোলিক নামগুলো সংস্কৃতভাষীদের কাছে থেকে বোধ হয় গ্রিকরা পেয়েছিলেন। গঙ্গারিডির নানাভাবে লিপ্যন্তর হয়েছে—গঙ্গাহৃদি, গঙ্গাহৃদয়, গঙ্গারাষ্ট্র, গঙ্গারাঢ় ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় গঙ্গার ঋদ্ধিপ্রাপ্ত অঞ্চলকে গঙ্গাঋদ্ধি বলা হতো। আমরা তাই বলব।

সেকান্দার শাহের ভারত আক্রমণের সময় গঙ্গাঋদ্ধি ও প্রাচ্য দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল, না নন্দরাজদের অধীনে তারা একরাজ্যভুক্ত হয়? হয়ত নন্দরাজদের প্রথম উত্থান ঘটে গঙ্গাঋদ্ধি অঞ্চলে এবং পরে তাঁরা উত্তরাপথের আকর্ষণে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন, যেমন করেছিলেন পরবর্তীকালের বরেন্দ্রের রাজারা। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে উত্তর-বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কৌটিল্য গৌড়ের উল্লেখ করেছেন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মৌর্যশক্তি বিস্তার করেছিল এমন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। বাংলায় অশোকের কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। য়ুয়ান-চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপি ও সমতটে অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার লক্ষ করেছিলেন। কথিত আছে, অশোক বৌদ্ধদের প্রধান প্রতিপক্ষ নিয়তিবাদী-সন্ন্যাসবিমুখ বহু আজীবিকদের হত্যা করেছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে।

খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গ্রিক ও মিশরীয় লেখায় আবার আমরা গঙ্গাঋদ্ধির উল্লেখ দেখি। তখন বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর গাঙ্গে ছিল গঙ্গাঋদ্ধির রাজধানী। তাম্রলিপির বেশ কিছু দক্ষিণ-পূর্বে কুমার নদের মোহনায় ছিল সেই বন্দরনগরী। কেউ কেউ বলেন, কলকাতা থেকে ৩৫ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে ভাগীরথীর অন্যতম প্রবাহ বিদ্যাধারী নদীর ধারে অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থলটি পেরিপ্লাস ও টলেমি কর্তৃক উল্লিখিত 'গাঙ্গে' কিনা তা নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করার অপেক্ষায়। খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে অষ্টম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাক-উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের স্তর থেকে পাল যুগের মোট পাঁচটি পৃথক সাংস্কৃতিক প্রত্নিনিদর্শন পাওয়া গেছে। সেই বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে মসলিন কাপড় রপ্তানি করা হতো। রাজধানীর কাছে ছিল সোনার খনি। ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলের সুবর্ণবীথি, সুবর্ণগ্রাম, সোনারঙ্গ, সোনাকান্দি কি সেই সুবর্ণস্মৃতি বহন করছে? তৃতীয় শতাব্দীর চীনাগ্রন্থ ওয়ে লুয়োয়া (Wei-lueh) বঙ্গকে ফান ইউওয়া (Pan yueh)-কে হান ইউওয়া (Han yueh) বা শাংইওয়া (Xan-ywat) গঙ্গার একটি দেশ বলে উল্লেখ করে।

ইতিহাসে গঙ্গাঋদ্ধি এখনও অনালোচিত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-পুরাণ-উপাখ্যানে উপেক্ষিত গঙ্গাঋদ্ধি ভাস্বর হয়ে রয়েছে কার্তিয়াস, দিওদোদোরাস, প্লুতার্ক প্রমুখ গ্রিক লেখকদের ইতিবৃত্তে, স্ট্রাবো ও টলেমির ভূগোলবৃত্তান্তে, আর ভার্জিলের মহাকাব্যে। ভার্জিল ভেবেছিলেন তাঁর জন্মভূমি মালটুয়ায় ফিরে গিয়ে এক মর্মর মন্দির স্থাপন করবেন এবং মন্দির চূড়ায় স্বর্ণ-গজ-দন্তে গেঁথে দেবেন গঙ্গাঋদ্ধির বীরত্ব-গাথা।

এরপর প্রায় দুইশ বছরের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তৃতীয় শতকের শেষে বা চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে গুপ্তরাজদের আদি পুরুষ শ্রীগুপ্ত কি বরেন্দ্র অঞ্চলে এক ক্ষুদ্ররাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেই ক্ষুদ্র রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটায়?

চতুর্থ শতকে বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটে। পশ্চিম বাংলার সুসুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি থেকে আমরা জানি, দামোদর তীরে ছিল সিংহবর্মা ও চন্দ্রাবর্মাদের রাজধানী পুস্করণ, বর্তমান পোখর্ণা গ্রাম। বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত ছিল এই রাজ্যের বিস্তৃতি। সমুদ্রগুপ্ত চন্দবর্মাকে পরাজিত করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা জয় করেন। সমতট প্রথমে ছিল করদ রাজ্য, পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পঞ্চম শতকে অন্তর্বিদ্রোহ ও হুন আক্রমণের ফলে গুপ্তরাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উত্তর-বাংলার গুপ্ত শাসন অব্যাহত ছিল। ৫০৭-এ সমতটের সামন্ত রাজা ছিলেন বৈন্যগুপ্ত। ত্রিপুর ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন।

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে কিছুকালের জন্য বাংলা মালবরাজ যশোধর্মনের স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শতকে সমতট ও রাঢ়ের কতকাংশে গোপচন্দ্র এক পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা পর্যন্ত সেই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য সমাচারদেব, পৃথুবীর ও শ্রী সুধন্যাদিত্য কিছুকাল রাজত্ব করেন। এঁদের স্বর্ণমুদ্রা এক সমৃদ্ধ কালের স্মৃতি বহন করছে।

পরবর্তী গুপ্তবংশের গুপ্তনামধারী রাজাদের ছত্রছায়ায় ইতোমধ্যে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুপ্তদের পরম শত্রু মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা এক অভিযানে গৌড়বাসীকে নাকি সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন, পরে অবশ্য ঈশানবর্মা কুমারগুপ্তের নিকট পরাজিত হন।

ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ (৫৬৭-৫৯৭)-এর আক্রমণে বঙ্গের গোপচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অবসান ঘটে ও গৌড় ভেঙে পড়ে। তিব্বতরাজ স্রং-সান (৫৮১-৬০০) উত্তর বাংলায় হামলা চালালে গৌড়ের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। গৌড়ে মহাসামন্ত শশাঙ্কের উত্থান এই দুর্দশার অবসান ঘটায়।

সপ্তম শতক থেকে শুরু হলো সামন্ত যুগের। প্রথমে সীমান্ত রক্ষার্থে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সামন্ত বলা হতো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রাতিগ শক্তি দুর্বল হওয়ার পর 'সামন্ত' শব্দের ব্যাপ্তি ঘটে। রাজ্যের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উপরাজা বা বহির্রাজ্যের করদমিত্রও সামন্ত নামে অভিহিত হতে লাগল। এই সামন্তপ্রথা নানারূপ নিয়ে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত টিকে থাকল। ইউরোপীয় সামন্তবাদ থেকে এই প্রথা স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে আনুগত্যের স্তরবিন্যাসে তেমন কোনো বাঁধাধরা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তরা মহাসামন্ত বা মহারাজা হয়ে স্বীয় অঞ্চলে রাজার মতো কর্তৃত্ব করতেন।

ষষ্ঠ শতকের শেষ থেকে সপ্তম শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত শশাঙ্কের প্রতিপত্তিকাল। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকায় ছিল তাঁর রাজধানী। পশ্চিমে মগধ ও প্রয়াগ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান উড়িষ্যার মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি। পূর্ববাংলায় শশাঙ্কের কি প্রভাব ছিল আমরা জানি না। গৌড়-বরেন্দ্রের রাজারা পূর্বের চেয়ে পশ্চিমে, উত্তরাপথের দিকে আকৃষ্ট হতো বেশি। কনৌজের মৌখরিদের মোকাবেলা করার জন্য শশাঙ্ক মালবরাজের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। অপরদিকে কামরূপ-রাজ শশাঙ্কের হাতে মার খেয়ে থানেশ্বরের সঙ্গে জোট বাঁধেন। থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধন মালবরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত করলে শশাঙ্ক তাঁর মিত্রের সাহায্যে এগিয়ে যান। 'সত্যানুরোধে শত্রুভবনে' রাজ্যবর্ধন নিহত হন। তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিবেন বলে রাজ্যবর্ধনকে আমন্ত্রণ করে শশাঙ্ক তাঁকে নিহত করেন কিনা তা আজও বিতর্কিত। শিব-উপাসক শশাঙ্কের বিরুদ্ধে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াং-এর অভিযোগ, শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর খুব নিপীড়ন করতেন। গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করার পাপেই নাকি শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত দেখা দেয় এবং তিনি কঠিন যন্ত্রণায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

হর্ষবর্ধন পুণ্ড্রনগরী আক্রমণ করে শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। কিন্তু সেই বর্বর দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পেয়ে তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরে যান। হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপের ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণে বিজয় ছাউনি সন্নিবেশ করেন। দুই মিত্রের দেখা হয় কজঙ্গলে, বর্তমান রাজমহলে। হর্ষবর্ধন কনৌজরাজ যশোবর্ধনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের রাজছত্র কনৌজ ও কামরূপের মাঝে হাতবদল হয়। তিব্বতরাজ ওয়ান হিয়েন সে ৬৪৭-৬৪৮ সনে গৌড় আক্রমণ করেন। ৬৫৩-৬৫৪-এর

কোনো এক সময় তিব্বতরাজ স্রং-সান-গাম্পোর কাছে গৌড়রাজ জয়নাগ পরাজিত হন। মগধের রাজা আদিত্য সেন গৌড় দখল করে নেন। তাঁর বংশধররা বেশ কিছু সময় গৌড়ে রাজত্ব করেন।

উত্তর ও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতন পূর্ব-বাংলায় তেমন কোনো ছায়াপাত করেনি। সপ্তম শতকে সমতটে ভদ্র রাজবংশের অভ্যুদয়। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এক ভদ্ররাজকন্যা বিবাহ করেন। নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত শিলভদ্র এই ভদ্রবংশের সন্তান।

সপ্তম শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়গ রাজবংশের চারজন রাজা খড়গোদ্যম,জাতখড়গ, দেবখড়গ ও রাজারাজভট্ট রাজত্ব করেন। এঁদের সঙ্গে ভদ্রবংশের কি সম্পর্ক তা আমরা জানি না। এঁদের রাজধানী ছিল বর্তমান কুমিল্লার বাদকামতার কাছে কর্মান্তবাসকে।

প্রায় এই সময় ত্রিপুরা অঞ্চলে লোকনাথ ও তার বংশধররা প্রভুত্ব বিস্তার করেন। সমতটে শ্রীজীবধারণ রাত এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র শ্রীধারণ রাত নিজেকে সমতটেশ্বর উপাধিতে আখ্যাত করেছেন। তাঁর পুত্রের নাম বলধারণ রাত। লোকনাথ রাতেরা হয়ত প্রথম খড়গ রাজদের সামন্ত ছিলেন এবং পরে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

তারনাথের ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যে চন্দ্র রাজাদের উল্লেখ দেখি, তাঁদের সম্বন্ধে আমরা এইটুকুই জানি যে, এই বংশের শেষ দুই রাজা ছিলেন গোপীচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র। উপাখ্যানে-গীতিকাব্যে কথিত আছে, মাতা ময়নামতির আদেশে গোপীচন্দ্র তাঁর দুই রানী অদুনা ও পদুনাকে পরিত্যাগ করে তান্ত্রিক হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ললিতচন্দ্র যশোবর্মার কাছে পরাজিত হলে চন্দ্রবংশ লোপ পায়।

সপ্তম শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে দেববংশের উত্থান ঘটে। এই বংশের চারজন রাজার নাম—শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব—ছাড়া আমরা বেশি কিছু জানি না। ময়নামতির আনন্দরাজার প্রাসাদ এঁদের স্মৃতি বহন করছে। লক্ষণীয়, বঙ্গ বা সমতটের এই রাজবংশগুলো উত্তর বা পশ্চিম বাংলায় তেমন কোনো প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ একাধিক বহিরাক্রমণে বিপর্যস্ত হয়। শৈলবংশের রাজারা উত্তর ভারতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁরা উত্তর বাংলা দখল করে নেন। কনৌজের যশোবর্মা (৭২৫-৭৫২) মগধ ও গৌড় জয় করে বঙ্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেন ও রাজারাজভট্টকে পরাজিত করেন। পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য তাঁকে পরাজিত করে গৌড় দখল করেন। তিনি বিষ্ণুমূর্তি স্পর্শ করে গৌড়রাজকে অভয় দিয়ে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হত্যা করেন। এর প্রতিশোধে কয়েকজন রাজভক্ত গৌড়জন বিষ্ণুমূর্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীর বেশে কাশ্মীরে যান, কিন্তু ভুল করে অন্য মূর্তি ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রাণ হারান। কহ্লণ তাঁর *রাজতরঙ্গিনী*তে বাঙালি প্রভুভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পুণ্ড্রনগরীর সামন্তরাজা জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাভূত

করেন। কহ্লণের এই কাহিনী সত্য হলে, বলতে হবে গৌড় তখন একাধিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপালের রাজা দ্বিতীয় জয়দেবও দাবি করেছেন তাঁর শ্বশুর শ্রীহর্ষ গৌড়, ওড্র ও কলিঙ্গ জয় করেন। মহাস্থানের বৈরাগীভিটার পালস্তর ও গুপ্তস্তরের পরতে পরতে যে জঞ্জাল দেখা যায়, তা একাধিক বহিরাক্রমণেরই ইঙ্গিত দেয়।

৩. পালসাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায়ের কথা বলতে গিয়ে তারনাথ বলছেন, পাঁচটি প্রাচ্যদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বণিক প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় রাজা বনে গেলেন, কিন্তু দেশে কোনো রাজা রইল না। বড় মাছ ছোট মাছ যেভাবে খেয়ে ফেলে, মানব সমাজে অনুরূপ অবস্থা মাৎস্যন্যায় নামে চিত্রিত। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে গোপাল (৭৫৬-৭৮১) রাজা হলেন। তারনাথের কাহিনী মতে, প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্বাচিত হতেন, কিন্তু এক নাগিনী পুরোনো এক রাজার রানীর (গোপীচন্দ্রের, না ললিতচন্দ্রের) কায়া ধরে রাক্ষসী সেজে রাজাকে হত্যা করতেন। কয়েকবার এ ধরনের ঘটনার পর চূড়াদেবীর এক ভক্ত এই রাক্ষসীকে বধ করে যখন পর পর সাতদিন রাজা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে টিকে গেলেন, লোকে তাকে সত্যিকারের রাজা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর নাম দিলেন গোপাল।

গোপালের পুত্র ধর্মপালের তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে, মাৎস্যন্যায় দূর করার জন্য 'প্রকৃতি' গোপালকে লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করান। এই থেকে রাজা গোপালের নির্বাচনের কথা উঠেছে। যেন দার্শনিক হবস বর্ণিত 'কদর্য ক্রুর ও খর্ব' জীবনের অবসানকল্পে রাজার সঙ্গে প্রজার সমাজচুক্তি হলো। 'প্রকৃতি' শব্দটি বহ্বার্থক। 'প্রকৃতি' শব্দচ্ছটায় রয়েছে ভূপতি, স্বামী, পুরোধা, প্রধান অমাত্য, সচিব, সহায়, কোষাধ্যক্ষ, সুমন্ত্রক, মন্ত্রী, প্রতিনিধি, দূত, ধর্মাধ্যক্ষ, পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, প্রাড়, বিবাক, ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য, প্রজা, পৌরশ্রেণী। মহাপ্লাবনের শেষে বৈবস্বত মনুর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি সেকালে অতি পরিচিত ছিল। গোপালের অভ্যুত্থানকে লোকচক্ষে শ্রীমণ্ডিত করার জন্য পাল প্রশস্তিকার সেই কাহিনীর আশ্রয় নেন। অতীতের অবচেতনসমীক্ষায় আমরা অনেক সময় বর্তমান কালের চেতনা দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকি।

গৌড় ও মগধে গোপাল যে শক্তিশালী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁর বদৌলতে ধর্মপালের পক্ষে আর্যাবর্তের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠল।

অষ্টম শতকের শেষভাগে উত্তরাপথের কর্তৃত্ব নিয়ে দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূট, মালব-রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহার ও বরেন্দ্রের পালদের মধ্যে একাধিক নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। এই শতকের শেষ দশকে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে সেই নাটকের প্রথম অঙ্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ধর্মপাল (৭৮১-৮২১) পরাভূত হন প্রতিহাররাজ বৎসর কাছে, কিন্তু পরে দু'জনই মার খান রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ধারাবর্ষের হাতে। ধারাবর্ষ গৌড়ের শ্বেতছত্র ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণাপথ ফিরে গেলেন। ধর্মপাল যুদ্ধে হেরে গিয়েও যেন জিতে গেলেন, আর্যাবর্তে রয়ে গেলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি কনৌজের ইন্দ্ররাজ ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে তাঁর অধীন রাজ্য হিসেবে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গ জয় করে চক্রায়ুধকে উৎখাত করলেন। নাগভট্ট এক বিষম যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করলেও পরে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে হেরে গেলেন। রাষ্ট্রকূট রাজপরিবারের রন্নাদেবীকে ধর্মপাল বিয়ে করেছিলেন। গোবিন্দ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজিত রাজ্য পেছনে ফেলে গৃহরাজ্যে ফিরে গেলেন। ত্রিশক্তি পরীক্ষায় দু'দুবার হেরে গিয়েও আর্যাবর্তে ধর্মপাল রয়ে গেলেন নিষ্কণ্টক। খালিমপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে কনৌজের এক অভিষেক-দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীর জনপদের নরপালগণ ধর্মপালের অধিরাজত্ব স্বীকার করে তাকে রাজচক্রবর্তী সম্ভাষণে অভিবাদন করেন। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে, ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বের হয়ে কেদার, গোকর্ণ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম দর্শন করেন। স্বয়ম্ভূপুরাণের মতে ধর্মপাল নেপালের সিংহাসনেও আরোহন করেন। একাদশ শতাব্দীর 'উদয়-সুন্দরী-কথা'র রচয়িতা সোড্ঢল যদিও বলছেন, ধর্মপাল বলভি বংশের শিলাদিত্যের হস্তে একবার বন্দি হন, তবু তিনি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলেই অভিহিত করেছেন।

পঙ্ক্তি, মাত্রা ও ছন্দের খাতিরে অশ্বমেধযজ্ঞের বর্ণনায় চক্রবর্তীধামের সর্বজনস্বীকৃত ভৌগোলিক চৌহদ্দির উল্লেখ করতে গিয়ে পাল প্রশস্তিকাররা অতিরঞ্জনের এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন। ধর্মপালের ইতিহাস সেই অতিরঞ্জনে তেমন দূষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর পূর্বে বাংলার কোনো রাজা বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ফার্সি কেতাব 'হুদুদুল আলম'-এ উল্লেখ রয়েছে, ধর্মপাল কাউকে তাঁর চেয়ে শ্রেয় মনে করতেন না। আরবি ভ্রমণবৃত্তান্তে বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানে পাল সৈন্যদলই ছিল সর্বগরিষ্ঠ। সৈন্যদের কাপড়-চোপড় ধোলাই করার জন্যই লাগত দশ-পনেরো হাজার লোকলস্কর।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১) প্রতিহাররাজ রামভদ্রর দুর্বলতা ও রাষ্ট্রকূটরাজ আমোঘবর্ষের তারুণ্য ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার সম্প্রসারণনীতি অনুসরণ করেন। ধর্মপালের চেয়ে তাঁর পুত্রের গুণকীর্তনে পাল প্রশস্তিকাররা পঞ্চমুখ : দেবপাল হুণগর্ব খর্ব করে দ্রাবিড় ও গুর্জর প্রতিহারদের দর্পচূর্ণ করে আসমুদ্রমেদিনী পদানত করেন। রামচন্দ্রের পুত্র মিহির ভোজ ৮৩৬-এ কনৌজ দখল করে নিলেও পরে রাষ্ট্রকূটদের কাছে মার খেয়ে রাজপুতানা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। দেবপাল প্রতিহারদেরও প্রতিহত করেন। তিনি উৎকল দেশ জয় করে দক্ষিণাপথে পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হন। মালব বা হিমালয় অঞ্চলে কোনো হুণরাজকেও হয়তো তিনি পরাজিত করেন। কামরূপরাজ বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস না করে দেবপালের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। নালন্দায় শৈলেন্দ্র মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য দেবপাল জাভা ও সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেবকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পালদের মধ্যে হয়তো গৃহবিবাদ শুরু হয়। ধর্মপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাঁর ভ্রাতা বাক্‌পাল। বাক্‌পাল ও তাঁর পুত্র জয়পাল যোদ্ধা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল দেবপালের উত্তরাধিকারী শূরপালকে সরিয়ে সিংহাসন অধিকার করেন। এই গৃহবিবাদের ফলে পালদের পতন

শুরু হলো। বিগ্রহপাল (৮৬১-৮৬৬) পুত্র নারায়ণ পালের (৮৬৬-৯২০) হস্তে রাজ্যভার দান করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন।

ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গের বংশধররা এই সময় রাষ্ট্রকর্মে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। ক্ষত্রধর্মের পরিবর্তে যাগযজ্ঞের ঢাক বাজলো বেশি। অঙ্গ, বঙ্গ, মগধে খণ্ড খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠলো। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের কাছে নারায়ণপাল নতি স্বীকার করলেন। উড়িষার শুল্কিরাজ রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিয়দংশ দখল করে নিলেন। প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০) রাঢ় দখল করে কামরূপরাজকে পরাজিত করে হরিকেলী রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

এই হরিকেলী রাজা কে আমরা তা সঠিক জানি না। নবম শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে কান্তিদেব নামীয় এক বৌদ্ধ রাজার আমরা খবর পাচ্ছি। কান্তিদেবের পিতামহ ভদ্রদত্ত ও পিতা ধনদত্ত হয়ত সামন্তরাজা ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী বর্ধমানপুর আজও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। দশম শতকের শেষে চন্দ্ররাজদের হাতে হরিকেলী রাজ্যের অবসান ঘটে।

পালদের ভাগ্যক্রমে বাংলায় প্রতিহার-প্রতিপত্তি স্থিতিলাভ করতে পারেনি। প্রতিহাররাজ রাষ্ট্রকূটদের কাছে একাধিকবার পর্যুদস্ত হন। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণ পালরাজ্যে হামলা চালান। কিন্তু রামায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট রাজপুত্র জগত্তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর বিয়ের পর গৌড় কিছুকালের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নারায়ণপাল হয়ত হৃত অঞ্চলে পালশক্তির প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হন।

রাজশাহীর ভাতুড়িয়া শিলালিপিতে দাবি করা হয়, ম্লেচ্ছ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনের রাজারা রাজ্যপালের (৯২০-৯৫২) আজ্ঞা পালন করেন। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাজ্যপালকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পালদের পরম শত্রু প্রতিহার মহেন্দ্রপাল রাষ্ট্রকূটদের চাপে কনৌজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পরবর্তী চারজন পাল রাজা–দ্বিতীয় গোপাল (৯৫২-৯৬৯), দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৬৯-৯৯৫), প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩) এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭৫)-দের ভূমিদানে বারবার উল্লেখ করা হচ্ছে, পালরাজার মেঘসদৃশ রণহস্তি পূর্বদেশের নির্মল জল পান করে মলয় উপত্যকার চন্দনবনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে ঘনসিঞ্চন দ্বারা মরুদেশ শিতল করে হিমালয়ের সানুদেশ পর্যন্ত উপভোগ করে। পালদের রণহস্তির এই প্রশস্তি পালরাজাদের প্রাপ্য কিনা বলা মুশকিল । রাষ্ট্রকূটদের অভিযানে পালহস্তিকুল অংশগ্রহণ করেও থাকতে পারে।

দশম শতকের প্রথমার্ধে আমরা দুই রাজ্যপালের খবর পাচ্ছি, একজন পালবংশের আর একজন কম্বোজ বংশের। দুই রাজার রানীর নাম ও দুই রাজার উপাধি একই রকম। ইতিহাসে এমন যে হয় না তা নয়। এই দুই রাজ্যপালকে অভিন্ন ভাবতে বাধা এই যে, পালরাজের রানী ভাগ্যদেবীকে পাল–ঐতিহাসিক নিদর্শনে তুঙ্গের কন্যা বলে নিয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। আবার পাল রাজ্যপাল ও কম্বোজ রাজ্যপালের বংশধরদের নাম এক নয়।

কম্বোজ রাজ্যপাল অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। ভাতুড়িয়া শিলালিপির দিগ্বিজয় বর্ণনা হয়ত তাঁরই উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে পাল সৈন্যদল গঠিত ছিল। পাল শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কম্বোজ সৈন্যদের অধিনায়ক রাজ্যপাল নাম গ্রহণ করে এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দশম শতকের শেষার্ধে চন্দেল্লরাজ ধঙ্গের আক্রমণে কম্বোজরা দুর্বল হয়ে পড়লে প্রথম মহিপালের পক্ষে হৃত অঞ্চল পুর্নদখল করা সম্ভব হয়।

দশম শতকের প্রায় সূচনা থেকে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে চন্দ্ররাজারা প্রাধান্য বিস্তার করেন। চন্দ্ররাজদের পূর্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্র রোহিতগিরির (কুমিল্লার বর্তমান লালমাই) ভূভুজ বলে আখ্যাত হয়েছেন। সুবর্ণচন্দের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হয়ত প্রথমদিকে হরিকেল রাজার সামন্ত বা মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করে তিনি চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কুমিল্লার দেবপর্বতে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গ ও সমতট জয় করে গৌড়ের বিরুদ্ধেও সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র (৯৩০-৯৭৫) চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। গৌড়ের কম্বোরাজদের পরাজিত করে হয়ত তিনি দ্বিতীয় গোপালকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন এবং 'লীলানির্জিত' পাল-মহিষীকে প্রত্যর্পণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে। শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (৯৭৫-১০০০) ব্রহ্মপুত্র–তীরের 'ম্লেচ্ছদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও গৌড়রাজকে পরাজিত করেন। কল্যাণচন্দ্রের পুত্র লড়হচন্দ্র (১০০০-২০)-এর কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। লড়হচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (১০২০-১০৪৫) পরাজিত হন রাজেন্দ্র চোলের কাছে। কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ ও বঙ্গ আক্রমণ করেন। পরপর দুটি বহিরাক্রমণের ফলে চন্দ্র রাজ্য ভেঙে যায়। ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে ব্রহ্মদেশীয় ও আরাকানি নরনারীর প্রতিকৃতি থেকে মনে হয় আরাকানি চন্দ্ররাজাদের সঙ্গে এদেশের চন্দ্ররাজাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

দশম শতকের শেষভাগে পালসাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধে সীমাবদ্ধ ছিল। "অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" উদ্ধার করার গৌরব অর্জন করেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩), যদিও তাঁর পক্ষে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে ও রাঢ়ে প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। রাজেন্দ্র চোলের কাছে মহীপাল পরাজিত হন, কিন্তু রাজেন্দ্রচোল বরেন্দ্র আক্রমণ না করায় এবং অভিযানশেষে স্বীয় রাজ্যে ফিরে যাওয়ায় মহীপালের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। মহীপালের নামে বাংলায় ছড়িয়ে আছে অনেক দীঘি ও নগরী। 'ধান ভাঙতে মহীপালের গীত' প্রবচনে মহীপাল লোকমানসে আজও বেঁচে আছেন। মহীপালের মৃত্যুর পর কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করে মঠমন্দির ধ্বংস করে বেধড়ক লুঠতরাজ চালান। মঠমন্দিরে জমানো ধনসম্পদ চোখে পড়লে, কোনো হানাদারের পক্ষেই লোভ সংবরণ করা মুশকিল, সে গজনির সুলতান মাহমুদই হোক বা কলচুরি লক্ষ্মীকর্ণই হোক। শেষ পর্যন্ত অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় নয়পাল (১০৪৩-১০৫৮) রেহাই পেলেন। তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-১০৭৫)-এর সময় লক্ষ্মীকর্ণ আবার পালরাজ্য আক্রমণ করলেন। চন্দেল্ল, চালুক্য ও পরমার শত্রুদের পেছনে রেখে লক্ষ্মীকর্ণের পক্ষে অবশ্য পালরাজ্যে বেশি দিন অবস্থান

করা সম্ভব হয়নি। বিগ্রহপালের সঙ্গে স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীর বিয়ে দিয়ে লক্ষ্মীকর্ণ গৃহরাজ্যে ফিরে গেলেন।

পালরাজ্যের কিন্তু শান্তি ফিরে এল না। কল্যাণের চালুক্যরাজদের হস্তে গৌড় ও বঙ্গ তিন বার আক্রান্ত হলো। উড়িষ্যার রাজারা রাঢ় দখল করে নিলেন। পালরাজদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বর্ধমানের ঢেক্করীতে ঈশ্বর ঘোষ, গয়ায় শুদ্রক এবং মগধে বর্ণমান ও রুদ্রমান সামন্তরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে আবার গৃহবিবাদ শুরু হলো। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০) তাঁর অপর দুই ভাই শুরপাল ও রামপালকে বন্দি করলেন। এক সামন্তচক্রের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হলে শুরপাল ও রামপাল বঙ্গে ও মগধে গিয়ে আশ্রয় নেন। সামন্তচক্রের সহায়তায় কৈবর্তপ্রধান দিব্য বরেন্দ্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সার্বভৌম রাজা হিসেবে। দিব্যর ভাই রুদোক ও রুদোকের পুত্র ভীম একাদশ শতকের অষ্ট দশক পর্যন্ত বরেন্দ্রে রাজত্ব করেন। দিনাজপুরের কৈবর্তস্তম্ভ এই পরিবারের স্মৃতি বহন করছে।

একাদশ শতকের শেষার্ধে বঙ্গে বর্মরাজদের উত্থান ঘটে। কলচুরিদের বঙ্গাভিযানের সময় বর্মরা এদেশে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। পৌরাণিক যাদব বংশের দাবিদার এই বর্মরা প্রথমে সামন্ত ছিলেন। বর্ম বংশের বজ্রবর্মা বীর কবি ও পণ্ডিত হিসেবে আখ্যাত হয়েছেন, রাজা হিসেবে নয়। বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মার সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা বীরশ্রীর বিয়ে হয়। তাঁর প্রশস্তিকারের মতে জাতবর্মা বহুযুদ্ধে জয়লাভ করে সার্বভৌমত্ব লাভ করেন এবং অঙ্গ, কামরূপ, বরেন্দ্র ও বঙ্গের গোবর্ধন রাজাকে পরাজিত করেন। জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মা রামপালের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। কুলজী গ্রন্থে উলেখ রয়েছে হরিবর্মার ভাই রাজা সামলবর্মা আমন্ত্রণ করে বৈদিক ব্রাহ্মণদের এদেশে নিয়ে আসেন। সামলবর্মার ছেলে ভোজবর্মা বর্মবংশের শেষ রাজা। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি বিজয়সেনের হাতে বর্মরাজ্যের অবসান ঘটে।

বরেন্দ্রে কৈবর্ত-উত্থানের পর শূরপাল (১০৮০-১০৮২) মগধে ও রাঢ়ে স্বল্পকালের জন্য রাজত্ব করেন। শূরপালের ভাই রামপাল (১০৮২-১১২৪) রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র উদ্ধারে তৎপর হলেন। ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি ও নানা উপঢৌকন দিয়ে রামপাল মগধ, রাঢ় ও অন্যান্য অঞ্চলের সামন্তদের আনুগত্য লাভ করেন। রামপালকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন তাঁর মাতুল রাষ্ট্রকূট-কুলতিলক মথনদেব। এক ভীষণ যুদ্ধে কৈবর্ত ভীম পরাজিত হলেন। রামপাল প্রথমে ভীমের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন। পরে ভীম প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে তাঁর বন্ধু হরিকে নানা উপঢৌকন দিয়ে দলে টেনে রামপাল ভীমের প্রতিরোধ চূর্ণ করলেন। এক কঠিন প্রতিহিংসায় ভীমের চোখের সামনে প্রথমে তাঁর পরিজনদের শেষ করে তীরের পর তীর মেরে ভীমকে হত্যা করা হলো। মহা ধুমধামে মালদহে রামপাল রামাবতী নগরীর ভিত্তিস্থাপন করেন।

বঙ্গের বর্মরাজার সঙ্গে পালরাজের বন্ধুত্ব হলো। পাল-মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ জয় করলেন। পশ্চিমে অঙ্গ আবার পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। কনৌজের গাহড়বালদের ও মিথিলার কর্ণাটরাজ নান্যদেবের অগ্রগতি হলো প্রতিহত। দক্ষিণে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গাদের অগ্রগতি রোধ করে রামপাল কলিঙ্গে প্রভুত্ব বিস্তার করলেন।

মাতুল মথনদেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ রামপাল মুঙ্গেরে গঙ্গাগর্ভে ইচ্ছামরণ বরণ করলেন। পালপ্রদীপ শেষবারের মতো জ্বলে উঠে নিভে গেল।

রামপালের পুত্র কুমারপাল (১১২৪-১১২৯)-এর সময়ে চালুক্যরা রাঢ় আক্রমণ করেন ও গাহড়বালরা মগধ আক্রমণ করে পাটনা পর্যন্ত দখল করে নেয়। কুমারপালের পুত্র তৃতীয় গোপাল (১১২৯-১১৪৩) শত্রুহস্তে নিহত হন। রামপালের আর এক পুত্র মদনপাল (১১৫০-১১৭০) প্রথম দিকে গাহড়বাল ও চোড়গঙ্গাদের বিরুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও সেন-শক্তির কাছে তিনি হার মানলেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চালুক্যরা বাংলাদেশে বারবার হামলা করেন। চালুক্যরাজদের সামন্তরা মিথিলা, নেপাল ও রাঢ়ে নতুন নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. সেন রাজ্য

সেনরাজদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্তসেন চালুক্য অভিযানে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে রাঢ়ের গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থকাল কাটান। সেখানকার কাকাতুয়ারাও না কি বেদবাণী মুখস্থ বলতে পারত। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন ও হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন প্রথম দিকে সামন্তরাজই ছিলেন। এই বিজয়সেনই নিদ্রাবলীর বিজয়সেন যিনি রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেন। অপারমন্দারের শূর রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিয়ে করে ও উড়িষ্যার রাজা অনন্তচোড়গঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বিজয়সেন পশ্চিম বাংলায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেন বংশের তিনিই প্রথম সার্বভৌম রাজা। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামন্তদের পরাজিত করে বরেন্দ্র থেকে পালদের উৎখাত করে বঙ্গের বর্মরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে এই প্রথম বারের মতো সমগ্র বাংলাদেশে বিজয়সেন একচ্ছত্র রাজাধিরাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। উত্তরে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে মিথিলার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় বিজয়সেন সে সাফল্য অর্জন করেন। তারই প্রশাস্তি রচিত হয়েছে সমসাময়িক তাম্রশাসনে, শ্রীহর্ষের ও উমাপতিধরের কাব্যে।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (১১৬০-১১৭৮) মগধের পূর্বাঞ্চল দখল করে নেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে বল্লালসেন বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতির স্মৃতি বহন করছে *দানসাগর* ও *অদ্ভুতসাগর* গ্রন্থদ্বয়। শেষোক্ত গ্রন্থ বল্লালসেন শেষ করে যেতে পারেননি, তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন তা সমাপ্ত করেন।

লক্ষ্মণসেন (১১৭৮-১২০৬) পরিণত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের যুদ্ধযাত্রায় লক্ষ্মণসেন যে অংশগ্রহণ করেন তা প্রশস্তিকারদের হাতে 'কৌমারকেলি' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

উমাপতিধর ও শরণের কয়েকটি শ্লোকে রাজার নাম উল্লেখ না করে যে কামরূপ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশি ও মগধ বিজয় এবং চেদি ও ম্লেচ্ছ রাজদের পরাজয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হয়ত লক্ষ্মণসেনের উদ্দেশ্যে রচিত। লক্ষ্মণসেনের রাজ্য পশ্চিমে গয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গাহড়বালদের সামন্ত বল্লভরাজ অবশ্য দাবি করেছেন তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন।

লক্ষ্মণসেন ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। তিনি পিতার *অদ্ভুতসাগর* সমাপ্ত করেন। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ ও উমাপতিধর এবং *মীমাংসা*-রচয়িতা হলায়ুধ। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময় সাহিত্যচর্চায় যে আদিরসের ঢেউ বয়ে যায় তার সঙ্গে কেবল প্রতিযোগিতা করতে পারে অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু মোগলরা।

শেষ বয়সে লক্ষ্মণসেনের পক্ষে তাঁর বিস্তৃত রাজ্যে প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব রাখা সম্ভব হয়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সামন্তরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সুন্দরবনের মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপাল ও মেঘনার পূর্বপারে কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে মধুমথনদেব, বসুদেব ও দমোদর দেবরা প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। সিলেটের ভাটেরা লিপির কেশবদেব ও ঈষাণদেব এবং চারপত্রমুড়া লিপির বীরধরদেব হয়ত দমোদরদেবের রক্ত-সম্পর্ক। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব এক স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. তুরস্কশক্তির আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ

মুহাম্মদ ঘোরি তরাওয়ারির যুদ্ধে জয়লাভ করে ১১৯২ সালে আর্যাবর্তে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। অমাত্য, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদৈবজ্ঞরা লক্ষ্মণসেনকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, তুর্কি আক্রমণ আসন্ন। গুপ্তচররা খবর নিয়ে এল, তুরস্কদের আকৃতিতে দৈবজ্ঞবর্ণিত লক্ষণাদির আশ্চর্য সাদৃশ্য! আসন্ন বিপদ এড়াবার জন্য ধুমধাম করে ঐন্দ্রিমহাশান্তি যজ্ঞ হলো। আতঙ্কগ্রস্থ ব্রাহ্মণ, বণিক ও বিত্তবানেরা বঙ্গে পালিয়ে গেলেন। বানপ্রস্থরত বৃদ্ধ রাজা গঙ্গার মায়ায় নদীয়ায় রয়ে গেলেন।

আফগানিস্তানের গরমশিরের সেই অশ্বহীন বিত্তহীন আজানুলম্বিতবাহু শ্রীহীন ব্যক্তিটি গজনি ও দিল্লিতে কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। অবশেষে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাদায়ুনের সিপাহসালারের কাছে প্রথমে ছোট একটি চাকরি যোগাড় করেন। স্বীয় দক্ষতাগুণে শীঘ্রই তিনি ভুইলি ও ভাগবতের জায়গীর পান। ভাগ্যান্বেষী খলজিরা দলে দলে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। অরক্ষিত ও উন্মুক্ত অঞ্চলে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঔদন্তপুর ও বিক্রমশিল বিহার আক্রমণ করে বখতিয়ার প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করলেন। পালরাজাদের শেষ আশ্রয়স্থল মগধ জয় করার পর সেনরাজ্য আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলল। বৌদ্ধ শ্রমণরা বৌদ্ধবিদ্বেষী সেনদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হতে রাজি হলো অর্থের বিনিময়ে। অতর্কিত আক্রমণে অভিজ্ঞ ইখতিয়ার বিন বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের অপ্রচলিত অরন্যপথ মাড়িয়ে সেন গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে এক মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন (১০ মে, ১২০৫)। মাত্র আঠারো জন ঘোড়সওয়ার তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে এসেছিল দলের বড় অংশটি পেছনে রেখে। ইখতিয়ার বিন বখতিয়ার ও তাঁর অনুচরদের হাব-ভাব দেখে প্রথমে লোকে ভাবল তাঁরা সওদাগর বা ঘোড়ার ব্যবসায়ী।

পূর্বব্যবস্থামতো সারা শহর বিন বখতিয়ারের অনুচররা ঘিরে ফেলেছিল। হঠাৎ আক্রমণে শহরের মাঝে তুমুল শোরগোল শুরু হলো। ব্যাপারটা আন্দাজ করার পূর্বেই বিন বখতিয়ারের দল রাজপুরীতে ঢুকে রক্ষীদের ঘায়েল ক'রে ফেলল।

মধ্যাহ্নভোজনেরত লক্ষ্মণসেন অনন্যোপায় হয়ে নগ্নপদে পেছনের দরজা দিয়ে জলপথে পালিয়ে গেলেন। মিনহাজুদ্দিন জুজইয়ানির এই বর্ণনা ঘটনার চলিশ বছর পরেই লেখা হয়। মিনহাজ বলেছেন, হিন্দুস্থানের রায়দের পুরুষানুক্রমিক খলিফার মতো ছিলেন লক্ষ্মসেন। তিনি তাঁকে তুলনা করেছেন হাতেম কুতুবুদ্দীন–এর সঙ্গে এবং করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন পরকালে তাঁর শাস্তি লাঘব করা হয়। ৬০১ হিজরি (১২০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দ)- তে বিন বখতিয়ার সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির নামে যে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত করেন সেখানে সংস্কৃতে গৌড়বিজয়ের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, বিন বখতিয়ার ৬০০ হিজরির রমজান মাসে গৌড়বিজয় করেন। কারণ, মুসলমানদের মাসের উল্লেখ করা না হলেও বিন বখতিয়ারের অনুচর সুলতান আলাউদ্দিন আলি মর্দান খান ঐ ঘটনার তাৎপর্যের কথা ভেবে তাঁর ৬০০ হিজরির এক মুদ্রায় রমজান মাসের উল্লেখ করেন।

১২৪৩-৪৫ সালে মিনহাজ যখন লক্ষ্মৌতে আসেন তখন বঙ্গে সেন রাজারা রাজত্ব করছিলেন। তাম্রশাসনে আখ্যাত 'যবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র' বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন তুর্কিদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন কয়েক দশক ধরে। ১২৮৯ সালে গৌড়েশ্বর নামধারী রাজা মধুসেনের উলেখ রয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থ *পঞ্চরক্ষায়*। মধুসেনের 'গৌড়েশ্বর' উপাধি মগধের গোবিন্দপালের 'গৌড়েশ্বর' উপাধির মতো হৃতগৌরবের নিষ্ফল বহ্বাড়ম্বর। বিক্রমপুর অঞ্চলের দেববংশের রাজারা অবশেষে সেনদের অবসান ঘটান।

বিন বখতিয়ার লক্ষ্মণসেনের পিছু ধাওয়া না করে লক্ষ্মৌতির দিকে অগ্রসর হন। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লক্ষ্মৌতির গুরুত্ব ছিল অসীম। পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে করতোয়া ও তিস্তা, পশ্চিমে কুশি নদী ও রাজমহল এবং উত্তরে দেবকোট-এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খলজি প্রাধান্য স্থাপিত হলো।

বিন বখতিয়ার ভাবলেন তাঁকে রুখে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। লুণ্ঠনের লোভ, তিব্বতের ঘোড়ার বাজার দখল বা পিতৃভূমি তুর্কিস্তানের সঙ্গে, তিব্বতের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন, যে কোনো কারণেই হোক তিনি জোরেসোরে তোড়জোড় শুরু করলেন তিব্বত অভিযানের। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মেচ–সর্দার আলি হলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। কামরূপের রাজা খবর দিলেন, শীতকাল তিব্বত আক্রমণের জন্য প্রশস্ত নয়, বরং পরের বছর তিনি বিন বখতিয়ারকে সঙ্গ দিবেন। বিন বখতিয়ার কারো কথায় কান না দিয়ে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানে বের হলেন। কামরূপের পোড়ামাটি-নীতির সামনে বিন বখতিয়ারের দশ হাজার সৈন্য হলো নাস্তানাবুদ। মাত্র এক'শ জন অনুচর নিয়ে প্রথম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিন বখতিয়ার দেবকোট ফিরে এলেন। বিধবাদের অভিশাপ কুড়িয়ে দুরারোগ্য রোগে তিনি শয্যা নিলেন। আলিমর্দন খলজি না কি তাঁকে ছুরি মেরে হত্যা করেন।

তুর্কি অপরাজেয়তার খ্যাতি হলো বিনষ্ট। পূর্বদিকে তুর্কি অভিযান একশ' বছরের মতো পিছিয়ে গেলো। মাঝে মাঝে হানা দিয়ে ও হামলা করে কিছু কিছু এলাকা দখল করা হলেও ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটে তুর্কি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো না।

বিন বখতিয়ারের মৃত্যুর (১২০৬) পর প্রায় বিশ বছর ধরে খলজিদের মধ্যে দারুণ গৃহবিবাদ শুরু হলো। দিল্লির আদেশে বা অনুপ্রেরণায় খলজিরা পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালাননি। তাঁরা ভাবতেন অধিকৃত অঞ্চল তাঁদের স্বোপার্জিত সম্পত্তি। বিন বখতিয়ারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা শিরিন খলজি দেবকোটে এসে আলিমর্দানকে বন্দি করলেন। জিম্মাদারকে হাত করে আলিমর্দান পালিয়ে গেলেন দিল্লি। তাঁর উস্কানিতে কুতুবুউদ্দিন লক্ষ্ণৌতি অধিকার করার জন্য কাইমাজ রূমীকে পাঠালেন। খলজি আমিররা, বিশেষ করে গিয়াসুদ্দীন ইওজ খলজি কাইমাজকে সমর্থন করায় শিরাণ দেবকোট ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। দেবকোট পুনর্দখল করতে গিয়ে তিনি আবার পরাজিত হলেন। সমর্থকদের নিয়ে প্রথমে তিনি সরে যান বগুড়ার সন্তোষ অঞ্চলে। পরে স্থানীয় হিন্দু সামন্তরাজার হাতে তিনি প্রাণ হারালেন।

কুতুবুদ্দিনের গজনি-অভিযানে আলিমর্দান অংশ নেন ও বন্দি হন। গজনি থেকে পালিয়ে এলে কুতুবুদ্দিন তাঁকে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলিমর্দান এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে লক্ষ্ণৌতি এলেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরে দিল্লিতে তখ্‌তের জঙ্গ শুরু হলো। সেই সুযোগ আলিমর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর অত্যাচার, বহ্বাড়ম্বর ও দিল্লির আমিরদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য খলজিরা তাঁকে হত্যা করে ইওজকে তাঁদের দলপতি নির্বাচিত করলেন।

বিন বখতিয়ারের এই ঘনিষ্ট সহচর ইওজ নিজের দেশে গরমশিরে গাধার পিঠে মোট বইতেন। প্রিয়দর্শন ও ধর্মপ্রাণ ইওজ অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন নাম ধারণ করে তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ করলেন। মুসলমান সমাজে ইজ্জত বৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার নাম রেখে নিজেকে খলিফার সাহায্যকারী হিসেবে উলেখ করলেন। তিনি খলিফার সনদ পেয়েছিলেন কিনা, সে ব্যাপারটা অবশ্য বিতর্কিত।

ইওজ দেবকোট থেকে লক্ষ্ণৌতিতে রাজধানী নিয়ে এলেন এবং বসনকোট নামে এক দুর্গ নির্মাণ করলেন। তিনিই প্রথম মুসলমান শাসক যিনি নৌবহর গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সৈন্যদলে দেশি পাইকদের ভর্তি করারও চেষ্টা হলো। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ও বন্যা ঠেকিয়ে রাখার জন্য দেবকোট থেকে বীরভূমের লাখনৌর পর্যন্ত একটা উঁচু সড়ক বানানো হলো। এই সড়ক দেড়শ বছর আগেও টিকে ছিল। কামরূপ, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও ত্রিহুতের রাজারা ইওজকে কর দিতে বাধ্য হয়।

উত্তর ভারতে চেঙ্গিস খানের হামলার চোটে দিল্লির সুলতান লক্ষ্ণৌতির দিকে নজর দিতে পারেননি। চেঙ্গিস খান ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর সুলতান ইলতুতমিশ ইওজের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। ইওজ বশ্যতা স্বীকার করায় দুই পক্ষে সন্ধি হলো। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লি ফিরে যাওয়ার পর ইওজ আবার বিহার দখল করে নিলেন। অযোধ্যার হিন্দু সামন্তদের বিরুদ্ধে দিল্লি সৈন্যবাহিনীকে ব্যস্ত দেখে ইওজ এবার বঙ্গ আক্রমণ করেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনের পর ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন লক্ষ্ণৌতি দখল করে নিলেন। ইওজ রাজধানী পুনর্দখল করতে গিয়ে নিহত হলেন। খলজিদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান।

১২২৭-এ ইওজের মৃত্যুর পর ১২৮৭ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌতি মোটামুটিভাবে দিল্লির অধীনে ছিল। এই ষাট বছর দিল্লির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এ দেশে একাধিকবার বিদ্রোহ হয়েছে। সুযোগ বুঝে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শাসনকর্তারা লক্ষ্ণৌতি অধিকার ক'রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছেন।

ইলতুতমিশ তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দিনকে মালিক-উশ-শারক (প্রাচ্যের মালিক) উপাধি দান করে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক বলকা খলজি বিদ্রোহ করেন। সমসাময়িক মুদ্রায় যে সুলতান দওলাত শাহের উলেখ পাওয়া যায় তিনি বলকা খিলজি কিনা যে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। ইলতুতমিশ বিদ্রোহ দমন করে আলাউদ্দিন জানিকে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। জানির পর এলেন সাইফুদ্দিন আইবক যিনি বঙ্গ থেকে হাতি ধরে সুলতানকে উপহার পাঠিয়ে 'য়ুগানতাৎ' উপাধি লাভ করেন। ১২৩৬-এ ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর তুর্কি আওর খান আইবক স্বল্পকালের জন্য লক্ষ্ণৌতির ক্ষমতা দখল করেন। তাঁকে পরাজিত করে বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খান ১২৩৬ থেকে ১২৪৫ পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে লক্ষ্ণৌতিতে রাজত্ব করেন। যদিও উপহার পাঠিয়ে দিল্লির সুলতানদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে তিনি কসুর করেননি।

তুগান যখন পশ্চিমে কারা অঞ্চলে অভিযানে ব্যস্ত তখন উড়িষ্যার রাজা ১২৪৩-এর শীতকালে লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। তুগরল পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জাজনগর (মুসলমান ঐতিহাসিকদের উড়িষ্যা)-এর সীমান্তে কাটাসিন দুর্গ দখল করে নেন। যখন তাঁর সৈন্যরা দুপুরে বিশ্রাম করেছিল তখন উড়িষ্যাবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে তুর্কি ছাউনি তছনছ করে লাখনৌর পর্যন্ত দখল করে নিল। তুগরল লক্ষ্ণৌতি ফিরে এসে দিল্লির সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১২৪৫ মার্চ মাসে উড়িষ্যারাজ লক্ষ্ণৌতি অবরোধ করেন, কিন্তু দিল্লি বাহিনীর খবর পেয়ে অবরোধ তুলে তিনি পিছু হটে গেলেন।

তুগানকে সাহায্য করতে এসে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমর খান লক্ষ্ণৌতি দখল করে নিলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যারাজ রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর প্রশস্তিকারের মতে, যবনীর অশ্রুবিগলিত কজ্জলে গঙ্গার শুভ্র জল যমুনার কালিমাশ্রী রূপ পরিগ্রহ করল।

তমর খানের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন জানি বছর চারেক লক্ষ্ণৌতি শাসন করেন। জানির পর এলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা ইখতিয়ারুদ্দিন ইউজবক তুগরল খান। তুগরল রাঢ়ে উড়িষ্যা-শক্তিকে হটিয়ে দিয়ে ও মান্দারণ দখল করে সুলতান মুগিসুদ্দিন নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৫৭-এ কামরূপ জয় করতে গিয়ে বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলো। ইজ্জুদ্দিন ক্ষমতা দখল করে দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করলেন। তিনি বঙ্গ আক্রমণ করতে গেলে তাঁর অনুপস্থিতিতে কারা'র শাসনকর্তা তাজুদ্দিন আর্সলান লক্ষ্ণৌতি দখল করে তিন দিন ধরে শহরে বেধড়ক লুটতরাজ চালালেন। ইজ্জুদ্দিন রাজধানী পুনর্দখল করতে গিয়ে নিহত হলেন। ১২৬৫-এ তাজুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাতার খান বিহার ও লক্ষ্ণৌতি অধিকার করে সুলতান বলবনের স্বীকৃতি লাভ করেন। তাতার খানের পর শেরখান বছর চারেক লক্ষ্ণৌতি শাসন করলেন। একজন শাসনকর্তা হঠাৎ করে যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে সেজন্য বলবন লক্ষ্ণৌতির জন্য দু'জন

শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। আমীন খান হলেন প্রধান শাসনকর্তা এবং তুগরল হলেন তাঁর সহকারী। স্বল্পকালের মধ্যে তুগরল সর্বময় ক্ষমতা দখল করে বঙ্গে এক অভিযান চালান। তিনি সোনারগাঁয়ের কাছে নারকিল্লা দুর্গ নির্মাণ করেন। উড়িষ্যায় হামলা চালিয়ে তিনি যে ধনসম্পদ হস্তগত করেন তার নির্দিষ্ট পঞ্চমাংশ তিনি দিল্লিতে পাঠাননি। অসুস্থ বলবনের মৃত্যু হয়েছে, এই খবর পেয়েই তিনি সুলতান মুগিসুদ্দিন ইউজবক শাহ নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। জাঁকজমকে লক্ষ্ণৌতি দিল্লিকে ছাড়িয়ে গেল।

দিল্লির ঐতিহাসিকরা বলতেন, বাংলার আকাশে-বাতাসে-মাটিতে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে আছে। দিল্লি হনুজ দুরস্ত। সেই সুযোগে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তারা একের পর এক বিদ্রোহ করেন। দিল্লির চোখে লক্ষ্ণৌতি হলো 'বালগাকপুর', বিদ্রোহপুরী।

অসুস্থ বলবন সুস্থ হয়ে তুগরলের বিরুদ্ধে পিটুনি অভিযান পাঠালেন। দরাজ হাতে টাকা ঢেলে দিল্লির বেশ কিছু সেনানায়কদের তুগরল হাত করলেন। দিল্লি বাহিনীর দুই দুই বার বিপর্যয়ের পর বলবন স্বয়ং লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করলেন। এর পূর্বে লক্ষ্ণৌতির বিরুদ্ধে কোনো দিন এত বড়ো সৈন্য বাহিনী, প্রায় তিন লক্ষের মতো, নিয়োজিত হয়নি। তুগরল নারকিলা দুর্গে আশ্রয় নিলেন।

বলবন বঙ্গের দনুজ রায়ের সঙ্গে চুক্তি করলেন, তুগরল যেন জলপথে পালিয়ে যেতে না পারে। দনুজ রায় চেয়েছিলেন, তিনি দরবারে পৌঁছলে বলবান তাঁকে স্বাগত জানাবেন। দনুজ রায় দরবারে প্রবেশ করলে বলবান উঠে দাঁড়িয়ে হাতের শিকারী পাখিটাকে উড়িয়ে দিলেন। দরবারের লোকের কাছে এটা তেমন কিছু মনে হলো না, কিন্তু দনুজরায় ভাবলেন তিনি প্রতিশ্রুত রাজকীয় সম্মান পেলেন।

তুগরল নারকিল্লা ছেড়ে উড়িষ্যার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। বলবনের সন্ধানী সৈন্যের কাছে তুগরল বাধা পেলেন। সাঁতরে নদী পার হওয়ার সময় তিনি শরবিদ্ধ হন। তাঁর কাটামুণ্ডু বলবনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রায় তিন বছর লেগেছিল এই বিদ্রোহ দমন করতে। বিদ্রোহীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য লক্ষ্ণৌতির বাজারে এক ক্রোশ ধরে ফাঁসির মঞ্চ সাজানো হলো। পুত্র বুগরা খানকে লক্ষ্ণৌতির শাসনভার দিয়ে বলবন দিল্লি ফিরে গেলেন। মঙ্গোলদের হাতে তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র নিহত হওয়ায় বলবন বুগরাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি চেয়েছিলেন, বুগরা তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। আরামপ্রিয় বুগরা দু'মাস পরেই লক্ষ্ণৌতি ফিরে এলেন। ১২৮৭ সালে বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর উজির নিযামুদ্দিন, বুগরার নাবালক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসিয়ে সর্বময় ক্ষমতা দখল করে নিলেন। উচ্ছৃঙ্খল কায়কোবাদকে শায়েস্তা করার জন্য বুগরা দিল্লির পথে রওয়ানা হলেন। সরযু নদীর দুই তীরে দুই পক্ষের তাঁবু পড়ল। কায়কোবাদের কুর্নিশ করলেন পিতা বুগরা খান। এই ঘটনা নিয়েই আমির খসরুর 'কিরানুস সাদাইন' কাব্য রচিত।

বুগরার পর তাঁর পুত্র রুকুনুদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০০)-এর সময় রাজ্যসীমা পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দেবকোট ও দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর সুলতান হলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২)। বলবন যে দুইজন ফিরোজকে বুগরার পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছিলেন, এই ফিরোজ তাঁদেরই একজন।

কায়কাউসের সময় বঙ্গের খাজনায় মুদ্রা জারি হয়। শামসুদ্দিন ফিরোজের সময় ১৩০১ সালে সোনারগাঁ টাকসাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। সোনারগাঁ ও সাতগাঁ ছাড়া এই সময় সিলেট অঞ্চল স্থায়ীভাবে তুর্কিদের দখলে আসে। শাহ শফিউদ্দিনের ধর্মপ্রচার নিয়ে সাতগাঁয় প্রথম সংঘর্ষ বাধে। ১২৯৮ সালে সেনাপতি জাফর খান গাজি সাতগাঁ আক্রমণ করে সাফল্য অর্জন করলেও ১৩১৩ সালের পূর্বে সাতগাঁ সম্পূর্ণ বিজিত হয়নি। রাজা গৌড়গোবিন্দকে তাড়িয়ে দিয়ে সিকান্দার গাজি সিলেট দখল করেন। ধর্মপ্রচারক শাহজালাল কুন্যায়ী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সিকান্দার গাজির সঙ্গে সেই যুদ্ধে অংশ নেন।

মালদহে ও হুগলিতে একই নামের দুই শহর ফিরোজাবাদ জনপ্রিয় ফিরোজের নাম বহন করছে। ফিরোজ পরিণত বয়সে সুলতান হন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্ররা নিজেদের নামে মুদ্রা জারি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর তাঁর ভাইদের সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিনের আমন্ত্রণে ১৩৪২-এ দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক লক্ষ্ণৌতি আক্রমণ করেন। গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরকে বন্দি করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হলো। তুগলক লক্ষ্ণৌতি সাতগাঁ ও সোনারগাঁ-এর জন্য তিনজন শাসককর্তা নিযুক্ত করলেন।

সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক রাজ্যভার গ্রহণ করে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরকে শর্তাধীনে মুক্তি দিয়ে তাঁকে বাহরাম খানের সঙ্গে সোনারগাঁয়ের যুগ্ম-শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। শর্ত মোতাবেক তুগলক সুলতানের নামে গিয়াসুদ্দিন খুতবা পড়লেন ও মুদ্রা জারি করলেন, কিন্তু নিজের ছেলেকে দিল্লিতে পাঠাতে রাজি হলেন না।

১৩২৭ সালে গিয়াসুদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাহরাম খান তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর গায়ের চামড়া দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন। এরপর প্রায় দশ বছর লক্ষ্ণৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ যথাক্রমে কদর খান, বাহারাম খান ও ইজ্জুদ্দিন ইয়াহিয়ার শাসনে রইল।

৬. স্বাধীন সুলতানি আমল

১৩৩৮ সালে বাহরামের মৃত্যুর পর তাঁকে বর্মরক্ষক সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ১৩৩৮ সালে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানি আমলের শুরু যার শেষ হয় ১৫৩৮ সালে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত দিল্লির সুলতান বাংলার দিকে নজর দিতে পারলেন না। কদর খান ও ইজ্জুদ্দিন সোনারগাঁ আক্রমণ করে ফখরুদ্দিনকে পরাজিত করেন। লুটের বখরা নিয়ে বিবাদ শুরু হলে বিজয়ী সৈন্যদলের অনেকে ফখরুদ্দিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কদর খানকে হত্যা করেন। ফখরুদ্দিন সোনারগাঁ আবার দখল করে নেন। তিনি সাময়িকভাবে লক্ষ্ণৌতি অধিকার করে মোখলেসকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কদর খানের আরিজ-ই-লস্কর আলি মোবারক মোখলেসকে হত্যা করে লক্ষ্ণৌতি অধিকার করে নেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পাণ্ডুয়ায়। দিল্লির সুলতানের কোনো মনোনীত শাসনকর্তা না আসায় মোবারক সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ নাম নিয়ে স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। হাজি ইলিয়াসের হাতে তিনি নিহত হন।

বাঘে-কুমিরের যুদ্ধের মতো নৌবলে বলীয়ান সোনরগাঁয়ের সঙ্গে স্থলবলে বলীয়ান লক্ষ্ণৌতির প্রায় সংঘর্ষ লেগে থাকত। পশ্চিমে বাধা পেয়ে ফখরুদ্দিন দক্ষিণ-পূর্বে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। তিনি চট্টগ্রাম দখল করে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত এক বাঁধ নির্মাণ করেন। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মুদ্রার মধ্যে ফখরুদ্দিনের মুদ্রা ছিল সবচেয়ে সুন্দর।

১৩৪৫-৪৬ সালে তাঞ্জিয়ারের ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন সিলেটের শাহজালালের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাংলার বন্দর-গঞ্জ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিনিসপত্র, দাসদাসীর সস্তা দাম, নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু বর্ষা-বন্যা ও কাদাপানি দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি এদেশের নাম দিয়েছিলেন আর্শিবাদপূর্ণ নরক। দেশে সুফি-দরবেশের বেশ কদর ছিল। শায়েদা নামে এক ফকিরকে ফখরুদ্দিন চট্টগ্রামে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। বিশ্বাসঘাতক শায়েদা, ফখরুদ্দিনের পুত্রকে হত্যা করে সোনারগাঁয়ে আশ্রয় নিলে শহরবাসী তাঁকে ধরিয়ে দেয়। পরবর্তী সুলতান ইখতিয়ারুদ্দিন গাজি শাহ (১৩৪৯-১৩৫২) সম্ভবত ইলিয়াস শাহের হাতে নিহত হন।

ইরানের সিজিস্তান থেকে হাজি ইলিয়াস দিল্লি আসেন। যুবরাজ ফিরোজের রক্ষিতার সঙ্গে অপকর্ম করে তিনি না কি ভয়ে পাণ্ডুয়ায় পালিয়ে আসেন। লক্ষ্ণৌতির সুলতান আলাউদ্দিন প্রথমে ইলিয়াসকে গ্রেপ্তার করলেও পরে ধাত্রীর অনুরোধে তাঁকে মুক্তি দিয়ে একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। আশ্রয়দাতাকে বধ করে ইলিয়াস সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮) নাম ধারণ করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম শাহ-ই-বাঙ্গালা/শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ভাঙের নেশার জন্য দিল্লির ঐতিহাসিকরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন শাহ-ই-ভাঙ্‌রা।

১৩৫০ সালে ইলিয়াস নেপালে হামলা চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। লুটতরাজের সময় পশুপতিনাথের মূর্তি ত্রিখণ্ডিত হয়। দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত আর এক অভিযানে ইলিয়াস ব্যাপক লুটতরাজ চালান। ত্রিহুতের কিছু অংশ দখল করার পর পশ্চিমে কাশি, গোরক্ষপুর ও চম্পারণ পর্যন্ত এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ইলিয়াসের রাজ্যভুক্ত হয়। ইলিয়াসের ইচ্ছা ছিল দিল্লি দখল করে তিনি নিযামুদ্দিনের দরগায় তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

ইলিয়াসের এই সাফল্য দিল্লির জন্য ছিল এক বড় রকমের হুমকি। ইলিয়াসকে শায়েস্তা করতেই হবে। ১৩৫৩ সালের নভেম্বরে ফিরোজ শাহ তুগলক বের হলেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর নিয়ে। সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে ইলিয়াস দিনাজপুরের একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। একডালা দুর্গের তিন দিকে ছিল বালিয়া, চিরামতি ও মহানন্দা নদী এবং আর এক দিকে ছিল ঘনজঙ্গল। রাজধানী পাণ্ডুয়া দখল করার পর দিল্লিবাহিনী একডালা দুর্গ অবরোধ শুরু করল। বর্ষা ও মশার অত্যাচারে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরোজ সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। দিল্লির ঐতিহাসিকরা তাঁদের সম্রাট-মহানুভবের পক্ষে প্রচার করলেন, সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদের কান্নাকাটি সহ্য না করতে পেরে ফিরোজ অবরোধ তুলে নেন।

পশ্চিমে প্রতিহত হয়ে ইলিয়াস পূর্ব সীমান্তে মনোযোগ দিলেন। ত্রিপুরার বিতাড়িত রাজকুমার রত্ন-ফাকে যে তুরস্ক নৃপতি সাহায্য করেন তিনি হয়তো ইলিয়াস শাহ।

কামরূপের রাজাকে পরাজিত করে তার কিছু অংশও ইলিয়াস দখল করে নেন এবং কামরূপ থেকে মুদ্রা জারি করেন।

দিল্লির দূত ইলিয়াসের জন্য উপহার নিয়ে পাণ্ডুয়া আসছিলেন। পথে ইলিয়াসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি ফিরে গিয়ে ফিরোজ তুগলককে সুখবরটি দিলেন। ফখরুদ্দিনের জামাতা জাফর খান দিল্লিতে বসে সিকান্দারের বিরুদ্ধে ফিরোজকে উস্কানি দিচ্ছিলেন। কালবিলম্ব না করে ফিরোজ আবার পাণ্ডুয়া আক্রমণ করলেন। সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯০) পিতৃ-পরীক্ষিত কৌশল অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। দু'বছর সাত মাস অবরোধ চলার পর শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে সন্ধি হলো। বাংলার সুলতানদের মধ্যে সিকান্দার সর্বাধিক কাল রাজত্ব করেন। তাঁর সময় উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ আদিনায় নির্মিত হয়।

সিকান্দারের শেষকাল শান্তিতে কাটেনি। বিমাতার চক্রান্ত এড়াবার জন্য পুত্র গিয়াসুদ্দিন শিকার করার ছলে সোনারগাঁয়ে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ করলেন। গোয়ালপাড়ার কাছে পিতা-পুত্রের সংঘর্ষে গিয়াসুদ্দিনের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর এক সৈন্য সিকান্দারকে চিনতে না পেরে বর্শাবিদ্ধ করলেন। পুত্রকে আশীর্বাদ করে সিকান্দার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১০) প্রতিহিংসায় তাঁর সতেরজন বৈমাত্রেয় ভাইকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সাহেব খানের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁকে বন্দি করেন। গৃহযুদ্ধের ফলে রাজ্যজয়ে গিয়াসুদ্দিন তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। কামতা ও অহোমরাজদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে সাময়িকভাবে কামতার কিছু অংশ দখল করা সম্ভব হলেও পরে কামতা-অহোমের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখে গিয়াসুদ্দিন হটে আসতে বাধ্য হন। মিথিলার রাজা শিবসিংহের কাছে হয়তো তিনি কোনো এক সময় পরাজিত হন।

গিয়াসুদ্দিনকে নিয়ে অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে। এক দুর্ঘটনায় সুলতানের তীরে এক বিধবার পুত্র আহত হয়। বিধবার ফরিয়াদে কাজি সিরাজুদ্দিন সুলতানকে তলব করেন এবং বিধবাকে খেসারত দিতে হুকুম করেন। হুকুম তালিম করে গিয়াসুদ্দিন বললেন, কাজি যদি ঠিকমতো বিচার না করতেন তাহলে তাঁর মাথা কাটা যেত। কাজি ০তাঁর আসনের তলা থেকে বেতটা বের করে উত্তর দিলেন, সুলতান আইন না মানলে বেত মেরে তাঁর পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হতো।

বিদ্যোৎসাহী গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের ইরানের কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ করার কাহিনীটি এইরূপ : একবার কঠিন রোগে শয্যাগ্রস্ত হয়ে সুলতান তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, হারেমের সরবা, গুল ও লালার হাতে যেন তাঁর লাশ গোসল দেওয়া হয়। আরোগ্যলাভের পর এই মহিলাদের প্রতি সুলতানের অনুগ্রহবৃদ্ধি দেখে অন্যান্যরা তাঁদের বিদ্রূপ করতে লাগল। মেয়ে তিনটির অভিযোগ শুনে সুলতান এক ফার্সি বয়েৎ রচনা করতে বসলেন, কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি কিছুতেই পূরণ করতে পারলেন না। দূত পাঠিয়ে তিনি কবি হাফেজের শরণাপন্ন হলেন। হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে গিয়ে বলেছিলেন "বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের

নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তাঁর প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।"

গিয়াসুদ্দিন মক্কা, মদিনা, জৌনপুর ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। চীনসম্রাট য়ুংলো ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ সালে তিনবার দূত পাঠিয়েছিলেন। চীনা দোভাষী মা-হোয়ান এদেশের সমৃদ্ধি, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ব্যবসায়ীদের সততার প্রশংসা করেন। এর পরও বছর ধরে চীন সম্রাটের দূতরা বাংলায় আসেন। বাংলা থেকে পাঠানো জিরাফ দেখে চীনা কবিরা কবিতা লেখেন।

গিয়াসুদ্দিন দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার বনেদি জমিদার রাজা গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। তাঁর পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহ (১৪১০-১২) নিহত হন ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিন বায়জিদ শাহ (১৪১১-১৪১২)-এর হাতে। শিহাবুদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে বসিয়ে রাজা গণেশ সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন। রাজা গণেশ ও তার সমর্থকদের অনুসৃত নীতিতে মুসলমান দরবেশগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। গণেশ কয়েকজন দরবেশকে হত্যা করায় দেশে আরও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার অবসান করার জন্য দরবেশদের নেতা শেখ নূর কুতব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কিকে অনুরোধ জানান। ইব্রাহিম গণেশের মিত্র মিথিলার শিবসিংহকে পরাজিত করে গৌড় আক্রমণ করলেন। তাঁর সামরিক শক্তির মোকাবেলা করতে অসমর্থ হয়ে গণেশ, নূর কুতুব আলমের ক্ষমা প্রার্থনা করে পুত্র যদুকে মুসলমান করতে রাজি হলেন। উত্তরবঙ্গে এক কিংবদন্তী আছে, যদু আযম শাহের কন্যা আসমানতারার প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নূর কুতব আলমের পক্ষ নেন। যদু জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪১৬ ও ১৪১৮-১৪৩৩) নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নূর কুতব আলম উপদেশ দেয়ায় ইব্রাহিম মনঃক্ষুণ্ন হয়ে জৌনপুরে ফিরে গেলেন। সেই সুযোগে রাজা গণেশ জালালুদ্দিনকে সরিয়ে দনুজর্মদন দেব নাম গ্রহণ করে সকল ক্ষমতা দখল করে নিলেন। তিনি বাংলা অক্ষরে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। জনশ্রুতিতে আছে তিনি আদিনা মসজিদকে তাঁর কাছারি বাড়ি বানিয়ে সুবর্ণধেনু যজ্ঞ করে জালালুদ্দিনকে শুদ্ধ করেন। রাজা গণেশের মুদ্রার মতো যে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা পাওয়া যায় সেই মহেন্দ্রদেব পুনর্ধমান্তরিত জালালুদ্দিন, না রাজা গণেশের আর এক সন্তান, তা এখনো বিতর্কিত। দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় ছিলেন।

জালালুদ্দিন তাঁর ভাবমূর্তির উন্নতিকল্পে মক্কা, মদিনা, মিশর, ইরান ও চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৪২০ সালে জৌনপুরের ইব্রাহিম শার্কি কয়েকবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। অবশেষে তৈমুর লঙের পুত্র শাহরুখ ও চীন সম্রাট য়ুং-লোর মধ্যস্থতায় ইব্রাহিমকে নিরস্ত করা হয়। আরাকানের রাজা ব্রহ্মরাজের কাছে পরাজিত হয়ে জালালুদ্দিনের সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বাংলার সামন্ত রাজা হতে রাজি হন। আরাকান মুদ্রায় ফার্সি অক্ষরে মুসলমানি নাম লেখার রেওয়াজ চালু হলো।

জালালুদ্দিন তাঁর রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে নিয়ে যান। তাঁর সময় ত্রিপুরার কিছু অংশ বিজিত হয়। জালালুদ্দিন তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তাইমুরিদের মতো 'আমির' ও আব্বাসি খলিফাদের মতো 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তাঁর মুদ্রায় প্রথম কালেমা উৎকীর্ণ হয়।

জালালুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র সুলতান আহমদ শাহ প্রাসাদচক্রান্তে ক্রীতদাস সাদি খান ও নাসির খানের হাতে প্রাণ হারান। সাদি খানকে হত্যা করে নাসির খান মাত্র সাত দিন রাজত্ব করতে পারেন। গৌড়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। নাসির খানকে হত্যা করে আমির ও সেনাপতিরা ইলয়াস শাহের এক পৌত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৬-১৪৫৯)–কে সিংহাসনে বসান।

নাসিরুদ্দিন প্রজানুরঞ্জনে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সময় উড়িষ্যা ও মিথিলার সঙ্গে বাংলার সুলতানের কিছু সংঘর্ষ বাধে। উলুঘ খান জাহানের বদৌলতে যশোর-খুলনা অঞ্চল সরাসরিভাবে নাসিরুদ্দিনের রাজ্যভুক্ত হয়। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ খান জাহানের স্মৃতি বহন করছে। এই সময় গৌড়েশ্বরের রাজ্যসীমা পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড়-পাণ্ডুয়া এবং দক্ষিণে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীন সম্রাটের কাছে দুইবার দূত প্রেরণ করার পর কোনো সাড়া না পাওয়ায় বাংলা-চীন সম্পর্ক এই সময় ছিন্ন হয়ে যায়।

নাসিরুদ্দিনের পুত্র রুকুনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬)–এর সময় উড়িষ্যারাজ গজপতি গড়মন্দারণ অধিকার করলে যুদ্ধ শুরু হয়। সেনাপতি গাজি ইসমাইল, গজপতিকে পরাজিত করে গড়মন্দারণ পুনরুদ্ধার করেন। উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে গড়মন্দারণ বহুবার হাতবদল হয়েছে। উত্তরে কামরূপ-রাজের সঙ্গে এক তুমুল যুদ্ধে ইসমাইল গাজি হেরে যান। কিন্তু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে কামরূপ-রাজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঘোড়াঘাটের দুর্গাধক্ষ্য ভান্দসী রায়ের কানভাঙানিতে বারবাক শাহ ইসমাইলের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ইসমাইল হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন।

পশ্চিমে জৌনপুরের শার্কি সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বারবাক শাহ ত্রিহুত রাজাকে কর দিতে বাধ্য করেন। আমির মালিক-পাইকদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে বারবক কয়েক হাজার হাবশি দাস আমদানি করেন। পরে এই হাবশিরাই দেশের কাল হয়ে দাঁড়ায়। 'কামিল-ফাজিল' উপাধিধারী এই সুলতান নিজে পণ্ডিত ছিলেন।'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর লেখক মালাধর বসু তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা বারবকের সময় নির্মিত হয়।

বারবকের পুত্র শামশুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-১২৮০)–এর আমলে গৌড়ে বেশ কয়েকটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। শামশুদ্দিনের মৃত্যুর পর অমাত্যরা তাঁর অপ্রকৃতস্থ পুত্র সিকান্দার শাহকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অপরারণ করে অপর এক পুত্র জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৬)–কে সিংহাসনে বসালেন। এই সময় প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। এক হাবশি দাস ফতেহকে হত্যা করে সুলতান শাহজাদা বারবক শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে হাবশি উজির মালিক আন্দিল প্রতিজ্ঞা করেন যতদিন সুলতান সিংহাসনে থাকবেন ততদিন তিনি তাঁর কোনো ক্ষতি করবেন না। এক রাত্রে অতিরিক্ত মদ খেয়ে বেসামাল সুলতান সিংহাসন থেকে

পড়ে গেলে, আন্দিল নিজেকে প্রতিশ্রুতিমুক্ত বোধ করে শাহজাদাকে হত্যা করেন। প্রভুভক্ত আন্দিল ফতেহ্ শাহের বেগমকে তাঁর শিশুপুত্রের জন্য এক অভিভাবক নিযুক্ত করতে অনুরোধ করলেন। বেগম নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর স্বামির হত্যাকারীকে যিনি খতম করবেন তাঁকেই তিনি সুলতান হিসেবে মেনে নিবেন। আন্দিল সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০) নাম গ্রহণ্ করেন। গৌড়ের ফিরোজ মিনার তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। জনপ্রিয় ফিরোজকে উচ্ছৃঙ্খল পাইকরা হত্যা করে ফিরোজ শাহের এক পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদশাহকে সিংহাসনে বসান। নতুন সুলতানের ওস্তাদ হাবশ খান প্রথমে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেও কিছুদিনের মধ্যে হাবশি সিদি বদরের হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। সিদি বদর পুতুল-রাজাকে হত্যা করে শামশুদ্দিন মুজাফফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩) নাম নিয়ে সিংহাসন দখল করলেন। তাঁর অত্যাচারে দেশে এক নিদারুণ মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি হলো। মুজাফফর শাহকে হত্যা করে তাঁর প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ হোসেন মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটান এবং এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে (১৪৯৩-১৫১৯) নিয়ে নানা কিংবদন্তি। কেউ বলেন, সৈয়দ হোসেন আরব থেকে এসেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বাংলাদেশেই জন্মে ছিলেন। জঙ্গিপুরের চাঁদপাড়া গ্রামে হোসেন নাকি এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখালি করতেন এবং পরে তিনি ব্রাহ্মণকে এক আনা করের বিনিময়ে চাঁদপাড়া গ্রামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। স্বীয় যোগ্যতার গুণে তিনি হাবশি মুজাফফর শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। অত্যাচারী সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি আমির ও পাইকদের নানা প্রলোভন দিয়ে হাত করেন। আমিরদের সঙ্গে শর্ত ছিল, গৌড়ের মাটির উপরের সব সম্পত্তি তাঁরা পাবেন ও মাটির নিচের সব সম্পত্তি হোসেনের থাকবে। ধনী ব্যক্তিরা যেসব ধনরত্ন রাজার ভয়ে মাটিতে পুঁতে রাখতেন তার মধ্যে হোসেন নাকি তের শ সোনার থাল ও বহু গুপ্তধন লাভ করেন।

হোসেন পাইকদের দল ভেঙ্গে দিয়ে ও হাবশিদের তাড়িয়ে দিয়ে এক নতুন রক্ষিবাহিনী গড়ে তোলেন। সৈয়দ, মোগল, আফগান ও স্থানীয় হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করে হোসেন প্রশাসনের ভোল পাল্টে দিলেন। তাঁর সময় গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিফটক নির্মিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত গৌড় থেকে হোসেন শাহ রাজধানী একডালায় সরিয়ে নেন।

১৪৯৫ সালে জৌনপুরের সিংহাসনচ্যুত সুলতানকে আশ্রয় দেওয়ায় সিকান্দার লোদি, হোসেনের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। বিনাযুদ্ধে দুই পক্ষে সন্ধি হলো, কেউ অপরের শত্রুকে আশ্রয় দেবেন না। শিলালিপির সাক্ষ্যে অবশ্য মনে হয়, উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ হোসেন কোনো সময় দখল করে নিয়েছিলেন।

খেনরাজ তৃতীয় নীলাম্বর কামরূপ ও কামতা রাজ্য দুটি একত্রিত করে এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হাবশিদের সময় খেনরাজ করতোয়ার পূর্ব তীরেও প্রভাব করেন। কথিত আছে তাঁর রানীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করায় নীলাম্বর তাঁর মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে মন্ত্রিকে গোমাংস খেতে বাধ্য করেন। মন্ত্রি গঙ্গাস্নানের অজুহাতে গৌড়ে এসে হোসেন শাহকে খেনরাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। নীলাম্বরের রানীর সঙ্গে হোসেনের বেগম দেখা করতে চান, এই ছল করে নারীর বেশে হোসেনের সৈন্যরা পালকি চড়ে রাজধানীর ভেতরে ঢুকে কামতাপুর দখল করে নেয়।

হোসেন আসাম আক্রমণ করলে আসামের রাজা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। হোসেন তাঁর পুত্র দানিয়েল (কিংবদন্তির দুলাল গাজি)-কে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর ভার দিয়ে গৌড়ে ফিরে যান। বাংলাবাহিনী সিংরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু বর্ষায় আসামবাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আসামের হোসেনশাহী পরগনা হোসেনের স্মৃতি বহন করছে।

হোসেন দক্ষিণে কটক ও পুরী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করে এবং বহু মন্দির ধ্বংস করে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। একাধিকবার হামলা চালালেও হোসেন উড়িষ্যারাজকে সম্পূর্ণভাবে পদানত করতে পারেননি।

চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা ও আরাকান-রাজ্যের সঙ্গে হোসেনের একাধিক সংঘর্ষ বাধে। আরাকানরাজ চট্টগ্রাম কিছুকালের জন্য দখল করে নেন। পর্তুগিজ বিবরণে দেখা যায়, আরাকান বাংলার সামন্ত রাজ্য ছিল। ১৫১৭ সালে সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পর্তুগিজ চট্টগ্রামে আসেন, কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তার দাপটে নিরাশ হয়ে সিংহলে ফিরে যান।

রাষ্ট্রকর্মে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি এই নীতি অনুসরণ করে হোসেন বহু হিন্দুকে চাকরি দেন। তাঁর দবির খাস (ব্যক্তিগত সচিব) সনাতনকে তিনি সাকর মল্লিক (ছোট রাজা) বলে ডাকতেন। সনাতনের ছোটভাই রূপ ছিলেন আর একজন দবির খাস। ছত্রী কেশব খান ও চিকিৎসক মুকুন্দ দাস ছাড়াও কবিশেখর, দামোদর ও যশোরাজ খান প্রমুখ পদকর্তারাও হোসেনের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চৈতন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোসেন তাঁর আমলাদের আদেশ দেন। গুণমুগ্ধদের কাছে তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক' জগৎভূষণ' 'কৃষ্ণ-অবতার'। বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা অবশ্য এই পরম দুর্বার' 'যবন রাজা'কে জরাসিন্ধের সঙ্গে তুলনা করেন। 'মহাকাল যবন'-এর ঘন ঘন 'মহা তমোগুণ বুদ্ধি জন্মে' দেখে অনেকে আবার বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলেন।

দেশের বাইরে হোসেনের সমর-ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে কেউ দেশের ভেতর বিদ্রোহ করার সুযোগ বা সাহস পায়নি। অষ্টাদশ পুত্রের এই জনকের মৃত্যু কোনো গৃহবিবাদের সূত্রপাত ঘটায়নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) নির্বিঘ্নে উত্তরাধিকার লাভ করেন। কোনো সাহিত্যিক হোসেনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন কিনা তা হয়তো বিতর্কিত, কিন্তু তাঁর সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটে তা মাৎস্যন্যায়ে যে সম্ভব নয় তা তর্কাতীত। প্রজার মনে রাজার নাম বেঁচে থাকলেই রাজার সাফল্য। আর হোসেনের নাম আজও বেঁচে আছে।

রাজা কংসনারায়ণকে হত্যা করে নসরত ত্রিহুত সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিলেন। এ সময় বাংলার পশ্চিম-সীমা আজমগড় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করলেন। বহু আফগান পালিয়ে এসে নসরতের রাজ্যে আশ্রয় নিল। মোগল-পাঠানের যুদ্ধে নসরত নিজেকে জড়াতে চাননি। বাবরও বাংলা আক্রমণ করতে চাননি, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন বাংলা সুলতান তাঁর তিনটি শর্ত মেনে নেবেন।

বাবরের আত্মজীবনী প্রাসঙ্গিক অংশটি হারিয়ে যাওয়ায় শর্ত তিনটি কি ছিল আমরা ঠিক জানি না। বোঝা যায়, বাবর চেয়েছিলেন মোঘলদের বাধা দেওয়া চলবে না যদি

তারা আফগানদের পাকড়াও করার জন্য এদিক-ওদিক ধাওয়া করে, মোগলরা ঘর্ঘরা নদী দিয়ে অবাধে চলাফেরা করতে পারবে এবং বাংলাবাহিনীকে ঘর্ঘরার উত্তর অংশে সরে যেতে হবে। বাংলার রাজধানীতে বছর খানেক থেকেও বাবরের দূত নসরতে মতলব আঁচ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়ানো গেল না। ১৫২৯ মে মাসের যুদ্ধে বাঙালিরা প্রথম দিকে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের হার মানতে হলো। বাঙালি গোলন্দজদের দক্ষতার প্রশংসা করে বাবর লক্ষ্য করলেন, তারা তাক্ ঠিক না করে যথেচ্ছা দমাদম গোলা ছোঁড়ে। এমন রণকৌশল নিয়ে বসন্ত রাও-এর মতো ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখানো যায়, কিন্তু যুদ্ধে জেতা মুস্কিল। নসরত বাবরের শর্ত মানতে বাধ্য হলেন। পরে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে গুজরাটের সঙ্গে এক জোট বাঁধার চেষ্টা করেন, কিন্তু জোট দানা বাঁধার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্ব দিকে ত্রিপুরারাজ স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম দখল করে নেন। পরে বন্দর-শহরটি বাংলার অধিকারে ফিরে আসে। উত্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাবাহিনী অহমিয়াদের পরাজিত করে তেমনি ও সিংরী দুর্গ দখল করে নেয়। দক্ষিণে পর্তুগিজ বোম্বেটে বণিকরা তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে। তারা বাংলায় বাণিজ্য করার ও কুঠি নির্মাণের জন্য সুলতানের অনুমতি আদায় করার চেষ্টা করে।

বহু মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে নসরত রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি গৌড়ের সোনা মসজিদ। এক দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত খোজার হস্তে নসরত নিহত হন। তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩)–এর সময় বাংলাবাহিনী অহোমদের সালা দুর্গ দখল করতে গিয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তর ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় বাংলাবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হলো। ফিরোজ শাহ তাঁর পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মাহমুদের হাতে নিহত হন। ইতোমধ্যে কোচবিহারে বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলো। অহমিয়া ও কোচদের চাপে বাঙালিরা কামরূপ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলো।

গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৯) হয়তো নসরতের জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহী হন। আফগানদের হটিয়ে বিহার জয় করার জন্য তিনি সেনাপতি কুৎব খানকে পাঠালেন। গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হাজিপুরে ছিলেন নসরতের ভগ্নিপতি মখদুম-ই-আলা। ফিরোজকে হত্যা করায় তিনি তাঁর বন্ধু শের খানের কাছে তাঁর ধনসম্পদ রেখে মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন।

৭. পাঠান-মোগল দ্বন্দ্ব

শের খান ছিলেন সাহসারামের জায়গিরদার। বিহারের নাবালক শাসনকর্তা জালাল খান লোহানির তিনি অভিভাবক নিযুক্ত হন। পানিপথের যুদ্ধের পর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর জায়গির দখল করে নেন। শের খান বাবরের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সৈন্যর সাহায্যে সাহস ামের দখল ফিরে পান। জালাল খান লোহানি, শের খানের অভিভাবকত্বে বীতশ্র হয়ে গৌড়ে মাহমুদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৫৩৪ সালে সুরুজগড়ের যুদ্ধে মাহমুদ ও জালালের সম্মিলিত বাহিনীকে শের খান পরাজিত করে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেন।

পর্তুগিজদের সাহায্যের আশায় মাহমুদ চট্টগ্রাম ও সাতগাঁয়ে তাদেরকে ঘাঁটি নির্মাণ করার অনুমতি দেন। যখন পর্তুগিজ গোলন্দাজরা তেলিয়াগড়ি ও সক্রিগলিতে জালাল খানের অগ্রাভিযানের মোকাবিলা করতে ব্যস্ত তখন শের খান অরক্ষিত ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে গৌড় আক্রমণ করলেন। পর্তুগিজরা মাহমুদকে বর্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেয়। দুর্বলচেতা মাহমুদ প্রচুর ধনসম্পদের বিনিময়ে শের খানের সঙ্গে সন্ধি করলেন। বিহারে ফিরে গিয়ে শের খানে আবার এক বিরাট অঙ্কের নজরানা দাবি করলেন। মাহমুদ তা অস্বীকার করায়, শের খানের পুত্র জালাল খান গৌড় আক্রমণ করে সম্পূর্ণ নগরটি জ্বালিয়ে দিয়ে বহু ধনরত্ন হস্তগত করলেন। ১৫৩৮ সালের ৬ই এপ্রিল গৌড়ের পতন হলো। শের খান, মাহমুদের পুত্রদের বন্দি করলেন। মাহমুদ পালিয়ে গিয়ে হুমায়ুনকে গৌড় আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

হুমায়ুন ইতোমধ্যে চুনার দুর্গ দখল করেছেন। শের খানের সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তিনি বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন। সম্মুখ-রণ পরিহার করে শের খান প্রথমে রোটাস দুর্গে আশ্রয় নেন এবং পরে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান। হুমায়ুন তেলিয়াগড়ি দখল করার পূর্বেই মাহমুদ মারা যান। গৌড়নগরী হুমায়ুনকে মুগ্ধ করে। 'গৌড়'–এর সঙ্গে 'গোর' শব্দের অস্বস্তিকর সাদৃশ্য অনুভব করে হুমায়ুন তার নতুন নাম দিলেন জান্নাতাবাদ। নামটা অবশ্য জনপ্রিয় হয়নি। গৌড় দখল করার পর আয়েশি হুমায়ুন নাকি এক মাস হেরেম থেকে বের হননি। ইতোমধ্যে শের খান দক্ষিণ বিহার অধিকার করে মোগলদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রসদ সরবরাহ বিপর্যস্ত করে তুললেন। মোগল শিবিরে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। হুমায়ুন, জাহিদ বেগকে গৌড়র শাসকর্তা নিযুক্ত করলেন। জাহিদ বেগ বললেন, 'জাঁহাপনা! আমাকে মেরে ফেলার জন্য বাংলা মুলুক ছাড়া আর কোনো ভালো জায়গা পেলেন না।' অবশেষে জাহাঙ্গির কুলি বেগকে গৌড়ের শাসনভার দিয়ে হুমায়ুন শের খানকে মোকাবেলা করতে বের হলেন। ৮ই জুলাই, ১৫৩৯ চৌসার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। নিজাম ভিস্তির বদৌলতে তাঁর প্রাণ রক্ষা হলো।

শের খান, শের শাহ নাম গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ১৭ই মে ১৫৪০ কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। গৌড়ের শাসনকর্তা খিজর খান পরলোকগত সুলতান মাহমুদের এক শাহজাদিকে বিয়ে করে স্বাধীন সুলতানের মতো আচরণ করতে শুরু করলেন। শের শাহ তাঁকে পদচ্যুত করে কাজি ফজিলতকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। উত্তর-ভারত জয় করে শের শাহ রাজধানী দিল্লি নিয়ে গেলেন। ১৫৪৫ সালে ২রা মে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় বারুদের এক বিস্ফোরণে তিনি প্রাণ হারান।

বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল শের শাহের রাজ্যভুক্ত হয়। চট্টগ্রাম মাহমুদের কর্মচারীদের দখলে ছিল। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে শের শাহের এক কর্মচারী চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পর্তুগিজরা তাঁকে বন্দি করলে তিনি কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল শের শাহের অধিকারভুক্ত হলো না। চট্টগ্রাম ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত আরাকানরাজের দখলে রইল।

পরিদর্শনের সময় জায়গিরদাররা যাতে ভাড়াটে ঘোড়সওয়ারদের তাদের সৈন্য হিসেবে দেখাতে না পারে তার জন্য শের শাহ ঘোড়ায় দাগ দেয়ার প্রথা চালু করেন। তিনি সমগ্র রাজ্যকে ১১,৬০০ পরগণায় বিভক্ত করে প্রত্যেকটি পরগণায় পাঁচজন কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং জমির মাপজোখ স্থির করে কৃষকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই পরে মোগলারা দেশ শাসনে সাফল্য লাভ করে। এই সময় সোনারগাঁ থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত যে মহাসড়ক নির্মিত হয় তা পরে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাতি লাভ করে।

শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪৫-৫৩) বাংলাদেশের বৃহদংশ দিল্লির অধীনে ছিল। ইসলামের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান সুর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মগদের তাড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান দখল করে নেন। আরাকানে অবশ্য তাঁর দখল স্থায়ী হয়নি।

দিল্লিতে ইসলাম শাহের নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহকে হত্যা করে শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান, মুহম্মদ শাহ আদিল নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সেনাপতি হিমুর হাতে ছাপরঘাটের যুদ্ধে বাংলার সুলতান মুহাম্মদ শাহ প্রাণ হারান।

ইতোমধ্যে আফগান সামন্তদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে দিল্লি দখল করে নেন। তাঁর নাবালক পুত্র আকবরের অভিভাবক বৈরাম খান দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে মোগল সাম্রাজ্য বিপদমুক্ত করলেন।

মুহাম্মদ শাহের পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-১৫৬০) সুরজগড়ের যুদ্ধে আদিল শাহকে পরাজিত ও নিহত করে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। বাহাদুর শাহ জৌনপুর অধিকার করতে গিয়ে মোগলদের কাছে মার খেয়ে গৌড়ে ফিরে আসেন। দক্ষিণ বিহারে তিনি তাজখান কররানিকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালাল শাহ দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন (১৫৬০-৬৩) নাম নিয়ে তিন বৎসর রাজত্ব করে ১৫৬৩ সালে মারা যান। তাঁকে হত্যা করে অজ্ঞাতকুলশিল তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতা দখল করেন এবং পরে তাজখান কররানির হাতে তিনি মারা যান।

কনৌজের যুদ্ধে তাজখান ও সুলায়মান খানের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য শেরশাহ তাঁদেরকে বিহারে জায়গির দেন। ইসলাম শাহের নাবালক পুত্র ফিরোজের মন্ত্রী ছিলেন তাজখান। আদিল শাহ দিল্লি দখল করে নিলে তিনি প্রথমে গোয়ালিয়রে পালিয়ে যান এবং পরে বিহারে তাঁর ভাইদের সঙ্গে মিলিত হন।

তাজখান (১৫৬৪-১৫৬৫) অল্পদিন রাজত্ব করে মারা যান। তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান (১৫৫৫-১৫৭২) বাংলা ও বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেন। মোগলদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আফগানরা দলে দলে সুলায়মানের রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সুলায়মানের পুত্র বায়জিদ ও সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন। কালাপাহাড় নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে তিনি মুসলমান হন। এই দুর্ধর্ষ সেনাপতি পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং কামাখ্যা, হাজো ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু

মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। সংস্কারবিরোধী বা ধর্মবিদ্বেষীর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কালাপাহাড়' নামটি আজও ব্যবহৃত হয়।

কোচবিহার আক্রমণ করে রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র খ্যাতনামা সেনাপতি শুক্লধ্বজকে সুলায়মান পরাজিত ও বন্দি করেন। কালাপাহাড় কামাখ্যা ও হাজো পর্যন্ত দখল করে নেন। উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দেখা দিলে সুলায়মান শুক্লধ্বজকে মুক্তি দিয়ে ও বিজিত স্থান প্রত্যপর্ণ করে বিশ্বসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। মোগল সম্রাট আকবর কররানি-রাজ্য আক্রমণ করার যাতে কোনো অজুহাত না পান, তার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বেসর্বা হয়েও সুলায়মান শাহ বা সুলতান নাম নেননি। হজরত আলা উপাধি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। মোগল শত্রুদের গোপনে সাহায্য করলেও সুলায়মান তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রি লোদির পরামর্শে আকবরের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েননি। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য এ সময় রাজধানী গৌড় থেকে কিছুদূরে তাঁড়ায় স্থানান্তরিত হয়।

১৫৭২ সালে সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়জিদ পিতার নীতি অনুসরণ না করে নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রকাশ করেন। এই উদ্ধত ও দুঃশিল যুবক লোহানি আফগানদের হাতে প্রাণ হারান। মন্ত্রী লোদির সহায়তায় সুলায়মানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ সিংহাসন লাভ করেন। দাউদ স্বীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণার জন্য বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন। আকবর তাঁর বিরুদ্ধে মুনিম খানকে পাঠালেন। মন্ত্রী লোদি ও মুনির খানের মধ্যে সখ্যতা থাকায় দুই পক্ষে একটা সমঝোতা হয়। দাউদ তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী লোদিকে হত্যা করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। আকবর মুনিমকে পাঠালেন বিহার জয় করার জন্য। নয় মাস ধরে পাটনা দুর্গে অবরোধ করেও মুনিম ব্যর্থ হলেন। আকবর নিজে পাটনা জয়ের ভার নিলেন। নদীর অপর পারে হাজিপুর দখল করে পাটনা দুর্গের রসদ সরবররাহ তিনি বন্ধ করে দিলেন। দাউদ মোগলদের বাধা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অমাত্য ও সেনাপতিরা তাঁকে অজ্ঞান করে তাঁড়ায় নিয়ে গেলেন। মুনিম খান বাংলা আক্রমণ করলে দাউদ প্রথমে সাতগাঁয়ে এবং পরে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। ৩রা মার্চ ১৫৭৫ তুকারয়ের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে কটকে আশ্রয় নেন। কটকের সন্ধি অনুসারে স্থির হয় বাংলা ও বিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হবে এবং দাউদ মোগল সম্রাটের সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসন করবেন। মুনিম তাঁড়ায় ফিরে বাংলার রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করলেন। সেখানের প্লেগ মহামারী দেখা দেয়ায় মোগল বাহিনীর বহু সৈন্য ও সেনাপতি মারা গেল। গৌড় ছেড়ে তাঁড়া ফিরে যাওয়ার সময় মুনিমের মৃত্যু হলো। মোগল শিবিরের বিশৃঙ্খলার সুযোগে দাউদ পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনর্দখল করে তাঁড়ায় প্রবেশ করলেন। সাতমাস ধরে মোগলদের ঠেকিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত ১২ই জুলাই ১৫৭৬ রাজমহলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হলেন।

৮. মোগল বাদশাহি

দাউদের মাথা কেটে আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সাঁইত্রিশ বছরের আফগান শাসনের অবসান হলো, কিন্তু এর পর আরও দু'দশক পর্যন্ত শহর ও ছাউনি ছাড়া

মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো না। ১৫৭৫ থেকে ১৭১৬ পর্যন্ত সাঁইত্রিশ জন মোগল সুবাদার বাংলায় শাসন করেন।

মোগলবাহিনী দক্ষিণে সাতগাঁ ও উত্তরে ঘোড়াঘাট অঞ্চল দখল করে পূর্বে ভাওয়ালে পৌঁছলে সেখানকার জমিদাররা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। সোনারগাঁর জমিদার ঈসা খান এগারসিন্ধুর যুদ্ধে পরাজিত হলেন, কিন্তু মজলিস দিলওয়ার ও মজলিস কুতুবের কাছে নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোগল সুবাদার খান জাহান তাঁড়ায় ফিরে গেলন। যাঁরা মোগলের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন তাঁরা আবার বিদ্রোহ করলেন।

সৈন্য ও কর্মচারীদের বেতন হ্রাস, সম্পত্তির কড়া তল্লাসি, রাজস্ব আদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, ঘোড়ার দাগ দেয়ার কড়াকড়ি এবং আকবরের দীন-ই-ইলাহির বিরুদ্ধে বাংলা ও জৌনপুরের কাজিদের ফতোয়া ইত্যাদি কারণে মোগল ছাউনিতে এক দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের নেতা বাবা খান কাকশালের সঙ্গে যোগ দিলেন আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা হাকিমের ধাত্রীপুত্র মাসুমখান কাবুলি। ১৯ শে এপ্রিল ১৫৮০ মোগল সুবাদার মুজাফফর খান তুরবাতিকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা হাকিমকে সম্রাট বলে ঘোষণা করল। প্রায় দুই বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পর সম্রাট আকবর এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

যে সব জমিদারেরা প্রথমে মোগলদের অধীনতা স্বীকার করেননি তাঁরাই বাংলার ইতিহাসে 'বারোভুঁইয়া' নামে পরিচিত, যদিও সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন বারোর অনেক বেশি। দেশাভিমানে আমরা বারোভুঁইয়াদের বড় করে দেখছি। ব্যক্তিগত সামন্তস্বার্থ ছাড়া এই ভুঁইয়ারা কোনো ব্যক্তি বা আদর্শকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। এদের কেউ কেউ দূর দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেন। 'জোর যার মুলুক তার' এই প্রবাদ বাক্যকে অসহায় নিরস্ত্র জনসাধারণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

মোগলসেনাপতি মানসিংহের তৎপরতার ফলে বহু আফগান ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভুঁইয়াদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ঈসা খান। অযোধ্যার এক ধর্মান্তরিত রাজপুত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দাউদ খানের পরাজয়ের পর বাংলাদেশে ঈসা খানই ছিলেন মোগলদের প্রধান প্রতিপক্ষ। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরের বেশ কিছু অঞ্চল তাঁর দখলে ছিল।

মোগলদলত্যাগী মাসুম খান কাবুলি ও অন্যান্য স্থানীয় ভুঁইয়ারা ঈসার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ১৫৮৪ সালে মোগল সুবাদার শাহবাজ খান (১৫৮৩-৮৫) ভাওয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁড়ায় ফিরে যান। পরে বেশ কিছু আফগান সর্দার দলত্যাগ করায় ঈসা খান উত্তর বাংলার বিজিত স্থানগুলো ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ১৫৯৬ সালে তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ মোগলরা দখল করে নিলে ঈসা আবার বিদ্রোহ করেন। কাত্রাভু দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে সুবাদার মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৬)-এর পুত্র দুর্জয় সিং নিহত হন। ১৫৯৭-এর শেষ পর্যন্ত ঈসা খান সন্ধি করতে বাধ্য হন। ঈসার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খান ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৬০৩ সালে মানসিংহ মুসা খান, বিক্রমপুরের কেদার রায় ও অন্যান্য ভুঁইয়াদের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। আহত কেদার রায় বন্দিদশায় প্রাণ হারান।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)-এর সময় সুবাদার ইসলাম খান চিস্তি (১৬০৮-১৩) ভুঁইয়াদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হন। যশোরের প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় এবং বিষ্ণুপুর, বীরভুম, হিজলী ও ভুঁষণার ভুঁইয়ারা বাধ্য হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মজলিস কুতবের ফতেবাদ মোগলরা দখল করে নেয়। মাস কয়েক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৫ই জুলাই ১৬১০ মুসার যাত্রাপুর দুর্গ দখল করে মোগলবাহিনী ডাকচরায় ঢুকে পড়ে। মুসা খান ও তাঁর সহযোগীরা লক্ষা নদী তীরে নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

ভুঁইয়াদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য এই সময় সুবাদারের রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আনা হয়। ইসলাম খান ঢাকার নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। নামটা ঢাকার লোকের তেমন পছন্দ হয়নি।

১২ই মার্চ ১৬১১ মোগল নৌবহর কাত্রাভু দুর্গ দখল করে নেয়। রাজধানী সোনাগাঁয়ের পতনের পর তাঁর সহযোগীরা তাঁকে পরিত্যাগ করলে মুসা বাধ্য হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র মোগলদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। মুগ্ধ জননী বিষপানে আত্মহত্যার জিদ ধরলে মায়ের সুসন্তান রামচন্দ্র অস্ত্র সংবরণ করলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য স্থল ও নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোগলদের হাতে বন্দি হলেন। ভুলুয়ার অনন্তমাণিক্য মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করে আরাকানে পালিয়ে গেলেন। বুকাইনগরের ওসমান খান লোহানি যুদ্ধ করলেন তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। ১২ই মার্চ ১৬১২ দৌলম্বাপুরের যুদ্ধে তিনি নিহত হওয়ায় তাঁর সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দেয়। সিলেটের অন্যান্য আফগান ভুঁইয়ারা মোগলদের হাতে ধরা পড়েন। কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর মোগল সম্রাট কর দিতে রাজি হলেন। মোগলরা কামরূপের রাজাকে সালকোনার নৌযুদ্ধে পরাজিত করে। কামরূপ জয়ের স্বল্পকাল পরেই ইসলাম খানের মৃত্যু হয়। পরবর্তী সুবাদার কাসিম খান (১৬১৪-১৬১৭) কাছাড়ের শত্রুদমনের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হন। তিনি আরাকানরাজ মেংগেবেংগ ও তাঁর ফিরিঙ্গি মিত্রদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ভুলুয়া থেকে আরাকানিদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেও চট্টগ্রাম জয় করতে ব্যর্থ হন।

কাসিম খানকে সরিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার নিযুক্ত করলেন ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জঙ্গ (১৬১৭-২৪)-কে। পরাজিত ভুঁইয়াদের পুত্রদের মুক্তি দিয়ে এবং মুসা খান ও অন্যান্য ভুঁইয়াদের উপর বাধানিষেধ তুলে নিয়ে ইব্রাহিম খান বাংলার মোগল শান্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ত্রিপুরারাজ যশোমাণিক্য মোগলদের কাছে হেরে গিয়ে আরাকানে পালিযে গেলেন। তাঁর রাজধানী উদয়পুরে মোগল সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলো। আরাকানরাজ ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে সন্দ্বীপ দখল করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুটতরাজ শুরু করায় ইব্রাহিম খান মেঘনার তীরে স্থানে স্থানে সামরিক থানার ব্যবস্থা করেন। দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেওয়ায় এবং শাহজাদা খুর্রমের বিদ্রোহের দরুন ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে মোগলদের আরাকান জয়ের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো। হিজলির জমিদার সলিম খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর বিদ্রোহ করলে ইব্রাহিম খান তাঁকে জরিমানা দিতে বাধ্য করেন। বিদ্রোহী খুর্রমকে বাধা দিতে ইব্রাহিম রাজমহলের কাছে এক যুদ্ধে

প্রাণ হারালেন। খুর্‌রম ঢাকায় সপ্তাহকাল কাটিয়ে দরাব খানকে সুবাদার নিযুক্ত করে রাজমহলে ফিরে গেলেন। পরে সম্রাটের সেনাপতি মহব্বত খানের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি দক্ষিণাপথে আশ্রয় নেন। মোগলদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আরাকানরাজ তাঁর পর্তুগিজ দোসরদের নিয়ে ঢাকা জ্বালিয়ে দিয়ে বেধড়ক লুটতরাজ করলেন। হানাদারদের বাধা দেয়ার জন্য ধোলাইখালে শিকল ফেলে কোনো লাভ হলো না।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর বিদ্রোহী পুত্র খুর্‌রম শাহজাহান (১৬২৮-৫৮) নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহসনে আরোহণ করেন। তাঁর সুবাদার কাসিম খান জুইনি (১৬২৮-৩২) প্রায় চার মাস রক্তক্ষয়ী অবরোধের পর ১৬৩২ সালে সেপ্টেম্বরে পর্তুগিজ দুর্গ হুগলি দখল করেন।

১৫৭৮-এ সম্রাট আকবর, পেদ্রো তেভারিজের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়ে তাঁকে হুগলিতে গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি দেন। বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, দস্যুবৃত্তি, দাসব্যবসা, খ্রিষ্টধর্মপ্রচার ইত্যাদি বিবিধ কর্মে ও দুষ্কর্মে পর্তুগিজরা প্রায় একশ' বছর ধরে এদেশে লিপ্ত ছিল। কার্ভালহো ১৬০২ সালে সন্দ্বীপ জয় করে স্বল্পকালের জন্য একটা ক্ষুদ্র পর্তুগিজ রাজ্য গড়ে তোলেন। হুগলির পতনের পর এদেশে পর্তুগিজ প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যরচনা, ব্যাকরণ, অভিধান ও রোমান হরফে বাংলামুদ্রণ পর্তুগিজদের কীর্তি। আজ ও আমরা একশ'র উপর পর্তুগিজ শব্দ ব্যবহার করি। আমেরিকা থেকে গোল আলু, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কামরাংগা ও তামাক এবং ইউরোপ থেকে জলপাই ও কৃষ্ণকলি এদেশে পর্তুগিজরা নিয়ে আসে।

সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদি (১৬৩৫-৩৯)-র সময় অহোমরাজ প্রতাপসিংহের সঙ্গে মোগলদের একটানা বহু দিনের যুদ্ধ হয়। অবশেষে উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অসুরালি, অহোম রাজ্য ও মোগল অধিকৃত কামরূপের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট করে ১৬৩৮ সালে দুই পক্ষে সন্ধি হয়। গৌহাটিতে কামরূপের ফৌজদারের ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

১৬৩৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজা সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের সুবাদারির সময় বাংলার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। সাক্ষাৎ রাজকুমার সুবার প্রধান শাসনকর্তা হওয়ার পার্শ্ববর্তী রাজাদের আনুগত্য লাভ করা মোগলদের পক্ষে সহজ হয়। পর্তুগিজদের পর এই সময় ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ব্রাউটনের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে শুজা ইংরেজ বণিকদের বার্ষিক তিন হাজার টাকা করের বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দেন।

শাহজাহান অসুস্থ হওয়ায় শাহজাদাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৬৫৭ সালের নভেম্বরে শুজা রাজহলে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আওরংগজেব তাঁর দুই ভ্রাতা দারাশিকোহ ও মুরাদকে হত্যা করে আলমগির নাম নিয়ে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ৫ই জানুয়ারি ১৬৫৯ খাজুয়ার যুদ্ধে আওরংগজেবের কাছে পরাজিত হয়ে শুজা প্রথমে রাজমহলে এবং পরে ঢাকায় পালিয়ে এলেন। শুজার সেনাপতি ও স্থানীয় জমিদাররা তাঁকে পরিত্যাগ করায় শুজা আরাকানে আশ্রয় নেন এবং সেখানে এক চক্রান্তে প্রাণ হারাণ।

মোগল শিবিরে এই গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কুচবিহাররাজ কামরূপ এবং অহোমরাজ গৌহাটি দখল করে নেন। সুবাদার মিরজুমলা (১৬৬০-১৬৬৩) এক বিরাট সেনাবাহীনী নিয়ে কুচবিহার আক্রমণ করলে রাজা প্রাণনারায়ণ প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হলো। প্রায় এক বৎসর একটানা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অহোমরাজ মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ভারলির পশ্চিম, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও কালং নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলো। ঢাকা ফেরার পথে খিজিরপুরে ৩১শে মার্চ, ১৬৬৩ মিরজুমলা প্রাণ ত্যাগ করেন।

দুইজন অস্থায়ী সুবাদারের পর সম্রাট আওরংজেব সুবা বাংলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর মাতুল শায়েস্তা খানকে সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে শায়েস্তা খান বিহার, মালব, গুজরাটের শাসনকর্তা হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। তিনি দুইবারে (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮) মোট বাইশ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। ৮ই মার্চ ১৬৬৪ প্রথম যখন শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীরনগরে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। এই বয়সেও তিনি যথেষ্ট উদ্যম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের সহায়তায় শায়েস্তা খান দেশে মোগলশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তখন সরকারের দৈনিক আয় হতো দুই লক্ষ টাকা। জাঁকজমকপ্রিয় শায়েস্তা খান দৈনিক ব্যয় করতেন এক লক্ষ টাকা। সরকারের এক কোটি তিন লক্ষ টাকা নিজের নামে তুলে নেওয়ার অভিযোগের জবাবদিহির জন্য সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে তলব করেন।

১৬৮৪ সালে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য চালের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শায়েস্তা খানের চেষ্টায় চালের দাম টাকায় আট মণ হওয়ায় তিনি পুরানো কেলার পশ্চিম দরওয়াজা বন্ধ করে হুকুম দিলেন, চালের দাম আবার টাকায় আট মণ না হওয়া পর্যন্ত সেই দরওয়াজা কেউ খুলতে পারবেন না।

মিরজুমলা হিজলির বিদ্রোহী জমিদার বাহাদুর খানকে বন্দি করে রেখেছিলেন। বাহাদুর খান সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে কর দেওয়ার অঙ্গীকার করায় শায়েস্তা খান তাঁকে মুক্তি দেন। মোরং ও জয়ন্তিয়ার রাজারা মোগদের বিরুদ্ধাচারণ করলেও অবশেষে শায়েস্তা খানের কাছে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সম্রাটকে কর দিতে রাজি হন।

কুচবিহারের প্রজারা মোগল রাজস্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আসামে মির জুমলার ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে রাজা প্রাণনারায়ণ কুচবিহার পুনর্দখল করেন। শায়েস্তা খানের ভয়ে তিনি অবশ্য সম্রাটকে কর দিতে রাজি হন। তাঁর মৃত্যুর পর কুচবিহারের সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয় এবং মোদনারায়ণ সিংহাসন আরোহণ করেন। বিদ্রোহী মোদনারায়ণকে পরাজিত করে শায়েস্তা খানের পুত্র ইবাদত খান কুচবিহার আবার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

বেশ কয়েক দশক থেকে চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকারে ছিল। ১৬১৭-এ আরাকানরাজ পর্তুগিজদের কাছ থেকে সন্দ্বীপ কেড়ে নিয়ে মেঘনার তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ করতে থাকেন। পর্তুগিজ হার্মাদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরাকানী মগরা কয়েক দশক ধরে নিষ্ঠুর দাসব্যবসায় লিপ্ত থাকে। সেই থেকে আমাদের ভাষায়

অরাজকতা বলতে 'মগের মুলুক' কথাটা চলে আসছে। চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্তার সঙ্গে পর্তুগিজের সংঘর্ষ বাঁধলে শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের আশ্রয় দেন।

শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান স্থলপথে এবং নৌসেনাপতি ইবনে হোসেন জলপথে চট্টগ্রাম অভিযানে বের হন। এই সাঁড়াশি আক্রমণের ফলে ২৭শে জানুয়ারি ১৬৬৬ চট্টগ্রামে মগ-শাসনের অবসান ঘটে। দলিল-দস্তাবেজ মঘী সন ও জমির মাপে মঘী কানি সেই মগ শাসনের স্মৃতি বহন করছে।

শুজা ইংরেজদের যে বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন তা রদ করে আওরংগজেব সকল বণিকের জন্য ৩$\frac{১}{২}$% শুল্ক ধার্য করেন। শুল্ক আদায় নিয়ে হুগলিতে মোগল কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাঁধে এবং ইংরেজরা বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৬৮-তে ইংরেজরা বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করত ৩৪ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি। সেই রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮১ তে দাঁড়ায় ২৩ লক্ষে। ইংরেজ বণিকরা বাংলা ছেড়ে যাওয়ায় দেশে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। সম্রাটের আদেশে পরে সুবাদার ইব্রাহীম খান (১৬৮৯-৯৭) ইংরেজদের আবার আমন্ত্রণ জানান। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট যোব চার্নক সুতানুটি ফিরে এসে ১৬৯০ সালে কুঠি স্থাপন করেন। শায়েস্তা খানের পর দেশে অরাজকতা ও দুর্নীতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সুবাদার খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-৮৯)-কে অকর্মণ্যতার জন্য বরখাস্ত করে আওরংগজেব ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-৯৭)-কে সুবাদার নিযুক্ত করেন।

১৬৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের চেতোবর্দার জামিদার শেভো সিংহ বর্ধমানের ইজারাদার কৃষ্ণরামকে হত্যা করে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নেন এবং ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করেন। হুগলির ফৌজদার প্রথমে ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে ওলন্দাজদের সহায়তার তিনি হুগলি আক্রমণ করলে শোভা সিংহ সরে গিয়ে বর্ধমানে তাঁর প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খান তাঁর দলবল নিয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলান। কৃষ্ণরামের কন্যা নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য ছুরিকাঘাতে শোভাসিংহকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহীরা রহিম খানের নেতৃত্বে মুখশুসাবাদ ও কাশিমবাজার লুট করে এবং রাজমহল ও মালদহ দখল করে নেন। শান্তিশৃঙ্খলার এই অবনতি লক্ষ্য করে আওরংগজেব ইব্রাহিম খানকে বরখাস্ত করে তাঁর পৌত্র আজিমুদ্দিনকে (১৬৯৭-১৭১২) সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬৯৮ সালের আগস্টে রহিম খান মোগলদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারালে তাঁর দলবল ভেঙে যায়। দেশে এই অরাজকতার অজুহাতে বিদেশি বণিকরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুবাদারের কাছ থেকে যে অনুমতি পেয়েছিলেন তাঁর সুযোগে স্ব স্ব এলাকায় নিজেদের দুর্গ গড়ে তোলেন। স্থানীয় বণিকবিত্তবানেরা বিদেশিদের আশ্রয়ে স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা, ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি কিনে এক নতুন বন্দরনগরীর ভিত্তি স্থাপন করে।

সরকারের নামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও মূল্যবান সামগ্রীর একচেটিয়া ক্রয় করার যে সওদা-ই-খাস নীতি শুজা প্রবর্তন করেন তার ব্যাপক অপব্যবহার হয় আজিমুদ্দিনের সময়; পরে আওরংগজেব এই প্রথার বিলোপ করায় আলিমুদ্দিন নানা

উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান এ সম্পর্কে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করলে আজিমুদ্দিন তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন।

সম্রাট আদেশে মুর্শিদকুলি দেওয়ানি বিভাগ মখশুসাবাদে স্থানান্তরিত করেন। পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে মুর্শিদকুলি খানের নামে উক্ত নগরীর মুর্শিদাবাদ নামররণ করা হয়। আওরংগজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) তাঁর পুত্র আজিমুদ্দিনের প্ররোচনায় মুর্শিদকুলি খানকে দক্ষিণাপথে দেওয়ান নিয়োগ করেন। বাংলার নবনিযুক্ত দেওয়ান বিদ্রোহী সৈন্যদের হস্তে নিহত হলে মুর্শিদকুলি খানকে আবার ১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান করা হয়।

৯. নবাবি আমল

সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজিমুদ্দিন ও তাঁর দুই ভ্রাতা প্রাণ হারান। জাহাঁদার শাহ প্রথমে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত ফররুখসিয়ার (১৭১৩) দিল্লির মসনদ দখল করেন। এই গোলযোগে বাংলার সুবাদারিতে দারুণ সংকট দেখা দেয়। শাহাজাদা ফররুখসিয়ার (১৭১৩) ও মিরজুমলা মুজাফ্‌ফর জঙ্গ (১৭১৩-১৬) সুবাদার নিযুক্ত হলেও তাঁরা কখনও বাংলাদেশে আসেননি। মুর্শিদকুলি খানই প্রাদেশিক শাসনকর্ম চালিয়ে যান। ১৭১৭ সালে তিনি সম্রাট ফররুখসিয়রকে এক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার সুবাদারি লাভ করেন। তখন থেকে বাংলার সুবাদার সম্রাটের বার্ষিক রাজস্বটি আদায় করে প্রায় স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। ১৭১৯ সালে, এক বছরে, পাঁচ পাঁচজন সম্রাট দিল্লির ময়ূরসিংহাসন অলংকৃত করেছেন আর উজিরদের কথায় তাঁরা উঠছেন আর বসছেন। দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর অভাবে প্রশাসনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলি খান একই সঙ্গে বাংলা ও বিহারের দেওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও দেওয়ানের দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করেন। একই ব্যক্তিকে একাধিক পদে নিয়োগ করার ফলে দেশের প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

রাজস্ব আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মুর্শিদকুলি খান মাল-ই জামিনি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ভূমি জরিপ করে প্রজার খাজনা ইজারাদারের দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয় এবং আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর নিষিদ্ধ করা হয়। রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বাংলার সুবাকে তেরটি চাকলায় বিভক্ত করে রাজস্ব আদায়ের ভার ইজারাদারকে দেওয়া হয়। মুর্শিদকুলি ইজারাদার ও রাজস্ববিভাগের কর্মচারীদের কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভুষণার জমিদার সীতারাম রায় রাজস্ব দেয়া বন্ধ করায় এবং হুগলির ফৌজদারকে হত্যা করায় মুর্শিদকুলির আদেশে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মুসলমান কর্মচারীদের দক্ষতা ও নিয়মানুগতার অভাবের জন্য মুর্শিদকুলি খান সাধারণত হিন্দু কর্মচারীদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেন। এই সময়কার নাটোর, দিঘাপতিয়া, ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছার হিন্দু ইজারাদারা পরবর্তীকালে বড় জমিদার হয়ে উঠে।

যখন ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য ও পারস্যে সাফাবি রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছে তখন মুর্শিদকুলি খানের বদৌলতে সুবা বাংলায় শান্তি বিরাজ করছিল। তাই ইউরোপ, ইরান, আর্মেনিয়া ও পশ্চিম ভারতের বণিক, পোদ্দার ও মহাজনদের সঙ্গেসঙ্গে ভাগ্যান্বেষী

ভাড়াটে সৈন্যরাও বাংলায় এসে ভিড় করেছিল। এরাই পরে দেশের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নানা উপঢৌকন দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি সম্রাট ফররুখসিয়ারের কাছে ১৭১৭ সালে এক ফরমান যোগাড় করেন। এই ফরমান অনুযায়ী বার্ষিক তিন হাজার টাকা করের বিনিময়ে কোম্পানি দেশে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পায়। কথা থাকে যে, কোনো শুল্কচৌকিতে কোম্পানির জাহাজ বা নৌকা কোনো অজুহাতে আটক করা হবে না। কোম্পানির মালামাল চুরি হলে, সরকার তা ফিরিয়ে দেবে বা খেসারত দেবে। মুর্শিদাবাদ টাকশালে কোম্পানি নিজের টাকা তৈরি করতে পারবে ও কোম্পানি নিজের কর্মচারীদের বিচার করতে পারবে এবং কোম্পানিকে কলকাতার আশেপাশে আটত্রিশটি গ্রামের জমিদারি দেওয়া হবে। কোম্পানির অভিযোগ ছিল বাংলার সুবাদরার তাঁদের বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করেন এবং তাদেরকে বৈধ সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করেন। বিদেশি বণিকদের তৎপরতায় দেশে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় তাদের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে বাংলার সুবাদাররা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করেন। প্রশাসনিক দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠনিক দুর্বলতার জন্য তারা শেষ রক্ষা করতে পারল না। মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর (৩০শে জুন, ১৭২৭) পর তাঁর জামাতা শুজাউদ্দিন (১৭২৭-৩৯) মুর্শিদাবাদের চেহেল-সেতুন প্রাসাদের মসনদ দখল করেন। মুর্শিদকুলি খানের মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খান মাতার পরামর্শে পিতা শুজাউদ্দিনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহের অনুমতিক্রমে বাংলা ও উড়িষ্যার সঙ্গে শুজাউদ্দিনকে বিহারেরও সুবাদার নিয়োগ করা হয়।

শুজাউদ্দিন বাংলার পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কিছু অংশ সরাসরি নিজের শাসনে রাখেন। অবশিষ্ট অংশের জন্য তিনি তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানকে ঢাকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন। উড়িষ্যার জন্য তকি খানকে ও বিহারের জন্য আলিবর্দি খানকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করা হয়। ঢাকার নায়েব-নাজিমের সহকারী মির হাবিব ত্রিপুরার রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে রাজধানী চণ্ডিগড় ও সেই রাজ্যের বেশ কিছু অংশ দখল করেন। শুজাউদ্দিন মির হাবিবকে বাহাদুর খেতাব দেন। এই মির হাবিবই পরে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম বাংলায় লুটপাট করেন।

মালাজামিনি ব্যবস্থার সংশোধন করে এবং জমিদারে উপর কয়েকটি আবওয়াব আরোপ করে শুজাউদ্দিন দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জামান বিদ্রোহ করলেও পরে তিনি নবাবেব বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। শুজাউদ্দিন ইউরোপীয় বণিকদের উপর কড়া নজর রাখতেন। তাঁর সময় চালের দাম টাকায় আট মণ হওয়ায় ঢাকার পুরানো কিলার পশ্চিম দরওয়াজা আবার খুলে দেওয়া হয়।

নাদির শাহের দিল্লি লুণ্ঠনের সময় শুজাউদ্দিনের উত্তরাধিকারী সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০) ভয়ে পেয়ে তাঁর কাছে রাজস্ব পাঠান, তাঁর নামে মুদ্রা চালু করেন এবং খুৎবা পাঠ করেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদকে দেওয়ানের পদ থেকে সরফরাজ খান অপসারিত করায় আলিবর্দি তাঁর প্রভুপুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ৯ই এপ্রিল ১৭৪০ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। মোগল সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের

উপঢৌকন দিয়ে আলিবর্দি সুবাদারির সনদ পেলেন ঠিকই, কিন্তু বহিরাক্রমণ , বিদ্রোহ ও বিশ্বাসহীনতা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিল না।

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত চলল বর্গিদের হামলা। রাজধানী মুর্শিদাবাদও রেহাই পেল না। মারাঠা সরকারে অশ্ব ও অস্ত্রের সজ্জিত নিম্নশ্রেণীর সৈন্যদের 'বারগির' বলা হতো। দশ বছর ধরে বর্গিদের ব্যাপক লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নরহত্যা ও অগ্নিসংযোগ বাংলার ইতিহাসে বর্গির হাঙ্গামা নামে পরিচিত। সেই ত্রস্তকালের ছাপ রয়ে গেছে দস্যি ছেলেকে ঘুমপড়ানোর গানে। বর্গি উপদ্রুত অঞ্চলের কন্যাদের তখন কেউ বিয়ে করতে চাইত না। আলিবর্দিকে একক হস্তে সেই দস্যুদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেত করে ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি হত্যা করিয়েছেন। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর অবশেষে ১৭৫১ সালের মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হলো। রঘুজি ভোঁসেলাকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা কর দেবার বিনিময়ে মরাঠারা প্রতিশ্রুতি দিল তারা আর সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করবে না। উড়িশ্যায় বাংলায় প্রাধান্য শেষ হলো। ইতোমধ্যে সৈন্যদলে আফগান-বিদ্রোহ, মিরজাফরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবাধ্যতা, প্রিয়তম দৌহিত্র সন্দিহান সিরাজউদ্দৌলার উপবিদ্রোহের মোকাবেলা করতে গিয়ে আলিবর্দিকে অনেক ধকল পোহাতে হয়।

১৭৪৫ সালে আলিবর্দি এক পরওয়ানা জারি করে বিদেশি বণিকদের জানিয়ে ছিলেন তারা এদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে না। ইংরেজদের তিনি মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করে বলতেন তারা মধু দেয়, কিন্তু খোঁচা মারলে হুল ফোটায়। তাঁর নৌশক্তির অভাবের কথা ভেবেই তিনি বলতেন, 'ডাঙার আগুন তো নেভানো যায়, সাগরের আগুন নেভাবে কে?' আসলে তখন ডাঙাতেও বহু মনে লোভ, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। বৈধ ক্ষমতার সূত্র একবার ছিন্ন হলে তাকে জোড়া দেওয়া মুস্কিল। অপুত্রক আলিবর্দি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এই মনোনয়ন মেনে নেন নি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম ও মধ্যমা কন্যার পুত্র শওকত জঙ্গ। সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্দি করে তাঁর ধনরত্ন হস্তগত করেন। তাঁর দেওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস বহু অর্থসম্পদ নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নেন। পলাতক কৃষ্ণদাসের প্রত্যর্পণ দাবি করে সিরাজ ইংরেজদের কাছে তাঁর দূত নারায়ণ দাসকে পাঠালেন।

পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ দিল্লি থেকে সুবাদারির ফরমান আনার চেষ্টা করছেন খবর পেয়ে তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য সিরাজ রাজমহল পৌঁছলেন। ২০শে মে ১৭৫৬, তাঁর দূতকে ইংরেজরা গুপ্তচর বলে তাড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ পেয়ে সিরাজ তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদে ফিরে প্রথমে ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠি দখল করলেন এবং পরে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবরোধ করলেন। দুইদিন যুদ্ধের পর ড্রেকের অধীনে বেশ কিছু ইংরেজরা পালিয়ে গেল ফলতায়। অস্থায়ী গভর্ণর হলওয়েল আত্মসমর্পণ করলেন। কতকগুলো মাতাল ও উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজরা রাত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা করলে তাদেরকে, হলওয়েলের মতে ১৪৬জনকে, এক আঠারো ফুট লম্বা ও চৌদ্দফুট দশ ইঞ্চি চওড়া ঘরে বন্দি করা হয়। জুন মাসের গরমে ২৩জন ছাড়া নাকি সকল বন্দি

মারা যায়। 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত এই ঘটনা সমসায়িককালে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। প্রায় আট মাস পরে বত্রিশ বছর বয়সের ক্লাইভ বিশ বছরের সিরাজকে লিখছেন, 'তিনি নবাবকে তাঁর পিতামাতার মর্যাদার আসন দিয়েছেন এবং পুত্র হিসেবে নবারের প্রাণ রক্ষার জন্য জীবন দান করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।' পরবর্তীকালে ইংরেজদের নেটিভ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেলে, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এই 'প্রাচ্য বর্বরতা' নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়।

নৌশক্তির অভাবে নবাবের সাধ্য ছিল না ফলতা আক্রমণ করার। শিখ পোদ্দার মানিকচাঁদকে কলকাতার ভার দিয়ে সিরাজ মুর্শিদাবাদ ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে শওকত জঙ্গ সম্রাটের কাছ থেকে সুবাদারির সনদ জোগাড় করায় সিরাজকে পূর্ণিয়ায় যেতে হলো। ১০ই অক্টোবর ১৭৫৬ সালে মনিহারির যুদ্ধে শওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলেন। মাস কয়েক পরে ২রা জানুয়ারি ১৭৫৭ রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন বিনা বাধায় কলকাতা পুনর্দখল করলেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবাবের যথেষ্ট সৈন্য থাকলেও কলকাতার পতনের পর সিরাজ তাঁর সেনাপতিদের আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। এদিকে গুজব রটল, আফগান হানাদার আহমদ শাহ আবদালি বিহার আক্রমণ করতে আসছেন। অনন্যোপায় হয়ে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধি করলেন। কোম্পানি তার সব বিশেষ অধিকার ফিরে পেল। নবাব শুধু প্রতিশ্রুতি পেলেন, তাঁর শত্রুকে ইংরেজরা নিজেদের শত্রু বলে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজন হলে নবাবকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষী যুদ্ধ বাধার খবর পেয়ে ক্লাইভ ফরাসিদের চন্দননগর দুর্গ দখল করে নেন। আহম্মদ শাহ আবদালির সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের পরামর্শে সিরাজ ইংরেজদের একদিকে অভিনন্দিত করলেন, আবার কাসিমবাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ ল'কে প্রথমে দরবারে আশ্রয় দিয়ে পরে তাঁকে বিদায় দিলেন। দক্ষিণাপথ থেকে ফরাসি সেনাপতি বুসি বাংলার দিকে এগিয়ে আসছেন শুনে সিরাজ ইংরেজ কোম্পানির যেমন সাহায্য চান তেমনি পাটনায় পলাতক ফরাসিদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর জন্য ক্লাইভ অনুমতি চাইলে সিরাজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইতোমধ্যে ৩রা এপ্রিল কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল সিরাজকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তাব নিল। আলিনগরের সন্ধির শর্ত অমান্য করে ক্লাইভ নবাবের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তাঁর তারুণ্য, তাঁর ব্যবহার ও তাঁর বিতর্কিত অর্বাচীন উত্তরাধিকারের জন্য নবাবের শত্রুর অভাব ছিল না। নবাবের মুসলমান সেনাপতি মির জাফর, ইয়ার লুৎফ খান ও খাদিম হোসেন, মারওয়ারি মহাজন জগৎশেঠ, শিখ পোদ্দার উমিচাঁদ এবং হিন্দু কর্মচারী রায়দুর্লভ সকলে মিলে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন সিরাজকে সরিয়ে মির জাফরকে বসাবেন বাংলার মসনদে। বহিরাগত মির জাফর ছিলেন এ বেতালিম উড়নচণ্ডি সেপাই। নজফের এই সৈয়দজাদার বংশমর্যাদায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে আলিবর্দি খান তাঁর সৎ-বোনের বিয়ে দেন। পরে আলিবর্দিকে হত্যা করতে গিয়ে মির জাফর ব্যর্থ হন। বৃদ্ধ নবাব তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

বিশ বছরের তরুণ নবাব কোনো কিছুতেই মন স্থির করতে পারছেন না। মির জাফরকে প্রধান সেনাপতি ও বখশির পদ থেকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন, আবার পরে তাঁরই কাছে আলিবর্দির দোহাই দিয়ে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করলেন। মির জাফর একদিকে কোরান স্পর্শ করে শপথ করলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন, আবার অপর দিকে ১০ই জুন নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্র-চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর দিলেন। তিন দিন পর ক্লাইভ আলিনগরের শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে এই অভিযোগ করে নবাবের কাছে চরমপত্র পাঠালেন, এই ব্যাপারে মির জাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মিরমদন মোহনলালকে সালিসের ভার দেওয়া হোক। এই ক্লাইভই ২৯শে মার্চ, ১৭৫৭ মাদ্রাজ কাউন্সিলকে জানান যে, নবাব আলিনগর সন্ধির সব শর্তই পালন করেছেন। ১৩ই জুনের চরমপত্রের উত্তর পাওয়ার আগেই ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। ২১শে জুন কাটোয়া পৌঁছে কোম্পানির যুদ্ধ-পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সেখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বাসঘাতক মির জাফরকে কি ভরসা করা যায়! ঘণ্টাখানেক পরে ক্লাইভ মনস্থির করলেন এগুতেই হবে, মিরজাফর যা করে করুক। ২৩শে জুন ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধে নবাবের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য কোম্পানির তিন হাজার সৈন্যের কাছে হার মানল। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে ছিল আট'শ ইউরোপীয় এবং বাইশ শ' দেশি সিপাই। সিপাইদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সিরাজ পালিয়ে রক্ষা পেলেন না। তাঁর পিতার অনুগ্রহে লালিত মুহম্মদি বেগের হাতে তিনি নিহত হলেন। তাঁর বিধবা পত্নী লুৎফুন্নিসাকে মির জাফর তাঁর হেরেমে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলে বেগম উত্তর দেন, 'একবার যে হাতিতে সওয়ার হয়েছে সে কখনও গাধার পিঠে চড়তে পারে না।'

৩রা জুলাই যখন একদিকে সিরাজের লাশ নিয়ে এক শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করেছে এবং শহুরে লোকেরা নিহত নবাবের উপর তাহশির (গঞ্জনা) বর্ষণ করছে, তখন আর একদিকে বিজয়ী ইংরেজরা মিলিটারি ব্যান্ড বাজিয়ে দুশ' নৌকায় লুটের বখরা বোঝাই করে কলকাতা রওয়ানা হচ্ছে। ভাগীরথী বেয়ে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে যে বন্দিনী হলেন তেমন কোনো কথা সেদিন কারও মনে মনে খেয়াল হয়নি।

১০. ইংরেজ রাজত্ব

মির জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলেও, বিচিত্র উর্দি-অস্ত্রে সজ্জিত বিশৃঙ্খল দেশি ফৌজের পক্ষে উন্নততর রণকৌশলে-প্রশিক্ষিত কোম্পানির পল্টনকে বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। যাভায় ওলন্দাজদের কাছে মার খেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফিরে এসে ফরাসি দুপের কাছে ইংরেজরা শিখেছে, এদেশের সিপাইদের কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ঘাঁটি গাড়া সম্ভব।

মির জাফর তাঁর সৈন্যের উপর ভরসা করতে পারেননি। ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তাঁকে ইংরেজদের শরণাপন্ন হতে হয়। ষড়যন্ত্র-চুক্তির অর্থ শোধ করতে না পারায় এবং ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে আঁতাত করার চেষ্টা করায় কোম্পানি মির জাফরকে সরিয়ে মির কাসিমকে মসনদে বসালো (অক্টোবর ১৭৬০)। মির কাসিম

কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি রাজধানী মুঙ্গেরে সরিয়ে নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইংরেজ কর্মচারীরা কোম্পানির নামে অবৈধভাবে বিনা শুল্কে যে ব্যবসা করত তা রোধ করার জন্য মির কাসিম সকল বণিকের উপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে দিলেন। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে মার খেয়ে তিনি অযোধ্যার নবাব ও সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এই প্রথম দিল্লির সম্রাট তাঁর বাংলার সুবাদারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। ২২শে অক্টোবর, ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মিত্রবাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। ইতোমধ্যে ১৭৬৪ সালে মির জাফরকে আবার মসনদে বসানো হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব হলেন তাঁর পুত্র নজমুদ্দৌলা (১৭৬৫-৬৬)। প্রতিটি পরিবর্তনে কোম্পানির কর্মচারীরা প্রচুর টাকা আদায় করল। বেপরোয়া দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য ক্লাইভ, এবার লর্ড ক্লাইভ, কোম্পানির গভর্নর হয়ে এলেন।

সম্রাট শাহ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজত্ব এবং নিজামত প্রশাসনের জন্য নবাবকে ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাইভ ১২ই আগস্ট ১৭৬৫ সালে কোম্পানির জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

লর্ড ক্লাইভ মোগল অভিজাত মহলে নবাব জবদাতুল মুল্ক মঈনুদ্দৌলা সাবিত জঙ্গ বাহাদুর হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এবার সম্রাটের কাছ থেকে তিনি খান-ই খানান খেতাব পেলেন। ক্লাইভ এখন নালকিতে চড়তে পারবেন এবং মাহি-মারাতব ওড়াতে পারবেন। ক্লাইভ তো মোগল অভিজাত শাসক শ্রেণির একজন। সুতরাং তাঁর কোম্পানি দেওয়ানির সনদ পাওয়ায় কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেনি। কারও খেয়াল হয়নি যে ক্লাইভকে নিয়ন্ত্রণ করে এক বিদেশি রাজ্যের সার্বভৌম পার্লামেন্ট। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস, ওয়েলেসলি সব জাঁদরেল সাম্রাজ্য–নির্মাতাকেই ইংল্যান্ডে জবাবদিহি করতে হয়েছে। বাংলাদেশে সব কিছু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। আইনানুগ জবাবদিহির ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় এ দেশ কোনো স্থিতি লাভ করতে পারেনি।

রাজস্ব আদায়ের জন্য দেওয়ানি ও শান্তিশৃঙ্খলার জন্য নিজামত এই দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল মোগল প্রশাসনে । দিল্লির সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে মুর্শিদকুলি খান দুটো বিভাগ একত্র করেন। ১৭৬৫-র পর কোনো সমন্বয়কারী তদারকি ব্যবস্থা না থাকায় কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন নিজামত। ক্লাইভ দেওয়ানির কাজ তদারকের জন্য রাজস্ব-বিশারদ রেজা খানকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন। ১৭৬৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে রেজা খানের পক্ষে একা দ্বৈতশাসনের দুর্নীতি ও অরাজকতা দূর করা সম্ভব হলো না। অনাবৃষ্টি ও অভাবের দরুন ১১৭৬ বাংলা সালে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, দেশের একতৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। কোম্পানির রাজস্ব আদায় কিন্তু পুরোদমে চলে। ১৭৭২ সালে রেজা খানকে অপসারণ করে কোম্পানি নিজ হাতে দেওয়ানির ভার নেয়। ক্রমবর্ধমান অব্যবস্থা দূর করার জন্য ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার্যনির্বাহের জন্য রেগুলেটিং এ্যাক্ট প্রবর্তন করে কোম্পানির ভারতস্থ এলাকার ভার একজন গভর্নর-জেনারেল ও চার সদস্যের এক শাসন-পরিষদের ওপর ন্যস্ত করেন। বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭৪-৮৫) হলেন প্রথম গভর্নর-জেনারেল। বিভিন্ন সময়ে পাঁচসনা, একসনা ও দশসনা ইজারা

দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহে যে সংকট দেখা দেয় তার নিরসনকল্পে নানা ভাবনা-চিন্তার পর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় স্থির হয় জমিদাররা রাজস্ব সংগ্রহ করে তার নয়-দশমাংশ বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে কোম্পানিকে প্রদান করবেন এবং বাকি একাংশ রাজস্ব তাঁরা বংশানুক্রমে ভোগ করবেন। জমিদারকে দেয় রায়তের খাজনা অবশ্য স্থিরীকৃত হয়নি। ইংরেজি আইনের ভাবধারায় সম্পত্তিতে, বিশেষ করে ভূ-সম্পত্তিতে, নিরঙ্কুশ অধিকার বোধের সৃষ্টি হলো। ভূস্বামিরা ইংরেজদের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের সেই আশা পুরোপুরি চরিতার্থ হয়। জমিদার ও তাঁর মিত্র উকিল এবং জমিদারির আয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় সকল মসিজীবী ও বুদ্ধিজীবী ইংরেজ শাসনকে সমর্থন দেয়। বহু দীর্ঘসূত্রতার পর ১৯৫০ সালে এদেশে এই আইন বিলোপ করা হয়।

১৭৭২ থেকে ১৮৫৭-র মধ্যে কোম্পানি দশ-বারোটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নেপাল, বেলুচিস্তান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র ভূখণ্ডে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। যে সব রাজ্য লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮-১৮০৫) অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করে সে সব আশ্রিত রাজ্যে ইংরেজের শাসন ছিল পরোক্ষ।

লর্ড ডালহৌসির (১৮৪৮-৫৬) স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে উত্তরাধিকারীহীন বহু রাজ্য কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালে সৈন্যদলে গুজব রটে যে এনফিল্ড রাইফেলের টোটার মধ্যে গরু ও শূয়োরের চর্বি রয়েছে। এই টোটা দাঁত দিয়ে ছিড়তে হতো। তাই সিপাইরা ভাবে যে ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাত নষ্ট করার জন্য এই টোটার ব্যবহার চালু করেছে। বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে সিপাইরা এই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন। শিক্ষিত বাঙালি, আশ্রিত নৃপতিরা এবং শিখ সম্প্রদায় সিপাহি বিদ্রোহকে কোনো সমর্থন জানায়নি। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে এদেশে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর ভারতীয় প্রজাদেরকে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর অংশদানের নীতি ঘোষণা করেন।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে একই। উভয়ের ধারণা, সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্যই যেন তাঁরা পরাধীন হলেন। সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসন মেনে না চললে সমাজের মূল্যবোধে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ। হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম ও অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন করে অবশেষে সেই আবহমান হিন্দুত্বেই ফিরে গেল। ফরায়েজি, তাইয়ুনি, আহলে-হাদিস ইত্যাদি ধর্মীয় আন্দোলনের শেষে সাধারণ মুসলমান আশু রোগমুক্তি, সহজ প্রাপ্তি ও পরিত্রাণের জন্য আবার পীরের দরগার দ্বারস্থ হলো।

ইংরেজ শাসনে রাজভাষা শিখে হিন্দু সম্প্রদায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রধানত অর্থাভাবে, আবার

ধর্মনাশের ভয়েও, প্রথম দিকে ইংরেজি শিখতে না চাইলেও কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কিছুটা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লাভের পর আত্মভিমানী মুসলমানরাও রাজভাষা গ্রহণ করলেন। 'দারুল হার্‌ব' ও 'দারুস্ সালাম'-এর বাইরে যে সৃষ্টিকর্তার একটা বিরাট জগৎ রয়েছে সে সম্পর্কে মুসলমানরা ততটা সচেতন হলেন না। আলিগড় আন্দোলনে সৈয়দ আহমদ মাতৃভাষা উর্দুর মাধ্যমে যে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশে তেমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলো না। তবে ফরায়েজি, তাইয়ুনি, আঞ্জুমান, খেলাফত ইত্যাদি আন্দোলনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যে সংগঠন-তৎপরতা বৃদ্ধি পায় তার উপর ভিত্তি করেই পরে পাকিস্তান আন্দোলন বললাভ করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজ শাসন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কাছ থেকে মোটামুটি সহযোগিতা পেয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহ ছাড়া এমন কিছু অঘটন ঘটেনি যার মোকাবেলা করতে ইংরেজদের তেমন বেগ পেতে হয়েছিল। তাঁদের বিপদ শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সিঙ্গাপুরের পতনের পর এদেশে ক্রিপ্স্ মিশন এল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এবং বিদেশে সুভাষ বোসের আজাদহিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজরা তাঁদের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে মনোযোগ দিলেন। দুই হাজার আই.সি.এস. দশ হাজার সামরিক অফিসার, ষাট হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ও দুই লক্ষ দেশি সৈন্যের সাহায্যে ভারত সাম্রাজ্যে যে ব্রিটিশ শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানেই ফাটল দেখা দিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নতুন ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ রাজকীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৬ই আগষ্ট দাঙ্গার পর দেখা গেল, সরকারি কর্মচারী ও পুলিশ তাদের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। ৩ রা জুন ১৯৪৭, ব্রিটিশপার্লামেন্ট ঘোষণা করলেন ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দান করা হবে। ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। বহুবাচনিক সমাজে গণতন্ত্রের সফলতার জন্য জনবন্ধনে যে আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজন তা ভারতবর্ষে-কোনোদিন গড়ে ওঠেনি। গণতন্ত্রের মৌল নীতি এক মানুষ এক ভোট ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান এবং আইনের সমক্ষে সমান আশ্রয়ের অধিকারী হিন্দু বা মুসলামান কোনো সম্প্রদায়ই সেই সহজ পাঠ গ্রহণ করতে পারেনি।

ভারতের অগ্রণী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ সম্পর্কে যে দর্শন উপস্থিত করেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :"লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতত্রব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোনো হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামেরও তদ্রুপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুর তদ্রুপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শি, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে,এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

"হিন্দু জাতি ভিন্ন প্রথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয় করিব। অপিচ যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ"।

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কেউ না কেউ অনুরূপভাবে তা-ই চিন্তা করতেন। তবে অধিকতর শিক্ষিত শ্রেণির লেখায়, সাহিত্যে, গানে ও নাটকে যে যবনবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে অনগ্রসর মুসলমানের মনে এই আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল যে, একদিন যখন ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবে তখন সুলতান মাহমুদ থেকে আওংগজেব পর্যন্ত সব মুসলমান রাজা-বাদশাহর কর্ম-দুষ্কর্মের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে দায়ী করা হবে। সেই সম্ভাব্য প্রতিহিংসাপরায়ণতার বিরুদ্ধে মুসলমান মন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এদেশের হিন্দুরা ভেবেছে, মুসলমানরা ৯১৬ শতাব্দ থেকে তাদের উপর অত্যাচার করেছে। মুসলমানরা ভোলেনি, তাদের স্বধর্মাবলম্বীরা এদেশে এক সময় রাজত্ব করত। আর সীমিত স্বায়ত্তশাসনে গণতন্ত্রের পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরেই মুসলমানরা ভেবেছে আর কোনোদিন তারা দেশে কোনো অর্থপূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারবে না। হিন্দু ও মুসলমান শুধু দুই পাড়ায় বাস করত না, তাদের মন ও মানস স্বতন্ত্র খাতে বইত। আধুনিক চিন্তাধারা যে সেতুবন্ধের কাজ করতে পারত তা সম্ভব হয়নি : কারণ, সে চিন্তাধারা না মনে, না হেঁশেলে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। গণতন্ত্রের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা-সংখ্যালঘিষ্ঠতা যে দুই নির্বাচনের মধ্যে একটা ক্রান্তিকালীন সাময়িক ব্যাপার তা কেউ বুঝতে চায়নি। চিরস্থায়ী সংখ্যাগুরু ও চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু হিসেবে প্রতিটি সম্প্রদায় চিন্তা করেছে ও শঙ্কিত হয়েছে।

১৮৭৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির বাংলাভাষী অঞ্চল গোয়ালপাড়া ও কাছাড় যখন আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তখন বঙ্গমাতার কোনো সুসন্তান আপত্তি করেননি। ১৮৭৪ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৮৫ সালে 'নিখিল ভারত কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সকলে সরকারি চাকরিতে ঢুকে দেশোদ্ধারের কথা চিন্তা করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশিয়দের জন্য চাকরির প্রস্তাব নেয়া হয় ১৮৫৩ সালে। পাঁচ বছর পরে যখন এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় তখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা স্থির হয় তেইশ। ১৮৭৭ সালে যখন বয়ঃসীমা উনিশে নামানোর প্রস্তাব হয় তখন চাকরি যাঁদের কাছে ঘি-ভাত তাঁদের কাছ থেকে প্রবল আপত্তি এসেছিল। অনগ্রসর মুসলমানরা তখনও তেমন কিছু চাকরি পাচ্ছিল না। এই চাকরি নিয়েই দ্বন্দ্ব বাধল হিন্দু ও মুসলমানে। ১৯৪৭ সালের পরে সেই চাকরি নিয়ে দ্বন্দ্ব বেধেছিল পূর্ব-পাকিস্তানি ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে।

১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগ মুসলমানরা চায়নি। প্রশাসনিক সুবিধার্থে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর ঢাকায় যখন রাজধানী হলো তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা খুশি হয়। হিন্দুরা এ বঙ্গভঙ্গের ঘোরতর বিরোধিতা করে। কাসিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর সম্প্রদায়ের শঙ্কিত মনের পরিচয় দেন: "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হইবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে স্বদেশে আমরা হইব প্রবাসী"।

যদি ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যানুপাতিক অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টো হতো, অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো, তবে সেই ১৯০৬ সালেই হিন্দুরা হিন্দুস্থান চাইত এবং মুসলমানরা হয়ত অখণ্ড ভারতের জন্য সোচ্চার হতো।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট মুসলমানদের সুয়োরানী বলে আখ্যাত করলেও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপস না করে উপায় ছিল না। বাঙালি হিন্দুরা তাদের সংখ্যা, ধনসম্পদ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী নবগঠিত দুটি প্রদেশে তাদের ন্যায্য প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, কারণ বঙ্গপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো বিহারী ও উড়িষ্যাবাসী এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো মুসলমান-এই যুক্তি দেখিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো। লক্ষণীয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাপকাঠি একটিতে হলো বাঙালিত্ব, আর একটিতে ধর্ম। বঙ্গভঙ্গ রদের পর রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলো। লোকে দুঃখ করে বলল, 'আমরা চাঁদ চেয়েছিলাম, পেয়েছি ; কিন্তু ওরা সূর্য কেড়ে নিল।' খনিজসমৃদ্ধ মানভূম ও সিংভূম বঙ্গপ্রদেশে রইল না, রইল না কৃষিসমৃদ্ধ কাছাড় ও সিলেট। বঙ্গদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অক্ষুণ্ন রইল। কলকাতায় বসবাসকারী জমিদার, উকিল, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী খুশি হলো। বহুদিন পরে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়া হয়। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও গোষ্ঠী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে "মক্কা য়ুনিভার্সিটি" বলতে শুরু করে, যদিও সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপক বেশিরভাগই ছিল অমুসলমান।

ঢাকায় ৩০শে ডিসেম্বর ১৯০৬ই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমান অবাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে তেমন কোনো সমর্থন পায়নি। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল তা তারা ভুলতে পারেনি। তাই ১৯৪৭ সালে যখন পূর্ববঙ্গে ঢাকায় রাজধানী আসার সম্ভবনা দেখা দেয় তখন পূর্ববঙ্গবাসী তাকে সানন্দে স্বাগতম জানায়।

সারা ভারতের রাজনীতি তখন হিন্দু ও মুসলমান এই দুই খাতে বইতে শুরু করেছে। এদেশের মুসলমানকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য বারবার স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আব্দুর রসুল ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ফজলুল হক যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট গ্রহণ করেন সেখানে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে দারুণভাবে খর্ব করা হয়। একই ঘটনা ঘটে ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ক্ষেত্রে। 'নিখিল ভারত মুসলীম লীগে' কোনো বাঙালিকে প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল

সেক্রেটারির পদ দেওয়া হয়নি। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় কোনো বাঙালি মুসলমান স্থান পায়নি, যদিও বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় কোনো বাঙালি মুসলমানকে মুসলীম লীগ গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান গণপরিষদে লিয়াকত আলি খান,আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ অবাঙালি মুসলমানের জন্য পূর্ববঙ্গকে ছয়টি আসন ছেড়ে দিতে হয়। ফলে গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সংখ্যা ৪৪ থেকে ৩৮ হলো এবঙ অবাঙালি সদস্যের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩১-এ বৃদ্ধি পেল। নবধর্মান্তরিতদের যেন একের পর এক তাদের ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে হলো। ১৯৪৭-এর আগস্টে পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় সতের জনের মধ্যে দু'জন ছিলেন পূর্ববঙ্গের।

এক খেলাফত আন্দোলন ছাড়া ভারতের মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে তেমন কোনো সহযোগিতা করেনি। বঙ্গপ্রদেশে চিত্তরঞ্জন দাশ যে বেঙ্গল প্যাক্টের প্রবর্তন করেন কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস অবাঙালি পুঁজিপতিদের প্রভাবে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে অস্বীকার করে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা ছাড়া যে প্রাদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে বাঙালি হিন্দু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

লাহোরে ২৩ শে মার্চ ১৯৪০ ভারতের উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে মুসলিম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনের পর ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশনে জিন্নাহর অনুপ্রেরণায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক পাকিস্তানের প্রস্তাব করেন। তখন কেবল আবুল হাশিম সাহেব আপত্তি করেন। মুদ্রণ প্রমাদ বলে জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা দেন তার মধ্যে সফল ব্যবহারজীবির যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই থাক না কেন, তা সত্যর অপলাপ। কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালির দাঙ্গার পরিবেশে সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা হিন্দু ও মুসলমান কেউই স্বীকার করে নিল না। সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও চাকরির বাটোয়ারা নিয়ে বাঙালি চিন্তানায়করা যা-ই চিন্তা করে থাকুন না কেন, বা বাঙালির স্বার্থের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলে যা-ই আলোচনা করে থাকুন না কেন, একটি স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি। সেই চিন্তা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য তোলা রইল।

১১. পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

ভারতীয় নেতাদের বিভিন্ন ধরনের উক্তি- 'আমরা বিভক্ত হয়েছি একত্রিত হবার জন্য' (গান্ধী), 'ভারতবিভাগ একান্তই অস্থায়ী (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ)', 'পূর্ব বাংলাকে ভারত ইউনিয়নের লালন-পালনে বেঁচে থাকতে ও বড় হতে দেওয়া হোক (শরৎচন্দ্র বোস)' এবং পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো গোষ্ঠী পূর্ববাংলা ভাগ করার দাবি করায় এ দেশের অনেকেরই মনে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সরকার এর পুরোপুরি সুযোগ নেন এবং এ দেশের প্রত্যেকটি আন্দোলনকে ভারত-অনুপ্রাণিত বলে আখ্যাত করেন। পাকিস্তানবিরোধী ভারত সরকার এদেশের সরকারবিরোধী

আন্দোলনকে সাহায্য করে থাকলে কূটনীতি ও রিয়াল পলিটিক-এর জগতে তাতে আশ্চর্য হওয়ায় কিছু নেই। এ ব্যাপারে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১সালে পরাজিত পাকিস্তানিদের মনে হয়ত একটি মাত্র সান্ত্বনা ছিল; সে হচ্ছে সফল ভবিষ্যৎবক্তার আত্মপ্রসাদ, 'আমরা না বলেছিলাম!'

পাকিস্তানের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে যথেষ্ট মমতা ছিল, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে যাঁরা অধিকতর অগ্রসর ভদ্রলোকের অবজ্ঞা, ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন,যাঁদের সময় এক থানায় বড় দারোগা ও ছোট দারোগা মুসলমান হলে 'পাকিস্তান তো হয়েই গেছে' বলে বিদ্রুপ শোনা যেত, যখন রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মনেও বঙ্গপ্রদেশে মুসলমান আধিপত্য পাকা হয়ে যাচ্ছে দেখে চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৬সালের মে মাসে বাংলার ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বাংলা ভাষার পণ্ডিত ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা বিভাগের পূর্বাহ্নেই অনতিবিলম্বে স্বতন্ত্র পশ্চিম বাংলার দাবি জানিয়েছিলেন। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যই বায়ান্ন সালে ক্ষীণকণ্ঠে এক শ্লোগান উঠেছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই রাষ্টভাসানো বাংলা চাই না।'

"ইতোমধ্যে ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ জিন্নাহ্র কথা "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"-র বিরুদ্ধে 'না' উচ্চরিত হয়েছে। সেই বছরেই ৩১শে ডিসেম্বর ড. শহীদুল্লাহ ঘোষণা করেছেন "আমরা বাঙালি"। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও অহীউল্লাহ। তাঁদের স্মরণে শহীদ মিনারে প্রতিটি সংকটকালে ও সংগ্রামের পূর্বাহ্নে বাংলাদেশের তরুণরা শপথ নিয়েছে। পাকিস্তান টার্গেট চিনতে ভুল করেনি। তাই মুক্তিসংগ্রামের প্রথমে পাকিস্তানিরা শহীদ মিনারকে ধূলিসাৎ করেছিল এবং পরাজয়ের পূর্ব মুর্হূতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল।

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের পয়লা মার্চ পর্যন্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা পাকিস্তানে যা হয়েছে তার সঙ্গে এদেশের কোনো যোগ ছিল না। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলির মৃত্যু, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিম উদ্দিনকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলির নিয়োগ, পূর্ববাংলায় গভর্নর শাসন, ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া, ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ও ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৫৮-৬২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রি ও আমলার নিয়োগবদলি, ১৯৬২ সালে আয়ুবের সংবিধান প্রবর্তন, ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৯ সালে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল এবং অবশেষে ১লা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ—সব ঘটেছে অবাঙালি আমলা ও পশ্চিম পাকিস্তানস্থ সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগে। ইসলামি সৌভ্রাত্রের মমতায় যাঁরা এর পরও পাকিস্তানের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রতি নতুন প্রজন্মের আর কোনো শ্রদ্ধা রইল না। আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা, নজরুল প্রক্ষালন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের মাধ্যমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভোল পালটানোর যে অপচেষ্টা করা হয় তার ফলে প[illegible] পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বাংলাদেশের তরুণদের ম[illegible] বাঁধতে শুরু করে।

৪—

ইতোমধ্যে লোকায়ত য়ুরোপীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন প্রজন্ম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের কথা বাদ দিয়ে সার্বভৌম স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। স্বাধীন 'পূর্ববাংলা কি স্বাধীন' থাকতে পারবে ? এমন সংশয় মনে থাকলেও স্বাধীনতাকামী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা ক্রমে দেশে দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করে। বিদেশে, বিশেষ করে লন্ডনের ইস্ট পাকিস্তান হাউসে, স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে আলোচিত হতো। সামরিক বাহিনীতে কিছু কিছু বাঙালি অফিসারও পাকিস্তাননামীয় বিষবৃত্ত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার লে.ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে এই গ্রন্থকারের যে আলোচনা হয়, তা থেকে মনে হয় না পাকিস্থান সরকারের অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ছিল। সার্জেন্ট জহুরুল হক তো পাকিস্তান-দ্রোহিতার অভিযোগের উত্তরে কসুর-কবুল করতে চেয়েছিলেন। দেশের লোক অবশ্য এই ষড়যন্ত্রকে বিশ্বাস করেনি; যদিও অনেকে ভেবেছিলেন, এমন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলে ভালোই হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলায় উল্লেখযোগ্য আর্থনৈতিক উন্নতি হলেও বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি তাকে যথেষ্ট বলে গ্রহণ করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সেই প্রবৃদ্ধি তার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল এদেশের পাট ও অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের টাকায় পূর্ব-পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সত্তরের নির্বাচনী প্রচারপত্র 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন''? তথ্যগত ভাবে তর্কাতীত না হলেও সেই প্রশ্নের মধ্যে এদেশের সুপ্ত আক্ষেপ ও আকাঙ্ক্ষা নিবিষ্ট ছিল।

ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্বে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ফরাসি বিপ্লবে দেখা গেছে অবস্থার দুর্দশার চেয়ে অবস্থায় যখন উন্নতি ঘটে তখন দ্রুততর উন্নতি ও আত্মসম্প্রসারণের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ আমূল পরিবর্তন কামনা করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। ষাট দশকে বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল বাজেট, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও মুদ্রার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এদেশের পরিত্রাণ নেই। তখন বুদ্ধিজীবীরা দুই অর্থনীতির কথা বলেছিলেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা থেকে বাঙালি মন অনেক দূর এগিয়ে গেল। একুশ দফার সঙ্গে শেখ মুজিবের ছয়দফা ও ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদের এগারো দফা তুলনা করলে তা বোঝা যায়। ফেডারেশনের ক্ষমতা কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ রেখে মুদ্রা, রাজস্ব কর-শুস্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে যে দাবি পূর্ব-পাকিস্তানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তানের পক্ষে যেমন তা মনে হয়েছিল অগ্রহণযোগ্য, তেমনি বাংলাদেশ সেইসব ব্যাপারে কোনো আপস করতে চায়নি। ছয়দফার 'গণভোটের' ইস্যুতে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করল। আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির কথা বলে যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সেই দেশ প্রথম সাধারণ নির্বাচন সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গেল।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৫ পূর্ববাংলার যে পূর্ব-পাকিস্তান নামকরণ হয় তাকে অস্বীকার করে এদেশের সেই অতি পুরাতন নাম 'বাংলাদেশ'কে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পারের

ছেলেরা নতুন করে আবিষ্কার করল। বাংলাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শেখ মুজিবকে তারা 'বঙ্গবন্ধু' নামে ভূষিত করল। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় ছিল ৩২%বেশি। উন্নয়ন দশকের বদৌলতে ১৯৬৯-৭০ সালে সেই বৈষম্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬১% দাঁড়াল। দুই অর্থনীতি বা ছয়দফা কর্মাপন্থায় এই বৈষম্য দূর করার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ছাত্ররা 'ছয়দফা নয়' এক দফা এক দফা' বলে শ্লোগান দিয়েছিল। ২রা মার্চ, ১৯৭১ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হলো। এ যেন আমেরিকার ১৬ই ডিসেম্বর ১৭৭৩। রাজভক্ত লয়ালিস্টদের উপেক্ষা করে মার্কিন প্রতিনিধিত্বহীন পার্লামেন্টের করারোপিত চায়ের পেটি জাহাজ থেকে তুলে সমুদ্রে জলাঞ্জলি দিয়েছিল বসটন টি-পার্টির মৌলবাদীরা। তার সতের বছর পরে ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ ফ্রান্সের বিপ্লবীরা সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বুরবঁ স্বৈরাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ ভেঙেছিল। বাংলার বিপ্লবী তরুণদের দাবি নেতাদেরকে মানতে হলো। ৭ই মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বাংলাদেশে ২৩শে মার্চের 'পাকিস্তান দিবস' প্রতিরোধ-দিবস হিসেবে পালিত হলো। প্রেসিডেন্টের বাসভবন, প্রাদেশিক গভর্নরের বাসভবন ও সেনানিবাস ছাড়া কোথাও পাকিস্তানি পতাকা সেদিন আর দেখা গেল না। শেখ মুজিবের বাসায় উড়ল বাংলাদেশের পতাকা। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্র থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর যে হত্যালীলা, অগ্নি-সংযোগ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ শুরু হলো তা এক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ইতিহাস।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে এই খবর হয় যে, সেই রাত্রে 'প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে শক্তি সংহত করার জন্য শেখ মুজিব বাণী পাঠিয়েছেন। ২৭শে মার্চ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে "মহান নেতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ" হতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান এক স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এর পর ১০ই এপ্রিল "সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা" বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগরে) এক গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশেকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৭ই মার্চ মুজিবের "স্বাধীনতার সংগ্রাম" ভাষণের পর বাংলার তরুণরা যে শ্লোগান দিয়েছিল "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর" সেই আহবানে সাড়া দিয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলো। দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ সেই সংগ্রামের সঙ্গে যে ঐকাত্ম-অনুভব করেছিল তা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারত মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করায় পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করল। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন। মার্চ মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়। ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে বিধিবদ্ধ করেন এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা দেশে প্রবর্তিত হয়।

সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে বিধান রইল 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী'।

স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ এবং আত্মশাসনের জন্য সংবিধানে প্রণয়ন বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি অভিনব ঘটনা। জাতীয় মূল্যবোধ ও ব্যূহবদ্ধতার অভাবে আমরা আমাদের দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে বহুবার রক্ষা করতে পারিনি। ঘরের কাছের সাগর, দেশের নামে নাম, সেই বঙ্গোপসাগরে আমরা কোনো কর্তৃত্ব বিস্তার লাভ করতে পারিনি। বহুদিন ধরে আমাদের সম্পর্ক ছিল না অস্ত্রের সঙ্গে এবং অভিজ্ঞতা ছিল না আত্মশাসনের । নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ধাতস্থ হতে সময় লাগার কথা। কোথায় আমাদের শক্তি ও সাফল্য এবং কোথায় আমাদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা, এখন, আত্মজিজ্ঞাসায় তার নিরাবেগ পর্যলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

১২. সমাজ ও সংস্কৃতি

এক উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে প্রায় বাইশ-শ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসই কেবল আমরা ছুঁয়ে গেছি।

সমাজের উদ্বাস্তুতে এখনও আদিবাসী ও উপজাতিরা বাস করে, যাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নেই বললেই চলে এবং যাদের গোষ্ঠীবাচক নাম আমাদের কাছে গালিগালাজের প্রতিশব্দ, তাদের সঙ্গেই এদেশের নাড়ীর যোগ সবচেয়ে প্রাচীন। লম্বা, বেঁটে, লম্বামাথা, গোলমাথা, কোঁকড়াচুল, সোজাচুল, খাঁদানাক, টিকলোনাক, উঁচুচোয়াল, বসাচোয়াল, গোলচোখ, পীত, গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ, ঘোরকৃষ্ণ–সব ধরনের চেহারা আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। শিকারী,চাষী, বণিক, সৈনিক, ধর্মপ্রচারক, কুলি, মজুর,-নানান ধরনের লোক নানান ধান্দায়–কখনো নিজের প্রয়োজনে তাড়িত হয়ে আবার কখনো অপর মানবগোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে কত দিক থেকে যে এসেছে তার সঠিক হিসাব করা কঠিন। কালক্রমে বধূ-কন্যা-মাতার কল্যাণে এক সংঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে আমাদের দেশের, ছাগলনাইয়ায় যে পাথুরে হাতকুঠার পাওয়া গেছে তা যদি ফ্রান্সের সম উপত্যকায় স্যাঁতাশ্যোল (Saint-Acheul) গ্রামে প্রাপ্ত হাতকুঠারের সমকালীন হয়, তা হলে বলতে হবে, আদি প্রাচীন প্রস্তর যুগে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে এ অঞ্চলের উঁচুমাটিতে আদম সন্তানের পদধূলি পড়েছিল। কাছেই, জাভা ও বর্মায় প্রাচীনতম মানুষ ঋজুমানবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়ায় মধ্যপ্রস্তর যুগে হাতিয়ার এবং দমোদর উপত্যকায়, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মেদিনীপুরের গিড়নিতে নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণপূর্বী নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে। ১৯৯১ সালে লালমাই পাহাড়ে প্রস্তরীভূত জীবাশ্মকাঠের ২৪০ টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সালে ওই অঞ্চলে জীবাশ্মকাঠের তৈরি একটি স্যাঁতাশ্যোল হাতকুঠার, কিছু ব্লেড, ব্লেডলেট এবং ফ্লেক্স উদ্ধার করা হয়।

আমাদের দেশের জুয়াং ও ভুঁইহরদের পূর্ব-পুরুষ বাঁটুল নেগ্রিটোরা নাকি উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় তীরধনুক নিয়ে আসে। মুণ্ডা, দ্রাবিড় ও অনার্য নিষাদ

কিরাত আদিবাসীদের মধ্যে ভুঁইহর, জুয়াং, বিরহর, ভুঁইয়া, বয়ার, কৌর, করওয়াড়, খারওয়াড়, শবর, সাঁওতাল, ওঁরাও, কোচ, কাড়ার গোষ্ঠীদের সংস্কৃতিতে শিকারের ঐতিহ্য রয়েছে, বিশেষ করে বয়ার ও সাঁওতালদের মধ্যে। এদেশের ভূমিপুত্র কৌর-করওয়াড় খাড়ওয়াররা নাকি মহাভারতের সেই কৌরবগোষ্ঠী যাদের সঙ্গে বহিরাগত পাণ্ডবদের সংঘর্ষ বাধে। বর্তমান কালের কৈবর্ত, মাহাতো, নমঃশূদ্র এবং কিছু মুসলমানের মধ্যে ওইসব আদিবাসীদের রক্ত থাকতে পারে। ভুঁইয়া, সাঁওতাল ও ওঁরাও এখনও পশ্চিম বঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় এবং উত্তর বঙ্গের রাজশাহী-দিনাজপুরে বাস করে। কোচরা এখন ভঙ্গক্ষত্রিয় বা রাজবংশী নামে পরিচিত। রংপুরের বেশিরভাগ রাজবংশী এখন মুসলমান।

মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যে দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ড দেখা যায় সেই অঞ্চল থেকে আগত মুণ্ডাভাষী এবং ভাষায় ও জীবিকায় তাদের দ্বারা প্রভাবন্বিত মুণ্ডা-পূর্ব আদিবাসীদের দান এদেশে, বিশেষ করে এদেশের পূর্বাঞ্চলে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে ইদানীং বিবেচিত হচ্ছে। টলেমি উল্লিখিত যে মুরুণ্ডারা গঙ্গা নদীর বাম তীরে ও মোহনায় বাস করত, তারা কি মুণ্ডা? না, মুণ্ডাভাষী? গঙ্গা তো মুণ্ডা ভাষার শব্দ। টলেমি উল্লিখিত শবররাও বোধ হয় মুণ্ডাভাষী। গঙ্গা-উপত্যকা থেকে প্রথমে আসে আর্য কর্তৃক তাড়িত ও প্রভাবান্বিত আদিবাসীরা। পরে আসে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যরা।

দক্ষিণ এশিয়ায় মঙ্গোল প্রভাব বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হলেও, আদিবাসী ও মুণ্ডাভাষীদের তুলনায় তা কম। উত্তর থেকে মঙ্গোলরা শিকার বা কৃষি যে-কারণেই এদেশে আসুক না কেন, সমতলের আধিব্যাধির প্রতি ছিল তাদের দারুণ ভয়। তাই চার হাজার ফুট উপর থেকে ম্যালেরিয়া-রেখার নিচে তারা সাধারণত নামতে চাইত না। বোড়োভাষী গারো ও ত্রিপুরী মঙ্গোলরা অন্যান্য আদিবাসীদের ভাষা আত্মসাৎ করে ফেলে। কিন্তু খাসি ও পাঁড়রা তাদের ভাষা রক্ষা করতে সক্ষম হয়। চাকমারা হয়তো মঙ্গোল। তারা বাংলা ভাষা শিখেছে। মধ্যযুগে বর্মা-আরকান থেকে মারমা, বোম, খ্যাং, খুমি, পাঙ্খু, চাক, মনিপুর থেকে মনিপুরী, মিজোরাম থেকে লুসাই ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি বাংলাদেশে আসে। সমুদ্র বেয়ে মালয়, তেলেগু বা তামিলরা এসে থাকলে কি পরিমাণে আসে তার হিসেব করা মুস্কিল।

দশ হাজার বছর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় যে নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব সূচিত হয় তা কালক্রমে মোহেনজোদারো-হরপ্পা পার হয়ে ভাগীরথীর পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত হয় বলে অনুমিত হয়। পাণ্ডুরাজার টিবি ও ফারাক্কায় না কি সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। ধান, কলা, ওল, আখ, নারিকেল, তাল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন, আদা, মরিচ, গোলমরিচ, ইত্যাদি মুণ্ডাভাষীদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমে গিয়েছে। দড়িমার্কা মৃৎপাত্র, পালিশকরা হাতিয়ার, মাছধরা জাল এবং ঝুড়িতে তন্তু ও আঁশের ব্যবহার দক্ষিণ-পূর্ব থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর বা তার কিছু আগেই বাংলাদেশে এসে গিয়েছে। এই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে পরে উদ্ভব হয় বয়নশিল্পের।

স্যাঁতস্যাঁতে, আর্দ্র ও জংলা আবহাওয়ায় অল্পসংখ্যক লোক জুম চাষের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন এবং আধাস্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ পাত্রে সংরক্ষণ করা, প্রসূতির ঘরে আগুন রাখার রীতি এবং ধেনো মদের ব্যবহার দক্ষিণ-পূর্ব থেকে এসেছে।

তিন হাজার বছর আগে রঙিন ধূসর মৃৎপাত্র, ও লোহার ব্যবহার পশ্চিম থেকে পশ্চিম বঙ্গে আসে। সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র উদ্ধারের ফলে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কৃষ্ণ এবং রক্তিম সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো। দাবি করা হচ্ছে, উৎখননে স্যাঁতাশ্যোল মৃৎপাত্রের স্তরে প্রাপ্ত পিট ডোয়েলিং বা গর্তবসতি তাম্রপ্রস্তর যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ভাগীরথী পার হয় চার পাঁচ'শ বছর পরে। লোহা, গরু, লাঙল ও জলাভূমিতে ধানের ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক কৃষির প্রসার ঘটে। গরু লাঙল টানে, গাড়ি বয়, ধানের খড় খায় এবং গোবর দিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মানুষ ও পশু উভয়ে মিলে এক চিত্তাকর্ষক মিথোজীবন-ব্যবস্থার জন্ম দেয়।

ফলমূলকন্দের উদ্যানকর্ম বড় ধরনের বসতি সৃষ্টি করতে পারেনি। গোপালন ও লাঙলের ব্যবহার রপ্ত করতে না পেরে স্থানান্তরী কৃষিজীবিরা পশ্চিম হতে আগত ইন্দো-আর্য ও ইন্দো-আর্য দ্বারা প্রভাবান্বিত আদিবাসীদের সামনে পিছু হটে পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের গুটিয়ে নেয়।

দিনাজপুর-বগুড়া-মালদহে ও চব্বিশ পরগণা-মেদিনীপুরে প্রাপ্ত উত্তরাঞ্চলীয় কালো রঙ পালিশ করা মৃৎপাত্র (Northern black polished ware) থেকে অনুমিত হয়, মৌর্যযুগের সূচনা-পর্বে বা তার কিছু আগে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে একটি কৃষি-সংস্কৃতি ধীরগতিতে উত্তরে পুরাতন কুশি ও পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পাণ্ডুরাজার টিবি ও চন্দ্রকেতু গড়ে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু থেকে অনুমান করা হয় যে, হরপ্পা-মোহেনজোদারো ছাড়াও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বদৌলতে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের চার-পাঁচ শ' বছর পূর্ব থেকে এদেশের উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে আরব মুসলমানদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার পুরো খবর আমরা জানি না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে প্রায় পাঁচ'শ বছর ধরে পশ্চিম থেকে তুর্কি, আফগান, মোগল, ইরানি ইত্যাদি নানা জাতের মুসলমান এদেশে এসেছে। অনেকের ধারণা, এদেশে মুসলমানদের বেশির ভাগই নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে উদ্ভূত। এ মনোভাবের পেছনে যেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারের এক সহজ তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে আম-আতরাফদের প্রতি বহিরাগত বলে গর্বিত আশরাফদের উন্নাসিকতা। কেউ কেউ নানান হিসেব করে বলছেন, এদেশের ত্রিশভাগ মুসলমান না কি বাইরে থেকে এসেছেন। বল্লাল সেনের মতো আমরা কৌলিন্য বা খানদান শুমার করতে উৎসাহী নই। যেসব মুসলমানের পিতৃকুল ছয়-সাত পুরুষ আগে বাইরে থেকে এসেছিলেন, কালক্রমে তাঁদের বেশির ভাগের মাতৃকুল হলো বঙ্গজ এবং তাঁরা নরানাং মাতুলক্রমে বর্তমানে বাঙালি।

ধর্ম

অনুমান তিন সাড়ে-তিন হাজার বছর পূর্বে যখন ঋক্‌বেদ রচিত হচ্ছিল তখন এদেশের 'দী' বা 'দ্বীপ' অন্ত্য জায়গাগুলো ছিল জলমগ্ন। বনাবৃত অঞ্চল ছিল বিশাল। বসতি ছিল বিরল। উঁচুভূমিকে ঘিরে কালক্রমে পয়োস্তি সৃষ্টি হলো। তখন প্রকৃতি, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড, ধ্বজা, পর্বত, স্থান, চন্দ্র, রাই, কালদর্শী বৃদ্ধ, মৃতদেহ ও মৃতের দেহাবশেষের প্রতি লোকের ছিল অগাধ সমীহা। সেদিনের সর্বপ্রাণবাদের কিছু কিছু রেশ রয়ে গেছে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের লোকাচারে এবং আদিবাসী ও উপজাতিদের নানান ক্রিয়াকর্মে। প্রজনন, উর্বরতা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং রোগ ও মারী নিবারণের উদ্দেশ্যে মানুষ সেদিন নানা তুকতাকে বিশ্বাস করত। আজকের নানা দিবসপালন এবং জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্যে অতি পুরাতন নানা ব্রতের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম

প্রায় আড়াই হাজার বছরের কিছু আগে বা পরে বৈদিক ধর্ম এদেশের পশ্চিম প্রান্ত স্পর্শ করার পূর্বে পূর্ব-ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবে বদলে গিয়েছিল। ঋক্, যজু ও সাম-এর সঙ্গে অর্থববেদ যোগ দিল মঙ্গলপ্রাপ্তি, রোগনাশন ভূতনিবারণ, শত্রুনিধন ও বশিকরণের তন্ত্রমন্ত্র।

জিজ্ঞাসু মনে বৈদিক সূত্র ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে যা সব প্রশ্ন ওঠে তার নতুন ব্যাখ্যা দিলেন ঋষিরা। তাঁরা বেদকে প্রত্যাখ্যান না করে, বরং সংহত করলেন। পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শিষ্যদের যে ব্যাখ্যা তাঁরা দেন তাই উপনিষদ (উপ-নি+সদ্–নিকটে উপবেশন) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে চার শতক ধরে রচিত উপনিষদের সংখ্যা শেষে এক'শ আটটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদের ব্রহ্ম নির্বিকার। তার আদর্শ মানুষও নির্বিকার। কল্প হতে কল্পান্তে বিশ্বে যে সৃষ্টির নবায়ন হচ্ছে তার সঙ্গে সে একাত্মতা উপলব্ধি করে এবং পরমজ্ঞানের মাধ্যমে সে পুণর্মৃত্যুর দুর্গতি থেকে রক্ষা পেতে চায়। সর্বপ্রাণবাদের সূত্র ধরে উপনিষদ যে কর্মবাদের তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তা অন্যান্য সকল ধর্মকে প্রভাবান্বিত করে। গুপ্ত যুগে বাংলাদেশে বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে পৌরাণিক ধর্মের বিকাশ ঘটে । সে কথায় আমরা পরে আসব।

খ্রিষ্টপূর্ব সাত-ছয় শতকে বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী মগধ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নগরায়ণের ফলে কৌম সমাজ ভেঙে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক রাজ্য গ'ড়ে উঠে। ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের ও পশুবলির আতিশয্য এবং ব্রাহ্মণের ক্রমবর্ধমান দাবি-দাওয়া ও প্রশাসনে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। চার্বাক প্রমুখ লোকায়ত প্রতিবাদী বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করলেন এবং প্রত্যাখ্যান করলেন পরমজ্ঞানে ব্রাহ্মনের একচ্ছত্র অধিকারের দাবি।

বৈদিক দেবারাধনার ক্রমবর্ধমান জটিলতায় অতৃপ্ত ব্যক্তিরা উপবীত ও শিখা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী বা যোগী হলেন। নানা কণ্ঠে উচ্চারিত হলো মোক্ষ, মুক্তি ও নির্বাণের কথা। বৈধর্ম্য পুষ্টিলাভ করল অব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক ও কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আমরা কেবল তিনজন ধর্ম-প্রচারকের কথা বলব, গোসলা, মহাবীর ও

বুদ্ধ। গোসলা ও মহাবীর দুই বন্ধু এক সঙ্গে ছয় বছর বজ্রভূমিতে কাটিয়েছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে এঁদের দেখা হয়েছিল কিনা আমরা জানি না। জাতকে উল্লিখিত শিবিরাজ্য ও চেতরাজ্য যথাক্রমে উত্তরাঢ়ে ও দক্ষিণরাঢ়ে অবস্থিত বলে যে সনাক্তিকরণ হচ্ছে তা যদি গৃহীত হয়, তবে এই দুই রাজ্যের দানধ্যান ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব পড়েছিল বেদবিরোধীদের ওপর। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দেবতারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। এর প্রতিবাদে বৌদ্ধরা স্বেচ্ছার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরদিকে গোসলা প্রতিষ্ঠিত অজীবিক ধর্ম জাতিভেদ ও কর্মবাদ অস্বীকার করে নিয়তিবাদ প্রচার করে। এই ধর্ম এক সময় উত্তর বঙ্গে বনিক-কারিগর-কুমোরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এর ঢালাও নিয়তিবাদ প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধদের কাছে হেরে যায়।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে এদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কিছু যাতায়াত থাকলেও বৈদিক ধর্ম তেমন প্রসার লাভ করেনি। এদেশে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে প্রথম, তারপর বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে, গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বেদে উল্লিখিত ঋষভ জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর। তাঁর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। তীর্থঙ্করদের জিন বা বিজয়ী বলা হতো। জিনদের ধর্ম হলো জৈন ধর্ম। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান (আ.৫৯৯-৫২৭খ্রি.পূ.)-কে আমরা জৈনধর্মের প্রবর্তক হিসেবে জানি। নির্বস্ত্র মহাবীরকে দেখে রাঢ়ের গ্রামবাসীরা না কি তাঁর দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। জৈন ধর্মে সৃষ্টিকর্তার উল্লেখ নেই। অসৃষ্ট ও অসীম বিশ্ব নিরাকার আকাশে অনন্তকাল ধরে নিরবধি অবস্থান করছে। বিশ্বের মধ্যস্থলে রয়েছে চলমান আত্মা, সর্বপ্রকার জীব–মানুষ পশুপক্ষী ও গাছপালা–অজীব অনাত্মা, স্থান, কাল, বস্তু এবং বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি। সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য কর্ম জীবের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে তাকে সংসার ও জন্মান্তরবাদের নিগড়ে বেঁধে রেখেছে। তপশ্চর্যা, সাধনা ও সদাচারণের দ্বারা মানুষ তার স্বীয় প্রকৃতির সৌকর্য সাধন করে মোক্ষলাভ করতে পারে। অহিংসা ও সর্বজীবের প্রতি অনাঘাত হচ্ছে জৈন ধর্মের প্রধান আদর্শ। সাধারণত ন-বার জন্ম গ্রহণ করার পর একজনের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা থাকে। সন্ন্যাসী বারো বছর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে পারে। গৃহী, সম্যকদর্শন সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচরিত এই রত্নত্রয়ের মাধ্যমে ধর্ম পালন করবে। নির্বস্ত্রবাদী নির্গ্রন্থ পন্থিদের মতে স্ত্রীলোক মোক্ষলাভ করতে পারবে না। শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীরা অবশ্য এই মত পোষণ করত না।

জৈনরা পাল্লা দিয়ে ধর্ম প্রচারে নামেনি। বৌদ্ধ ধর্মের তুলনায় জৈন ধর্মতত্ত্ব অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। নিম্নবিত্ত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ দেশে সাত-আট শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা দেখা দিলে জৈন ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের যোগপন্থার সঙ্গে জৈন ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। আঠারো শতকে জগৎশেঠ প্রমুখ বহু ধনী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় মাড়ওয়ারি জৈনরা এদেশে বসবাস করতে আসে। সারা বাংলায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদের এক উলেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

সিদ্ধার্থ গৌতম (আ. ৫৬৩–৫৮৩ খ্রি. পূ.) নেপালের লুম্বিনী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা লক্ষ্য করে তিনি যোগী হয়ে নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। দশ পারমিতার বলে তিনি ছলনাময় ও ঘোরদর্শন মার-এর শয়তানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে গয়ায় এক বটবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে

বৈশাখী পূর্ণিমায় রাত্রির প্রথম ভাগে পূর্বনিবাসতত্ত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাগে দিব্যচক্ষু ও তৃতীয় ভাগে চতুর্মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে তিনি প্রজ্ঞা বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। চতুর্মহাসত্য হচ্ছে : অস্তিত্বই দুঃখের কারণ, বাসনাই দুঃখের মূল, দুঃখের নিবৃত্তি বাসনার নিবৃত্তিতে এবং অষ্টনীতি অনুসরণে বাসনার নিবৃত্তি বা নির্বাণ। বৌদ্ধ ধর্মের উৎস বুদ্ধের স্বকীয় কোনো অধ্যাত্মদর্শনে, না তৎকালীন ধর্ম ও বিশ্বাসের এক সমন্বয়ধর্মী প্রচেষ্টায়–এই নিয়ে প্রশ্ন আছে। সমসাময়িক ধ্যান-ধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না ক'রে বুদ্ধ মধ্যপন্থার বাণী প্রচার করেন। সৎ বিশ্বাস, সংকল্প, বাক্য, আচরণ, বৃত্তি, চেষ্ট, চিন্তা এবং সাধনা–এই অষ্টপন্থা অনুসরণের জন্য তিনি মানুষকে ডাক দিলেন। বুদ্ধ নাকি সুহ্মভূমি, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও সমতটে ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষা ও বাণীকে সংহত করার জন্য বৌদ্ধদের মধ্যে একাধিক মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থবিরবাদী, থেরবাদীরা, সংরক্ষণশীল প্রবীণ ধর্মপ্রচারকদের অনুসরণ করেন। তাঁদের মতাদর্শ বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম–এই তিপিটক পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। পরে মহাসাঙ্ঘিকরা তুলনামূলকভাবে উদারনীতির অনুসরণ করেন। মহাসাঙ্ঘিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাযান পন্থার উদ্ভব। মহাযান ধর্মাদর্শ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। মহাযানীরা থেরবাদীদের হীনযানী বলে আখ্যাত করেন। কারণ, তাঁদের মতে থেরবাদীদের যিনি আর্দশ সেই অর্হৎ কেবল নিজের মুক্তিচিন্তায় বিভোর, কিন্তু মহাযানের যিনি আদর্শ সেই বোধিসত্ত্ব করুণাবশে সকল প্রাণীর মুক্তির জন্যে সচেষ্ট। এদেশে একই বিহারে দুই মতাদর্শ পাশাপাশি বিরাজ করত। আজ শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেরবাদী, চীন, কোরিয়া ও জাপান কিন্তু মহাযানী।

তৃতীয় শতাব্দী থেকে জৈন, বৌদ্ধ হিন্দু সব ধর্মে দেবপূজা প্রসার লাভ করতে থাকে। ষষ্ঠ শতকের শেষে ও সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে মহাযানী বৌদ্ধরাও শক্তিদেবতাকে পূজা দিতে শুরু করল। শিবলিঙ্গ ও বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হলো। শিবের শিরে স্থান পেল বোধিসত্ত্ব। অষ্টম দশকে তিব্বত হয়ে এল চৈনিক তান্ত্রিকতা। নবম শতকে তন্ত্রমন্ত্র ও যোগপন্থার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটল নানা যানের মাধ্যমে। মন্ত্রযানে মন্ত্রই হলো ধর্মের মূল উৎস। মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলক্রিয়া যোগে মৈথুনের মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব লাভের সবক দিল বজ্রযান। যে দেহ থেকে মুক্তি, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য এত প্রয়াস ও এত তত্ত্বকথা সহজযানে সেই দেহই হলো মোক্ষলাভের বাহন। বুদ্ধ না কি বলে গেছেন, "কলিকালে মানুষ প্রজ্ঞা লাভ করবে তার স্বীয় দেহের মাধ্যমে।" কারণ, সেই দেহে বিশ্ব রয়েছে ধৃত এবং সেই দেহেই সর্বেশ্বরের অজরত্ব ও অমরত্ব রয়েছে নিহিত। যোগসাধনে দেহের ওপর কালের ক্রিয়া স্তব্ধ করে মানুষ তাই মহাজ্ঞান লাভ করতে পারবে। মৈথুনের মাধ্যমে মহাসুখ উপলব্ধির ফলেই তো সহজ অবস্থার প্রাপ্তি ঘটবে। শরীরে নাড়ী, নাড়ীকেন্দ্র ও নাড়ীচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে যোগ-সাধনার মাধ্যমে মুক্তির পথ নির্দেশ দিল কালচক্রযান।

এই সব নানা মত থেকে পরে নাথপন্থ, অবধূতমার্গ, সহজিয়া ধর্ম এবং, অবশেষে, বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রের গুহ্য অর্থ কেবল গুরুর জানার কথা। গূঢ় অর্থে প্রজ্ঞার পাঁচটি কুল – ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, ডোম্বিনী, রজকী ও নটী যথাক্রমে তথাগত, রত্ন, বজ্র, কর্ম এবং পদ্ম। শিষ্যের স্বভাব ও প্রবণতা বিচার করে সাধনমার্গে উক্ত পাঁচটি

কুলের কোন কুলটি তার জন্য প্রশস্ত হবে তা গুরু নির্ণয় করে দিতেন। তন্ত্রীয় মার্গের এই সব গূঢ় বাণী হারিয়ে গেল পঞ্চমকারের উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতায়। একাদশ শতকের মধ্যে শিব ও বুদ্ধ একাকার হয়ে যান। দ্বাদশ শতকে বুদ্ধ হলেন নবম অবতার। বৌদ্ধ বিহারে বলি–আচার্যেরও স্থান হলো। প্রথম দিকে পূজাঅর্চনা বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে সহায়তা করলেও, পরে তা কাল হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুদ্রা, মণ্ডল ও প্রভা'র হেরফের করে হিন্দু দেবদেবীর নাম পাল্টিয়ে বৌদ্ধরা পাল্লা দিয়ে দেবদেবীর অর্চনা শুরু করে। সিংহলের বৌদ্ধভিক্ষুরা এই সব দেখে বলতেন, 'সব টাকা রোজগারের ফন্দি!' নিষ্ঠাবান বৌদ্ধের সংখ্যা গেল কমে। তন্ত্রমন্ত্র ও নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে বৌদ্ধ আচার্যরা হারিয়ে গেলেন এক ভুলভুলাইয়ায়। সাধারণ উপাসক কোনো দিগ্‌নির্দেশনা পেল না। নিজস্ব কোনো আইন কাঠোমো তৈরি না করে বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বর্ণাশ্রমের মতো বৌদ্ধদের তেমন কোনো শক্ত সামাজিক কাঠামো ছিল না। জনগণের ভাষা পালি বা প্রাকৃতের পরিবর্তে হিন্দুদর্শন-প্রভাবান্বিত সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কালীদেহে তলিয়ে গেল বৌদ্ধ তত্ত্বকথা। কালক্রমে ব্যাপক অবক্ষয়ের ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে আচারে পার্থক্য থাকলেও, ভক্তির জোয়ারে, বৌদ্ধমত বৈষ্ণ মতে মিশে গেল।

পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের রানীরা বেশির ভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। প্রশাসনে মহামন্ত্রিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সেনাপতির ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। সেন রাজারা পালদের উদাররীতি অনুসরণ করেননি। সেন আমলে রাজানুগ্রহ তো গেলই, তার ওপর বৌদ্ধদের ওপর নেমে এল নানান নিগ্রহ–লাঞ্ছনা। তুরস্কদের পর দেশে যখন টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হলো তখন বহু বৌদ্ধ আচার্য তিব্বত সিংহল ও পূর্ববঙ্গের পালিয়ে গেলেন। থেরবাদীরা যাদের মহাযানীরা হীনযানী বলে উপহাস করত তারা টিকে রইল পূর্ব বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বুদ্ধ হলেন নির্বোধের প্রতিশব্দ 'বুদ্ধু'। বৌদ্ধধর্মের শেষ রেশ রয়ে গেল রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের লৌকিক পূজায়। গত চার দশকে আমাদের বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টি বেশ প্রসার লাভ করেছে।

যে দেশের গাঁয়ের লোক কালো, নাক নেই, যারা পাখির মতো কিচিরমিচির করে, মাছ খায় এবং যাদের সংস্পর্শে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সেদেশ বৈদিক আর্যদের আকৃষ্ট করার কথা নয়। আর্দ্র স্যাঁতস্যাঁতে মাটি যজ্ঞ হোম বা অগ্নিসংস্কারের জন্য যেন প্রশস্ত ছিল না। এখানে পূজার রমরমা। তবু বিষয়-তাড়নায় অশ্ববলে বলীয়ান, লৌহপ্রযুক্তির অধিকারী ও গোপালনে সিদ্ধ আর্যভাষীদের পূর্বযাত্রা করতোয়ার জল স্পর্শ না করা পর্যন্ত অব্যাহত রইল। মদ্যপায়ী, মাংসাশি ও পরস্বাপহরণকারীদের উত্তরসূরি হানাদারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরে এসেছে তুরুক-পাঠন-মোগলেরা। পশ্চিম থেকে এসেছে সংস্কৃত ভাষা, লোহার ব্যবহার, গোপালন আর অন্তহীন আগ্রাসন। এদেশে পশ্চিম ব্রাহ্মণ এবং মওলানা উভয়ের প্রতি তাই এত সমীহ। পূর্বদেশ থেকে পশ্চিমে কী গিয়েছে ধান, ইক্ষু, কার্পাস, রেশম, বাস্তুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, জন্মান্তরবাদ, হস্তি চিকিৎসা ? 'দেবে আর নেবে'–এই আদর্শে বিশ্বাস করলে, উত্তরাধিকার সম্পর্কে কষ্টকল্পনার রাশ টানা দরকার।

চারবেদ, এক'শ আট উপনিষদ, ভগবদগীতা, আঠারো পুরাণ, স্মৃতি-ধর্ম-অর্থ-কাম-শাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য এবং বারো মাসে তের পার্বণ নিয বর্ণাঢ্য হিন্দু ধর্মাদর্শ নানা মুনির নানা মতে বিভক্ত হলেও হিন্দুর কাছে তা অপৌরুষেয় সনাতন।

মৌর্যদের পতনের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটে। পাঁচ-ছয় শতকে গুপ্ত যুগে এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রসার ঘটে। আর্যাবর্তে যুদ্ধ বিগ্রহের হিড়িক লাগলে ব্রাহ্মণরা দলে দলে পূর্বদেশে এসে আশ্রয় নেয়। দশ শতকের এক তাম্রশাসনে দেখা যাচ্ছে এক শ্রীহট্টেই এক সঙ্গে ছয় হাজার ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হচ্ছে। পৌরহিত্যে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়, রাজার বংশনির্ণয়ে (চন্দ্রবংশ, না সূর্যবংশ) ভাগ্যগণনায়, উৎসবে, পূজাপার্বণে, দুর্গতিনিবারক যাগযজ্ঞে, প্রশাসনে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণরা নিজেদের অপরিহার্য করে তোলে। চতুবর্ণের দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এদেশে প্রায় অনুপস্থিত। এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত হওয়ায় প্রবণতা সব প্রাচীন সমাজেই দেখা যায়। স্ব স্ব বৃত্তি হিসেবে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হলে সেই গোষ্ঠী একটা বর্ণের রূপ নেয়। সেই বর্ণাবস্থাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম একটা সাংবিধানিক কাঠামো দান করেছে। বিশেষ বর্ণে অবস্থান মানুষের কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জীবদ্দশায় তার পরিবর্তনের সম্ভবনা নেই। কর্মফলের দ্বারা পরজন্মের উচ্চতর বর্ণের জন্মলাভের প্রত্যাশায় এবং অধিকতর দুর্ভোগ পরিহারের জন্য মানুষকে বর্ণশ্রম ধর্ম পালন করতে যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি ধর্মাদর্শের লঙ্ঘন থেকে তাকে নিরস্ত করে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে ধর্ম। ধর্ম রক্ষার জন্যে কর্তব্যাকর্তব্য, ব্যবহার ও দণ্ডের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন। রচয়িতারা শ্রম, কর এবং দণ্ড থেকে নিজেদের জন্য নানান অব্যাহতির ব্যবস্থা দেন। ন্যায় বা ধর্মের এই বিধানকে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর তত্ত্বকথা ও ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে এক বিস্ময়কর শ্রেয়মনস্কতায় এক অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে শূদ্র-যবন সকল রাজত্বকালে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কলিকালে শূদ্র রাজা হবে এই জেনে ব্রাহ্মণ বরাবরই সাবধান। আর কলিকাল তো শুরু হয়েছে সেই ৩১০২ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে! অনার্য, দস্যু, উপজাতি, অজ্ঞাতকুলশিল, বহিরাগত যবন ও নতুন বৃত্তিধারীদের সকলকে এক মেলবন্ধনের মাধ্যমে এক বর্ণসঙ্কর ব্যবস্থায় অপরের ধর্মকর্ম, ব্রতপার্বণ ও সংস্কারকে তৎসম রূপ দান করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শুধু টিকে থাকেনি সম্প্রসারিতও হয়েছে। এই সমাজে ব্যক্তি হিসেবে কারও অধিাকর নেই। প্রত্যেকের অধিকারে তাঁর বর্ণের অবস্থান দ্বারা সীমানির্ধারিত! এ অসম ব্যবস্থায় যে প্রতিবাদীরা গ্রহণ করতে পারেনি তাঁরা হয় সন্ন্যাসে, নয় বৈধর্ম্যে আশ্রয় নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম সকলকে সমান হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং অপরাধের দণ্ডদানে কোনো পার্থক্য করেনি। বিষয়-বাসনাকে পরিত্যাগ করার আহবান জানালেও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্যোগকর্ম ও সম্পত্তি-অর্জনকে স্বাভাবিক বৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়া যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে যতখানি, ততখানি বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে নয়। এই ধর্ম তো জন্মান্তরবাদ মেনেই নিয়েছিল। কালক্রমে এই ধর্মেও এক উচ্চাবচ অবস্থা দেখা দেয়। বৌদ্ধ সমাজ-সোপানে বজ্রসত্ত্ব, ধ্যানীবুদ্ধ, মানুষীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এই চতুর্স্তরভেদ ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে।

গুপ্তযুগে সমাজে উচ্চস্তরে বৈদিক ধর্ম প্রাধান্য পেলেও সাধারণভাবে পৌরাণিক ধর্মে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বৈদিক যাগযজ্ঞের পরিবর্তে এখানে ষোড়শোপাচারে পূজার আকর্ষণ বেশি। পূজায় আলাপনের মাধ্যমে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত যোগস্থাপন সহজে গড়ে ওঠে। বাংলার হিন্দু পঞ্চ দেবতার উপাসক–বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতি। চতুর্থ শতকের শুশুনিয়া লিপি বিষ্ণু-পূজার প্রাচীনতম নিদর্শন। বিষ্ণু চতুরানন, তাই চার চারটি মতাদর্শকে সহজে তিনি তাঁর শিরে ধারণ করতে পারতেন। কালক্রমে বিয়ুহ-তত্ত্বের বদৌলতে বিষ্ণু অবতারের সংখ্যা উনত্রিশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়াও মনুষ্যেতের প্রাণী বরাহ, মীন ও কূর্ম লৌকিক বিশ্বাসের প্রতিনিধিরূপে বিষ্ণু পূজায় স্থান করে নেয়। বৈষ্ণব ধর্ম পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। বল্লাল সেন শেষ বয়সে, এবং লক্ষ্ণণসেন বরাবরই বৈষ্ণব ছিলেন।

বাংলার একটা বিরাট অংশ ছিল শিবের উপাসক। বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে এই শিবের তেমন সাদৃশ্য নেই। বাংলার লৌকিক দেবতার স্বভাবে এই শিব ছাইভস্ম মেখে ভূতপ্রেত সঙ্গে করে শশ্মানে বাস করে। শিবের লিঙ্গপ্রতীকের পূজাও চালু ছিল । গণেশ পূজার চল থাকলেও এদেশে কোনো গাণপত্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি। সর্বরোগ নিরাময়কারী সূর্যের পূজা এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাশ্চাত্য বেশে বুট পরা সূর্যের বহুমূর্তি পাওয়া গেছে এদেশে। সূর্য পূজার কিছু কিছু ধারণা ব্যাধিনিরাময়কারী ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মিশে গেছে।

শক্তি দেবীর উপাসনা ছিল শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাতৃকা দেবীর সংখ্যা ছিল সাত। চণ্ডী, গৌরীপার্বতী, মহিষমর্দিনী দুর্গা ও কালীর সঙ্গে বহু অনার্য দেবী—ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী ও বাঁশুলি—এদেশে পূজা পেয়ে এসেছে। মধ্যযুগে কালী পূজার ধুম পড়ে। কারও কারও মতে, এদেশের সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের ওপর শাক্ত প্রভাব ছিল বেশি, যেমন সাংবিধানিকতাবাদীদের ওপর বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম প্রভাব ছিল বেশি। পূর্ববাংলায় গৃহদেবতা ও গ্রামদেবতার পূজারও প্রচলন ছিল। আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায় তাদের কৌম দেবদেবীর স্থান-পীঠস্থন এবং বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের পূজা করত।

সাধারণ হিন্দুর মনে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে শেষোক্ত মার্গের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তন্ত্রমতে ভক্তির স্থান জ্ঞান ও কর্ম মার্গের মধ্যস্থলে। ভক্তিবাদ সব ধর্মকেই আচ্ছন্ন করে। বুদ্ধের পুনরোচ্চারিত নিষেধ অমান্য করে ভক্তরা তাঁকে ধর্ম ও সঙ্ঘ এর সঙ্গে তৃতীয় শরণ হিসেবে গ্রহণ করল। ভক্তিমার্গে নারী ও পুরুষের প্রায় সমানাধিকার।

নাথ ধর্ম দশ থেকে বারো শতকে পূর্ববঙ্গ থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই নাথ ধর্মে পতঞ্জলির যোগপদ্ধতি, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের তন্ত্রমন্ত্র, শৈব ধর্মের আগম-নিগম তত্ত্ব এক হয়ে মিশে যায়। গুরু হচ্ছে নাথ। শিব এই মতবাদের আদিনাথ। শিব যখন দুর্গাকে মহাজ্ঞানের তালিম দিচ্ছিলেন তখন মীননাথ মৎস্যরূপে গোপনে সব শুনে ফেলেন। দূর্গার অভিশাপে মীননাথ কদলীরাজ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ নটিবেশে মাদলের বোলে মীননাথের পূর্ব স্মৃতি

ফিরিয়ে আনলেন। নৃত্য-গীতের মাধ্যমে মহাজ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি গুরুকে উদ্ধার করলেন। এই কাহিনী নিয়ে যে নাথ সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সকলের মন জয় করেছিল। মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমানের কাছে হলো মচ্ছন্দর আলি বা মচ্ছর পীর । নাথ ধর্মের শেষ রেশ যুগী-তাঁতি–কবিরাজদের মধ্যে রয়ে গেছে।

মধ্যযুগে হিন্দু জমিদার ভূস্বামী ও রাজস্ববিভাগের প্রভাবশালী করণিক কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্ম নিজেকে রক্ষা করেছে। মেলবন্ধনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজ সংকুচিত না হয়ে বরং বিস্তার লাভ করে। সেই সম্প্রসারণ মধ্যযুগে ব্যাহত হলেও, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে এই বিশ্বাসে রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণি স্মার্ত পণ্ডিতরা শাস্ত্রের কালোপযোগী ব্যাখ্যায় হিন্দু বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখেন। চৈতন্য তাঁর বৈষ্ণব মতের মাধ্যমে বণিক ও সুবর্ণবণিকদের সহায়তায় হিন্দু ধর্মে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। আইন-ই-আকবরী-তে দেখা যাচ্ছে রাজস্ববিভাগের উনিশটি সরকারের মধ্যে দশটিরই হিন্দু নাম। উনিশ শতকে ইউরোপীয় ধ্যানধারণার মোকাবেলা করতে গিয়ে সংস্কারকরা উপনিষদ, বেদান্ত ও ভাগবদগীতার নতুন ব্যাখ্যায় ব্রতী হলেন। খ্রিষ্টীয় ঈশ্বরের আদলে উপনিষদের ব্রহ্মে রূপান্তর ঘটালেন রামমোহন। খ্রিষ্টান আগ্রাসনকে পরোক্ষভাবে ব্যাহত করল রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম ও রাজা রাধাকান্তদেব প্রমুখের রক্ষণশীল পুনরুত্থানবাদ। সংরক্ষণবাদীদের চেয়ে সংস্কারবাদীরাই হিন্দু সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে বেশি। বিদগ্ধ ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব দূরে গ্রামে পৌঁছায়নি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয়বঞ্চিত সাধারণ অসহায় মানুষ বিপদে-আপদে লৌকিক দেবদেবতাদের স্মরণ ক'রে আসছে বহু যুগ ধরে।

ইসলাম

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুরস্করা, মুসলমানের তৎকালীন প্রতিশব্দ, এদেশের উচ্চকোটির মনে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। হলায়ুধ মিশ্রের 'সেকশুভোদয়া'-য় শেখ জালালুদ্দীনের মাহাত্ম্য-বর্ণনা ছাড়াও, সেন-রাজাদের তিন পুরুষের মহামাত্র কবি উমাপতি ধরের প্রশস্তি-রচনায় দেখছি উচ্ছ্বসিত ম্লেচ্ছবন্দনা– "সাধু ম্লেচ্ছনরেন্দ্র সাধু"। দশ অবতারের শেষ অবতাররূপে যে শ্বেতাশ্বারোহী কল্কির কল্পনা করা হয় তার সঙ্গে তুরস্কের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে নিশ্চয় অনেকের মনে দশান্তর ঘ'টেছিল। এখনও রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলের মেলায় যে পোড়ামাটির রঙিন খেলনা–ঘোড়াসওয়ার বিক্রি হয়, তা দেখে অনুমান করি, এর আদরা সৃষ্টি হয়েছিল সাত শ'বছর আগে। মেচ সর্দার আলির ধর্মান্তরণ বোধ হয় এদেশে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ, বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের পরপরেই। খুব সম্ভব, আলি তাঁর দলবল নিয়ে নব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব কৌম বা সম্প্রদায় হিন্দু বর্ণাশ্রম দ্বারা তেমন দৃঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত হয়নি তাঁদের বেলাও এমনটি ঘটে থাকতে পারে। সেনরাজাদের বৌদ্ধ-বিরোধীতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিশ্চয় বেশ কিছু বৌদ্ধ নব ধর্মে পরিত্রাণের পথ পায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুশ্রমণদের মাথা লক্ষ্য করে যে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতো অনুরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পরে 'নেড়া' শব্দটা তুরস্কের ঘাড়ে চাপানো

হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে সুফি-দরবেশ-ফকিরদের আশ্রয়-আতিথেয়তা-পূণ্যকর্ম-কেরামতি নিশ্চয় যথেষ্ট কাজ করেছিল। রাজধর্মের প্রতি প্রজার সাধারণ সম্ভ্রম, কখনো স্বার্থরক্ষার্থে, আবার কখনো আত্মরক্ষার্থে, নব ধর্ম গ্রহণের পক্ষে অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। আবার,'আমির হামজা'র কবি গরীবুল্লাহ্র ভাষায় অনেকের অবস্থা ছিল "তারা মনে ডরাইয়া রহে মোছলমান হইয়া।"

তুরস্কশক্তি সারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে লেগেছে প্রায় দেড় শ'বছর। তরোয়ালের সাহায্যে তুরস্করা রাজ্যবিস্তার করেছিল, সন্দেহ নেই। জাফর খাঁ, শফীউদ্দিন ও শাহজালাল সুফি–সৈনিকরাও তরোয়াল ঘুরিয়েছেন। কালাপাহাড়রাও মন্দির-মূর্তি ভেঙেছেন। ভাঙা মন্দিরের মালমশলাও মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমান রাজাদের সম্পর্কে হিন্দু মনে নানা আশঙ্কাও ছিল। এর পরও বলতে হবে, এদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে তরোয়ালের তেমন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। আরও ধারালো তরোয়াল তো ভারতে হিন্দু গরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করেনি। এদেশের যেসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণশক্তির প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম কড়াকড়িভাবে পালন করা হতো সেখানে হিন্দু ধর্মের রবরবা প্রায় অক্ষুণ্ন থাকে। যেসব অঞ্চলে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব ছিল ক্ষীণ এবং আচার্যপরিত্যক্ত বৌদ্ধরা ছিল দিগ্‌ভ্রান্ত সে সব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে বেশি। এ ছাড়া লক্ষ করা গেছে, নানা কারণে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের চেয়ে মুসলিম–অধ্যুষিত অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ক্ষমতা দখলের ব্যাপার নিয়ে সুলতান-সুবাদাররা এতই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম প্রচারের দিকে তাঁরা তেমন কোনো উদ্যোগ নেননি, দরাজহস্তে স্বীয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও। সুলতানদের খাজনা বাজিয়ে দিলে প্রজার তেমন কোনো ভাবনা ছিল না। এদেশে জিজিয়া প্রবর্তন করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। হোসেন-হাসানদের বাড়াবাড়ির গল্পটা ছকবাঁধা কাহিনীর মতো বেশ কিছু মধ্যযুগীয় লেখা দেখা যায়। নানা দেশের প্রতিতুলনায় ধর্ম নিয়ে ব্যাপক কোনো অস্থিরতা এদেশে হয়নি।

ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মুহাম্মদ (স.) ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীর কুরায়েশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মের মূল কথা সরলভাবে কোরানে বর্ণিত রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই। তিনি পূণ্যবান যিনি আল্লাহ্, আল্লাহ্র সব কিতাব, রসুল-নবী, ফেরেশতা ও কেয়ামতে বিশ্বাস ক'রে ঈমান আনেন ; আল্লাহ্কে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্যে অর্থদান করেন ; নামাজ ও জাকাত আদায় করেন ; রমজান মাসে রোজা রাখেন; প্রতিশ্রুতি পালন করেন; দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করেন ; সত্যকথা বলেন ; সাবধানতা অবলম্বন করেন ; এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করেন ; এদেশের বেশির ভাগ মুসলমান সুন্নী। সুলতানরা ছিলেন সুন্নী। মুর্শিদকূলি ছাড়া বাংলার সব নবাবরা ছিলেন শিয়া।

নবধর্মান্তরিতদের পক্ষে ভাষার ব্যবধানের জন্য ইসলামের সব অনুশাসন পালন করা সম্ভব হতো না। হজের জন্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে মক্কা যাওয়া তো 'হনুজ দূরস্ত'। তুরস্করা যখন এদেশে আসেন তখন মুসলিম বিশ্বের মূল ভূখণ্ডে ইসলামাবলম্বীর এক টালমাটাল অবস্থা। মনে হয় না, নবধর্মান্তরিতদের ক্ষেত্রে ধর্মের সব অনুশাসন

পালনের জন্য তেমন কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা হতো। অবশ্য মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত, আরবি-ফার্সি হাদিস-ফেকায় শিক্ষিত, ব্যক্তিদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল ধর্ম প্রচারের দিকে। রাজ্য জয়ের অব্যবহিত পরেই মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এদেশের প্রথম সাক্ষাতেই মুসলিম চিন্তাবিদদের দেখা হয়ে গেল কামরূপের নাথযোগী ভোজর ব্রাহ্মণ বা বজ্র ব্রহ্মার সঙ্গে। বজ্র ব্রহ্মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। লক্ষ্ণৌতির প্রধান বিচারপতি কাজী রুকুনুদ্দিন সমরখন্দি তাঁর সহায়তায় যোগতন্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ *অমরকুণ্ড* আরবি ও ফার্সিতে তরজমা করালেন। সুফিদের আস্তানা-খানকা-মাদ্রাসা গড়ে উঠল বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পীঠস্থানের পাশে। পূজা, গুরুবাদ ও তন্ত্রমন্ত্র যারা বংশানুক্রমে বহুযুগ ধরে অভ্যস্ত ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরপরই তাদের পক্ষে অতীতের সব সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ ছিল না। অনাড়ম্বর নব ধর্ম, দুই ঈদে যার উৎসব সীমিত, নবধর্মান্তরীদের মন থেকে লৌকিক আচার ক্রিয়াকর্ম বা পালাপার্বণের প্রভাব ও আকর্ষণকে পুরো মুছে ফেলতে পারেনি।

বৈষ্ণব পদাবলী, কালী মাহত্ম্য, গঙ্গাস্তব, বারমাস্যা ইত্যাদি ভক্তিভজনে বা সাহিত্যকর্মে বহু মুসলমান অংশ গ্রহণ করেছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমান এসবকে স্রেফ শেরেকি বলবেন এবং বলেছেনও। মসজিদের পাশে তাঁর কবর দেওয়ার কথা ব'লে, আবার কবি যখন কালো মেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন দেখার আহ্বান জানান তখন মনে খটকা লাগে। কোন প্রেরণায়, পীড়নে বা প্রয়োজনে একজন ছন্দোবন্ধ বাক্যে নিজেকে প্রকাশ করেন তার সঠিক জওয়াব দেওয়া মুস্কিল। সন্যাতন ইসলামাবলম্বীরা ধর্মীয় সংমিশ্রণকে ঠেকাতে পারেননি।

যতদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল ততদিন শির্‌কবিরোধী কার্যক্রম তেমন দানা বাঁধেনি। ইংরেজ আসার পর রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে ও সুবিধাভোগে বঞ্চিত এবং খ্রিষ্টান অগ্রাভিযানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুসলমানরা সনাতন ধর্মে ফিরে যাওয়ার একটা বড় তাগিদ পেল। স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কামনা প্রকাশ পেল বেশভূষায়, ভাষায় এবং সাহিত্যকর্মেও। গত দুশ বছরে মুসলমান সমাজে বেদাতবিরোধী, সংস্কারবাদী, মুক্তিবুদ্ধি ইত্যাদি নানা মতাদর্শের ঢেউ খেলে গেছে। দেলওয়ার হোসেন, সৈয়দ আমির আলিরা যাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন তাঁদের প্রভাব শিক্ষিতের মধ্যে সীমিত। আবুল হোসেন, আকরম খাঁ, এস. ওয়াজেদ আলি, কাজী ওদুদ যাঁরা বাংলায় লিখেছেন তাঁদের প্রভাবও অধিকাংশ নিরক্ষর জনসাধারণের ওপর নেই বললেই চলে। নিরক্ষর মুসলমান ইংরেজ আমলে জুম্মার নামাজ হবে কিনা,'আমীন' সরবে না নীরবে পড়া হবে এসব নিয়ে কৌতূহলী হলেও দীন ও দুনিয়ার সঙ্গে তারা নিজের মতো একটা রফা করে নিয়েছিল। মৌলভী ও মওলানাদের ওয়াজ-মাহফিল তফসির-তকরার শোনার জন্য চাঁদা দিয়েছে ও মজলিস-মাহফিলে দলে দলে যোগদান করেছেন, কৃষক-আন্দোলনে শরীয়তুল্লাহর হাত শক্ত করেছে এবং তিতুমীরের সঙ্গে বিদ্রোহও করেছে। আবার পীর বিরোধীদের নেতৃস্থানীয়রা যখন পীর হয়ে গেলেন তখন তাদের কাছে ধরনা দিয়েছে বিপদে-আপদে সৎপরামর্শের জন্য। পর্দাপ্রথা, তালাক, বহুবিবাহ, সুদ, জিন, শয়তান, নবীজির জীবনের মেরাজ, বা বক্ষবিদারণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ

কিছু নতুন কথা বলার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষের অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ রয়ে গেল পূর্ববৎ। আকরাম খাঁ-র 'তাফসীরুল কোরান' তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করল না। তাঁর *মোস্তাফ চরিত*-কে নিষপ্রভ করে দিল গোলাম মোস্তাফা-র *বিশ্বনবী।*

সব বাহাস পেছনে রেখে, এমনকি রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতিও তেমন কৌতূহল না দেখিয়ে দুনিয়াদারির জন্যে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মুসলমান তার সন্তানকে শিক্ষা দিতে চাইল এবং ঘরে অনাত্মীয় জায়গিরকে সাদরে জায়গাও করে দিল। এই শিক্ষার আন্দোলন অবশেষে প্রজা-খাতকের দাবি-দাওয়া বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের উচ্চাশা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের দাবির সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মুসলমানদের এমন ভাবে সংহত করল যে পাকিস্তানের দাবিকে সকলকে মেনে নিতে হলো।

মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের রচনায় ধর্মকেন্দ্রিক অতিপ্রাকৃত ঘটনার যে বাহুল্য দেখা যায় তা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়। সব ধর্মেই আলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত চিন্তা একটা বেশ চিত্তহারী জায়গা করে নিয়েছে। তাই,'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ'–চৈতন্যের এই কথা শুনে "নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে। বলভদ্র ভট্টাচার্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে।"

মুসলমান ধর্মের উৎস, বিকাশ ও সম্প্রসারণ-ভূমি এদেশ থেকে বহু দূরে। ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে সেই দূরদেশ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা রয়েছে। তার সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণায় সেই দূরদেশের নানান কথা এসে গেছে। মুসলমানদের একটা হিজরতি ঐতিহ্য থাকার দরুন, তাদের দেশাতিরিক্ত অনুরাগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এদেশে। আত্মসমালোচনায় এখনও প্রশ্ন তোলা হয়। আসলে সব দেশেই, দেশ ও সম্প্রদায় ভেদে, ইহুদি-খ্রিষ্টান রোমানক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট শিয়া-সুন্নি, হিন্দু-অহিন্দু, এমন কি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মতবাদীদেরও নিয়ে এমনতর প্রশ্ন ধ্বনিত হয়। এদেশে কী এখন শোনা যায় না? একাত্তরে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার আমরা আর প্রয়োজন দেখি না।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকেই উপমহাদেশের সর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে সিরীয় খ্রিষ্টান মিশানারীরা আসেন। প্রায় চৌদ্দ'শ বছর পরে রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ মিশনারীরা এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হন। ধর্মীয় হাঙ্গামা এড়ানোর জন্যে ব্যবসার খাতিরে ইংরেজ কোম্পানি নিজেদের এলাকায় ধর্ম প্রচার করতে দিত না। ১৮১৩ সালের সনদের বলে ধর্ম প্রচারের পূর্ণ সুযোগ পেয়ে মিশনারীরা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

মাতৃভাষা তা যতই অনুন্নত হোক, মানুষের কাছে যাওয়ার জন্যে ও তাকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট বাহন, এই সাধারণ জ্ঞানে মিশনারীরা বাংলা ভাষার চর্চা, অভিধান-রচনা, ব্যাকারণ-প্রণয়ন ও মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ব্রতী হন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ সেই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ না করে আর পারলেন না। উনিশ শতকে বহু ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋকবেদের ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরান শরীফের বাংলা করেন। মিশনারীদের বদৌলতে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির আচার-আচরণে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। মিশনারী স্কুলে নিম্নবর্ণের বহু ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্র একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। দক্ষিণ বঙ্গে যশোর, খুলনা, বরিশাল অঞ্চলে ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতিদের এলাকায় মিশনারীরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন।

আন্তঃধর্মসম্প্রদায় সম্পর্ক

উত্তরবঙ্গে অশোকের অজীবিকনিধন, পশ্চিমবঙ্গে শশাঙ্কের বৌদ্ধনির্যাতন ও বলালসেনের বৌদ্ধবিদ্বেষের কাহিনী বাদ দিলে দেখা যায়, ধর্ম নিয়ে বড় একটা অনর্থ এদেশে ঘটেনি। ছোটখাট কাজিয়াফইজত হয়েছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে খুনোখুনিটা ইদানীং কালের। জাত তুলে কথা বলাটা বরাবরই শিলধর্মবিরুদ্ধ। জাত মারা কাজটা অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার। বৌদ্ধ আচার্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে মাতলেও, পরধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে বিষোদগার উনিশ শতকে যেভাবে চালু হয় তার পেছনে মিশনারী তৎপরতার একটা প্রভাব ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের বৈষম্য-প্রদর্শনে তেলেজলের একটা উপমা দেওয়া হয়। উত্যক্ত মেজাজের একটা দ্ব্যর্থবোধক উক্তিও শোনা যায়ঃ সবতেই উল্টো কেবল জুতোতে সোজা! একটা মিষ্টি উপমা দিয়েছিলেন গোলাম হোসেন তবাতবাই তাঁর সিয়ারুল মুতাখখেরিনে (১৭৮৩) : হিন্দু সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র, তাঁর চোখে মুসলমান বিদেশি ও অপবিত্র, কিন্তু কালের যাত্রায় এক প্রবল ঝাঁকানিতে দুটি জাতি দুধে চিনিতে মিশে গিয়ে এক মায়ের সন্তান হিসেবে ভায়ের মতো বাস করছে।

দুটো প্রধান ধর্মে নিম্নস্তরে বেশ কিছু যাতায়াত ছিল। ভক্তরা প্রতিমাবিহীন সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের জন্ম দিল। আশু পরিত্রাণ ও ইষ্টলাভের ইচ্ছায় ধর্মনির্বিশেষে সকলে পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালিয়েছে, ঘোড়া রেখেছে বা শিরনি-প্রসাদ খেয়েছে। মুণ্ডভাষীদের ক্রিয়াকর্ম ও বৌদ্ধদের স্তূপপূজার সঙ্গে এসবের কী কোনো সম্পর্ক রয়েছে? তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে ভাবে অনার্য ব্রতপূজাপার্বণকে সম্পূর্ণ আত্মীকরণ করে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিল তেমনটি আর হলো না। ইসলাম ধর্ম নানা বিদাত-ফাসেকির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যস্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখনকার মতো চাকরির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মধ্যযুগে তেমন বিবাদ দেখা দেয়নি। তখন শুধু রাজস্ব বিভাগ নয়, প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু অমুসলমান কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। কাজের স্বীকৃতির জন্য খেতাবপরিতোষিক ছিল প্রায় সকলের জন্যে। স্বধর্মাবলম্বীর প্রতি একটা স্বাভাবিক আনুগত্য ভোটযুদ্ধের ফলে বাঙালির আবহমান দলাদলিতে একটা নতুন মাত্রা পরে যোগ হয়েছে।

আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে যে দুর্লভ মানব জন্ম সেই সুবর্ণ সুযোগকে হেলা না করে সৎকর্মে জীবন অতিবাহিত করতে জীবনমৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মানুষ মুক্তি, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করবে। এই জন্মান্তরবাদে যে সব ধর্ম বিশ্বাস করে না সেসব ধর্মেও মানবজীবন এক পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাস করলে বেহেস্ত-ফেরদৌস। সুফি বলেন, নাজাত বা ফানা। এ দুনিয়া ফানা হবে জেনেও সব ধর্মাবলম্বীর দুনিয়াদারির জ্ঞান কিন্তু বড়ই টনটনে। সেই ইহজাগতিকতার টানে পশ্চিম য়ুরোপে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব। গির্জার বিষয়সম্পত্তি ও নানান ধরনের বিশেষাধিকারে উত্যক্ত হয়ে রাজা ও বুর্জোয়া উভয়ে সেই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে সেই রেনেসাঁর কাল থেকে। এদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো য়ুরোপীয় গির্জা বা মঠের মতো তেমন শোষনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ধর্ম বা সৎকর্মের জন্য ভূমিদান এখানে সর্ব ধর্মে পূণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধর্মের রেষারেষিতে তালকানা অসহায় মানুষ মরমি সাধনায়

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্মসমন্বয়ের কথা ভেবেছে—সব বান্দাই তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আজ শোনা যাচ্ছে তা এসেছে গণতন্ত্রের ব্যাখান হিসেবে। এসব আমাদের ধাতস্থ হয়নি। সত্যিকার সুকৃতি থেকে মানুষকে কোনো ধর্ম ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বিকৃতি থেকেও ধর্ম মানুষকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করতে সমর্থ হয়নি। ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চেতনার যে অহিনকূলতত্ত্ব হাজির করা হয় তা নিয়ে আজ নানা মনে প্রশ্ন উঠেছে। এক সময় না কি দারিদ্র্যের ছাপ দেখেই বোঝা যেত কোন পাড়া ক্যাথলিক আর কোন পাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট! ইতালির বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দেখে আর কি তা সম্ভব? মুসলমান বিশ্বে বিজ্ঞানের চর্চা হায়েছে তার উত্থান কালে। পতনের যুগে যে বেঁড়ে ধর্মের ওপর সব দোষ চাপানো হচ্ছে তা কি ধোপে টিকবে? অসহায় মানুষকে তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে ধর্ম আশ্রয় বা সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে, ধর্মব্যবসায়ীদের আতিশয্য ও স্বার্থপরতা সত্ত্বেও। ধর্মগন্ধহীন নাগরিকচেতনা, সামাজিক দায়িত্ববোধ বা মানবতাবাদ ধর্মের সেই ভূমিকা কি সম্পূর্ণ পালন করতে পারছে? ধর্মকে আফিম ধরে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে মাদকতাবিরোধী অভিযান চলে তাতে এ পর্যন্ত তো কোনো ফল হলো না। তার চেয়ে যার ধর্ম তার কাছে থাক না। রাষ্ট্র যদি সকলকে সমান চোখে দেখতে না পারে এবং রাষ্ট্রের দাঁড়িপালায় যদি ফের থাকে তবেই মুস্কিল।

আজ সারা বিশ্ব এক উৎকট জাতিগত বা সম্প্রদায়গত সমস্যায় অতিষ্ঠ । এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড়ো আশা করে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকারের কথা বলেছিল। শতাব্দীর শেষে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গনতন্ত্র, মানবাধিকার–সব সোনালি স্বপ্ন – একটা বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠের স্তরবিন্যাসের মতো সমাজিক শ্রেণিবিন্যাস নির্ণয় করা সম্ভব নয়, বাংলাদেশের মতো সমতল-প্রায় সমাজের তো নয়ই। সেই শ্রেণিহীন সমাজ মানব সমাজের প্রত্যুষকালে ছিল কি না, বা প্রদোষকালে আসবে কি না জানিনা– যেখানে মানুষ সকালে শিকার করবে, অপরাহ্নে মৎস্য মারবে সুখে এবং সন্ধ্যায় কাহিনী শুনবে অথবা দর্শন আলোচনা করবে। ইতিহাসের শুরুতে দেখা যায়, সমাজে শ্রেণিভেদ বেশ পাকাপোক্তভাবে গেঁড়ে বসেছে। সমাজের বিধি-নিষেধ মেনে এবং রেয়াত-অব্যাহতির সুযোগ নিয়ে মানুষ এক অসম প্রতিযোগিতায় সমাজ থেকে প্রাপ্তি ও স্বীকৃতির প্রত্যাশায় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরের সমান হওয়ার তাগিদ এবং অপরের সঙ্গে নিজের পার্থক্যপ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তার বাহুবল, ধনবল ও বিদ্যাবল কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। আপাতদৃষ্টিতে স্থাণু-প্রায় সমাজেও এই গতিধারা বন্ধ হয়ে যায়নি। শ্রেণী সংঘাতকে এড়াতে গিয়ে ধর্ম, বৈধর্ম্য, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপরিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদ মানুষকে ভাবিয়ে রেখেছে আদ্যিকাল থেকে।

শ্রমের প্রতি শ্রমবিমুখরা যতই মর্যাদা আরোপ করুক না কেন, শ্রমপরিহারকল্পেই সভ্যতার অগ্রগতি। শ্রমের রকমভেদে শ্রেণির সূত্রপাত। যাকে খেটে খেতে হয় না বা নোংরা কাজ করতে হয় না, আর যাকে না খাটলে উপোস করতে হবে বা নোংরা কাজ

না করে উপায় নেই তাদের মধ্যে একটা ফারাক থাকবেই। অপরের ঘাড়ে শ্রমের বোঝা চাপানোর সহজ ও আদিম উপায় হচ্ছে দাসপ্রথা। ভিন জাতের হাতে ধরা পড়ে বা যুদ্ধে বন্দি হয়ে বা নিজের জাতের লোকের কাছে ঋণের দায়ে আটকে পড়ে মানুষ প্রথম দাস হতে বাধ্য হয়। অন্যান্য ধনসামগ্রীর মতো পরে সে হলো বাজারের পণ্য, পাশা খেলায় পণ বা উত্তরাধিকারের বিষয়। কৃষিকর্মে, কারুশিল্পে বা দেহব্যবসায় দাসদের ব্যবহার করা হলেও এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসরা তেমন অপরিহার্য ছিল না। গৃহকর্মে সহায়তার জন্য দাসরা ব্যবহৃত হতো বেশি। দাসপ্রথা তেমন নির্মম ছিল না এদেশে। বয়স, স্বাস্থ্য এবং দাসী হলে, গায়ের রঙ অনুযায়ী দাসদাসীর দাম ওঠানামা করত! বৌদ্ধবিহারে দাসরা কৃষিকাজ করত। হিন্দু মন্দিরে দেবদাসী প্রথা একটা ধর্মীয় রূপ নেয়। মোগল আমলে পাহাড়িদের ধরে খোজা করে দিল্লি পাঠানো হতো। কোম্পনি আমলে দাস কেনাবেচার বিজ্ঞাপন বের হতো সংবাদপত্রে। ইংল্যান্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দোলনের ফলে কোম্পানি-আমলে এদেশে ১৮৪৩ সালে দাসপ্রথার অবসান ঘটে। দাসপ্রথার রেশ চাকরান ও নানকার জাতীয় ভূমিদাসের অবসান ঘটেছে ১৯৫০ সালে জমিদারি উচ্ছেদের পর। প্রভাবশালী বা উপকর্তার বেগার খাটানোর অভ্যাস এখনও বিদ্যমান। ইংরেজ আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চুক্তি-বাঁধা মজুর চা বাগানে এসেছিল। পৌরসভার মেথর-ঝাড়ুদাররাও বিদেশাগত। এদের বংশধরের বেশে ও ভাষায় একটা পার্থক্য আজও লক্ষ্য করা যায়।

দাস ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ওপরে ছিল ঠিকে মজুর, ভাগচাষি, খোদচাষি, কারিগর বণিক, ধর্মযাজক, পুরেহিত, বিদ্বজ্জন, সরকারি আমলা ও রাজপুরুষ। বণিকের অবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের জোয়ারভাটার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আট শতকের পূর্ব শিল্পী, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ বা ব্যাপারিদের সমাজে যে প্রধান্য বা আধিপত্য ছিল, অর্থনীতিতে কৃষিনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাত শতকের শুরু থেকে তা কমতে থাকে। লিপিসাক্ষ্যে গ্রামপ্রধান, মহত্তর, কুটুম্বদের যে উল্লেখ এতদিন লক্ষ্য করা গেছে তা আর নেই। বরং, ভূমধ্যকারী, পুরোহিত বা পণ্ডিতদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যাচ্ছে রাজপদোপজীবীদের উল্লেখ অবশ্য প্রায় সব সময়েই ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে পাল-লিপিতে যে আচণ্ডাল অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ দেখা যায় সেন-বর্মনদের আমলে একেবারে তা বন্ধ হয়ে গেল।

সেন আমলের পর থেকে একেবারে বর্ণাশ্রম ধর্ম এদেশে শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ কোনো দিনই ছিল না। বর্ণসঙ্করতা, বৃত্তি, খাদ্যাখাদ্য ও সামাজিক নিয়ম-কানুন হিন্দু সমাজে ছত্রিশ জাতের সৃষ্টি করে। চৌদ্দ-পনেরো শতকে লেখা দুই উপপুরাণ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুটি প্রধান বর্ণকে উল্লেখ করে বৈদ্য ও কায়স্থকে সৎশূদ্র বা উত্তমসঙ্কর হিসেবে চিহ্নিত করে। ষোল-সতর শতকের মধ্যে এই দুই সৎশূদ্র অন্য শূদ্রদের থেকে নিজেদের আলাদা করে ফেলে। শূদ্রদের তিন ভাগ–উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তমসঙ্কর বা জলচল শূদ্র হলো বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখরা। ব্যবসায়ী ও কারিগর নবশাখরা হলো–ধোপা, মালী, তাম্বুলিক তাঁতি, কাঁসারি, শাখারি, কুমোর, কামার ও নাপিত। এদের বাড়িতে ব্রাহ্মণরা পূজাপার্বণ ও জল গ্রহণ করতে পারত। অধমসঙ্কর বা জল-অচল হলো কৈবর্ত, মাহিষ্য, সুবর্ণবর্ণিক, সাহা, শুঁড়ি, গন্ধবণিক, বারুই ময়রা, তেলি, কলু, জেলে, ধোপা ইত্যাদি।

এদের বাড়িতে ব্রাহ্মণরা পৌরহিত্য করতে পারত, কিন্তু জল গ্রহণ করত না। অধম সঙ্কর যুগী, চণ্ডাল, নমশূদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি বাগদিদের সঙ্গে মধ্যম সঙ্করদের মেলামেশা বা জল গ্রহণ চলত না। এ ছাড়া, ব্রহ্মণদের ছিল পাঁচ শ্রেণি, বৈদ্যদের পাঁচ গোষ্ঠী এবং কায়স্থদের ছয় ভাগ। বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা আবার নানাভাগে কুলীন ও অকুলীনে বিভক্ত হয়ে যায়।

কাঞ্চনকৌলিন্য বর্ণাশ্রম বা বংশাভিজাত্যকে ডিঙিয়ে নানা অধিকারভেদের সৃষ্টি করে। কে চামর, ছত্র, হস্তি বা পালকি ব্যবহার করবে, কে ক'তলা বাড়ি বানাতে পারবে, কার বাড়ির সামনে সিংহদ্বার থাকতে পারে, কার কোন বাদ্যযন্ত্রের বাদনে অধিকার – এ ধরনের নানা অধিকারে বর্ণ বা বংশের চেয়ে অর্থের অভাব ছিল বেশি। মোগল আমলেও এ ধরনের নানা অধিকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।

দ্বাদশ প্রকার মসিজীবীদের মধ্য থেকে কালক্রমে কায়স্থদের উদ্ভব। গুপ্তযুগ থেকে দেখা যাচ্ছে জমির ওপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির খুঁটিনাটি বিবরণ, অধিকারের স্তরভেদ নির্ণয়, জমিসংক্রান্ত সমস্যা পরিহারের জন্য যত্নসহকারে দলিলরচনা ও দলিলদস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৃষ্টি হলো কায়স্থ-করণ-করণিকদের। আঠারো শতকের শেষপাদে মহারাজা নবকৃষ্ণ 'জাত কাছারি'র মাধ্যমে অনেক জাতির লোককে কায়স্থ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন 'কাগজ' কথা থেকে 'কায়স্থ' শব্দের উৎপত্তি। যারা জাত হারিয়ে কায়েত ব্রাহ্মণেরা সেই কায়স্থদের দেখতে পারত না। কায়স্থদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও চাতুর্যের কথা বহু প্রবচনে ধৃত রয়েছে। কায়স্থর মড়া ভাসলেও লোকে ভাবে সে নিশ্চয় কোনো ফিকিরে আছে।

সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে যে বাধানিষেধ ছিল মধ্যযুগে ফার্সি শেখার ক্ষেত্রে তা আর রইল না। মসিজীবীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। বাংলা ভাষার চলও বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগ থেকে প্রশাসনে ও বিদ্যাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের যে প্রভাব ছিল মধ্যযুগে আরবি-ফার্সি-জানা বহিরাগত মুসলমানদেরও তেমনি প্রভাব ছিল। স্বাধীন সুলতানদের আমলে রাষ্ট্রীয় কর্মে ব্যাপকভাবে দেশিয়দের নিয়োগ করা হতো। মোগলদের সময় বহিরাগতদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কী প্রশাসনে বা কী ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্র বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ, মোগল, পাঠান বা শেখ মুসলমান সমাজের কম বেশি শতকরা দু'ভাগের বেশি না হলেও তাঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাঁরা হলেন আশরাফ। আতরাফ বা আজলফ হলেন কৃষক, মজুর, পেশাজীবী, কারিগর, শিল্পী, জোলাতাঁতি, দোকানদার ইত্যাদি আম-সাধারণ। সব নিচে ছিল আরজল বেদে, বাজিকর, চামার ইত্যাদি। সৈয়দের ব্রহ্মণ-ভাব ছিল। তবে টাকার বলে দুনিয়া চলে । টাকা হলে যারা "আগে ছিলো উল্লাতুল্লা, পরে হলো উদ্দিন,–তারপর হলো চৌধুরী সাহেব ভাগ্য ফিরল যেদিন।" গ্রামে ছিল মোলা ও খন্দকারদের প্রতিপত্তি। রাজস্ব আদায় ও আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে যাঁরা জড়িত ছিলেন সেই রাজপুরুষদেরও প্রভাব ছিল ব্যাপক।

ইংরেজ আমলে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যদের 'ভদ্রলোক' নামে আখ্যাত করা হলো। কথাটা হয়ত ইংরেজি 'জেন্টলম্যানের' বঙ্গানুবাদ। মনু বলছেন, 'কল্যাণাচারে যার পাপ প্রচ্ছন্ন তাদৃশ ব্যক্তিই ভদ্রলোক'। যদি ভালো না হতে পারো, তবে ভদ্রলোক হও – এই ইংরেজি বচনের সঙ্গে মনুর সংজ্ঞার কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। এ

দেশের মুসলমানরা অবশ্য না ছিল ভদ্রলোক, না ছিল বাঙালি–ইংরেজ ও হিন্দু উভয়ের কাছেই। অভিজাত ভদ্রলোকের নিচে ছিল মধ্যবিত্ত। জমির মালিক ও পেশাজীবী উচ্চশিক্ষিতদের নিয়ে ছিল উচ্চমধ্যবিত্ত। নিম্নমধ্যবিত্তের পরিসর ছিল আরও বড়, গৃহস্থভদ্রলোক, মণ্ডলপ্রধান থেকে কেরানিকুল পর্যন্ত তার বিস্তৃতি।

কায়িক পরিশ্রম পরিহার করে মানসিক শ্রম ও মেধার বিনিময়ে যাঁরা জীবিকা অর্জন করতেন তাঁদের বৃহদংশ ছিলেন ইংরেজ শাসকের দোসর। আবার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা প্রতিবাদ যাঁরা করেছিলেন তাঁরাও এসেছিলেন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক বা আইনজীবী। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও দেনদরবার, প্রস্তাবপ্রণয়ন, সভার কার্যাবলীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে মামলামোকদ্দমার তদবির ইত্যাদি নানান সাংগঠনিক কাগুজে কাজের জন্যে মধ্যবিত্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এক বিশাল অক্ষরজ্ঞানহীন জনসাধারণ রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবধান থাকায় নির্বাচনাদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে বিশেষ কোনো আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন্দলের প্রাদুর্ভাব ঘটে। রাজনীতিতে সেই ধারা এখনও বহমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও নানা ধরনের অনিয়ম সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি করে।

এ শতকের বিশ দশক থেকে শিক্ষিতের হার ও চাকরিতে শরিকানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্তের আয়তন ও প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালের আগে জেলা বা মহকুমা শহরগুলোতে মুসলমানদের পাকা বাড়ি ছিল অত্যন্ত অল্প। গত চল্লিশ বছরে প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ এক অভাবনীয় দ্রুততায় বিকাশ লাভ করেছে। দেশত্যাগী বাঙালি হিন্দু ও অবাঙালি মুসলমান কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপক হস্তান্তরণ ঘটেছে। ধনার্জন ও সম্পত্তি অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে এই নতুন মধ্যবিত্ত। চাকরির বাজারে অনিশ্চয়তা ও ব্যবসায় মুনাফার হার অস্বভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেশ কিছু অংশ বেসরকারি উদ্যোগকর্মে ও ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মুদ্রাস্ফীতি, ভূমির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও ফটকা ব্যবসার প্রার্দুভাবের ফলে সমাজের আদল পালটাচ্ছে। মজুরি বৃদ্ধি করেও প্রকৃত মজুরির ক্রমাবনতিকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ভূমিহীন কৃষক ও বিত্তবানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্যবিত্তও বদলে যাচ্ছে।

নারী

এদেশের আদিম সমাজে মাতৃতান্ত্রিক প্রভাব থাকার কথা। কৃষিকর্ম, উদ্যানপালন, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি সাংসারিক নিত্যকর্মে নারীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বরাবর। নারী মায়ের জাত। মেয়েমানুষ পরের ভাগ্যে খায়। এই দুই প্রবাদে নারীর প্রতি সমাজে শ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা দুটোই প্রকাশ পেয়েছে। শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের কর্তৃত্বে নারীর বন্দিদশা নিরবধি। একান্নবর্তী পরিবেশে তার দুর্দশা আরও বেড়েছে। তার পরিশ্রমের কোনো অন্ত নেই শ্বশুর বাড়ি গেলে কাঁকালে ঘড়া, বাপের বাড়ি এলে ঢেঁকিতে বারা। যে নারী নরকের দ্বার, যে স্ত্রীবুদ্ধি সততই প্রলংয়কারী, যে নারী দশ হাত কাপড়েও নেংটা সেই নারী ধর্মকর্মে ও পূজা-অর্চণায় সহধর্মিনীর চেয়ে বড়, শৈবধর্মে সে মাতা, শক্তিধর্মে সে আদ্যাশক্তি ও বৈষ্ণব ধর্মে সে প্রেমিকা।

এদেশের শুধু হিন্দু নয় বৌদ্ধরাও অসংখ্য মাতৃকাদেবীর শরণ নিয়েছে। যোগসাধনায় তো নারী অপরিহার্য ব্যক্তি।

প্রাতিষ্ঠানিক যাগযজ্ঞে মেয়েদের যতটুকু অধিকার ছিল না তার অনেক গুণ বেশি তারা পুষিয়ে নিয়েছে ব্রতপালনের সুযোগ নিয়ে। স্ত্রী-আচারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সংসারে এক সংহতির সৃষ্টি করেছে এদেশের মাতাবধূকন্যারা। সংসারের অভিজ্ঞতা ধৃত রয়েছে অসংখ্য মেয়েলি বচনে যার সারল্য ও ব্যঞ্জনা আমাদের মুগ্ধ করে। বৌদ্ধধর্মে নারীর অধিকার হিন্দুধর্মের চেয়ে ছিল বেশি। নারী ভিক্ষুণী হতে পারত, বিদ্যাচর্চায় তার ছিল অধিকার। নানান ধরনের ভক্তিবাদেও নারীর স্থান বড়। ভক্তের পূজায় বহু নারী ধন্য হয়েছে। ইদানীং শোনা যায়, নারী সম্পর্কে এদেশের পুরুষের না কি আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে তাই, বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ কমপক্ষে পাত্রের চেয়ে দশ বছরের কম বয়সের পাত্রী খোঁজে।

'অন্নদামঙ্গল'এর কবি ভারতচন্দ্র (১৭১২-৬০) বাঙালি গৃহবধূদের তিনভাগে ভাগ করেন। উত্তমা ঃ "অহিত করিলে পতি, যেবা করে হিত।" মধ্যমা ঃ "হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।" অধমা ঃ "হিত কৈলে অহিত করয়ে সেই জন।" বাল্যবিবাহ, স্বামির বহুবিবাহ, কুলীনপ্রথা ও বিধবার পুনর্বিবাহে অনধিকারের ফলে হিন্দু নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়।

ভার্যা যেখানে পুত্রার্থে সেখানে বন্ধ্যা নারীর অবস্থা ছিল বড় করুণ। এদেশে নবজাতকের যে সাদর অভ্যর্থনা তা পুত্রসন্তানের জন্যে। যৌতুক প্রথায় বিড়ম্বিত ও অরক্ষণীয়া কন্যার সতীত্ব সম্পর্কে দুর্ভাবনাগ্রস্ত পিতার নিকট তাই অনেক সময় কন্যার নামকরণ, ফেলি বা আন্নাকালী।

মায়ের 'আয়' শব্দটি, এ দেশে পুরুষের সবচেয়ে বড় পিছুটান। মায়ের 'স্নেহগ্রাস' ও তার 'ক্রোড়রাজত্ব' বিদেশি শাসনের হাতকড়ার চেয়ে না কি নির্মমভাবে আমাদের পৌরুষের হানি করেছে এবং মুগ্ধ জননী আমাদেরকে বাঙালি করে রেখেছে মানুষ করেনি—এমন অপবাদ রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন। এক সয় না' আর এক সয় মা—এই প্রবাদে মূর্ত রয়েছে মায়ের পোষিকার রূপ। মা যে আমাদের বাঙালি করে রাখতে পেরেছে সেটা তার কম কৃতিত্ব নয়। তাই যশোদার বাৎসল্যপ্রীতি কৃষ্ণকথাকে বড় ক'রে দেখিয়েছে। 'আমেনা মায়ের' কোলে যেভাবে এদেশের মুসলমান-মনে স্থান পেয়েছে তেমন বিশ্বের অন্য কোনো মুসলিম দেশে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

পুরুষের খাওয়া হলে মেয়েরা খায়। তাই ভাত বাড়ন্ত হলে মেয়ের কপালে আর ভাত জোটে না। প্রতিটি আকাল ও মহামারী দুঃস্থ ও দরিদ্র মেয়েদের ঠেলে দিয়েছে দাসীবৃত্তি ও দেহব্যবসার দিকে।

এদেশে আদিম ব্যবসার প্রচলন বহুযুগ ধরে। নানা ক্রিয়াকর্মে ও স্ত্রী আচারে বারবণিতার একটা স্থান ছিল। বারবণিতা না বসালে এখানে হাটবাজার জমতো না। মন্দিরে দেবদাসী প্রথা এক সময় চালু ছিল। নিম্নস্তরে নরনারীর যৌনজীবন নিয়ে একটা খোলামেলা ভাব ছিল। জড়িবটি খেয়ে জন্মশাসনের বিদ্যা জানা ছিলনা এমন নয়। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের বদৌলতে কোনো কোনো সমাজে নারীপুরুষ যৌনজীবনে যে আশকারা পায় সেকালে তেমনতরো প্রশ্রয় ছিল বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের কিছু ক্রিয়াকর্মে, দুর্গাপূজার শাবরোৎসবে এবং আউল, বাউল, সাঁই ও কর্তাভজাদের কিশোরীভজনে।

জয়পুরের মহারাজা এদেশের বৈষ্ণবদের স্বকীয় প্রেমে ফিরিয়ে আনার জন্যে ১৭৩১ সালে কয়েকজন পণ্ডিতকে পাঠান। গৌড়ীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে ছ'মাস ধরে যে তর্কযুদ্ধ চলল তাতে বহিরাগত পণ্ডিতরা হেরে গেলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির মাধ্যম হিসেবে পরকীয়া প্রেমের জয় ঘোষিত হলো।

মৃদুভাষিণী অনুরাগবতী কোমলাঙ্গী গৌড়ীয় নারীর প্রশংসা করে গেছেন বাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্র'-এ। বাঙালি রমণীর চুলের প্রশংসায় অনেকেই পঞ্চমুখ। বার্ণিয়ের বলেছেন, এই শতদ্বার উন্মুক্ত দেশে একবার ঢুকলে এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কোমল প্রকৃতি নারীর আকর্ষণে কেউ আর বের হওয়ার পথ পেত না। উঁচু মহলে হিন্দু আমলে অবগুণ্ঠন প্রথা চালু ছিল। মধ্যযুগে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি বাড়ে। আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্যে অলংকারেও পর্দা করা হতো।

বারো শতকে ধোয়ীর পবনদূত কাব্যের নারীরা এবং পরে ষোল শতকের মুকুন্দরামের চণ্ডমঙ্গলের লহনা, খুলনা ও লীলাবতীরা যখন প্রেমপত্র লিখছেন তখন বলতে হবে উঁচু মহলে কিছু কিছু মহিলা লেখাপড়া করতেন। আঠারো শতকে বহু শিক্ষিত নারীর উল্লেখ দেখা যায়। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের নায়িকা স্বয়ং বিদ্যা। 'হরিলীলা'র কবি জয়নারায়নের আত্মীয়ারা—আনন্দময়ী, দয়াময়ী ও গঙ্গামণি—ছিলেন বিদুষী ও কবি। রানী ভবানী ছিলেন বেশ শিক্ষিতা মহিলা। হটি বিদ্যালঙ্কর ও রূপমঞ্জুরী হটু বিদ্যালঙ্কার নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নবাবের হেরেমে অনেকে বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দির বেগম, শুজাউদ্দিনের কন্যা দরদানা বেগম, সরফরাজ খানের মাতা জিন্নাতুন্নেসা ও ভগ্নি নাফিসার বিদ্যা ও বুদ্ধির খ্যাতি ছিল।

প্রাচীন কালে হিন্দু নারীর সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো বিধান ছিল না। মধ্যযুগে জীমুতবাহন তাঁর 'দায়ভাগে' অপুত্রক বিধবা স্ত্রীকে, যথাযথ বৈধ্যব্যপালনের শর্তে, স্বামির সম্পত্তিতে সীমিত অধিকারের বিধান দেন। এই অধিকার বলে বিধবা সম্পত্তি বিক্রয় করতে বা বন্ধক দিতে পারত না। প্রাচীনকালে সতীদাহ প্রথার তেমন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না, বরং বিধবার জন্যে নানা বিধি নিষেধের কড়াকড়ি ছিল। জীমুতবাহনের বিধানের পরোক্ষ ফলে সম্পত্তিলোভীদের প্ররোচনায় সতীদাহ প্রথা পরে ব্যাপকতা লাভ করে। অন্তঃসত্ত্বা বা শিশুর জননীকে সতী হতে হতো না। মুসলমান অভিজাত সমাজে যুদ্ধে স্বামির মৃত্যু হলে হেরেমের বেগমরা কখনো কখনো জওহরব্রত পালন করতেন।

আঠারো শতকে ঢাকার রাজকর্মচারী রাজবল্লভ ও নাটোরের রানী ভবানী বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার দানের চেষ্টা করলেও নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিরোধীতায় তা সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, বিধবার সম্পত্তি, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহের বয়স ইত্যাদি নানা বিষয়ে হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংশোধিত হলে নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটে। এদেশে ১৯৪৭ সালের পর হিন্দুর ব্যক্তিগত আইনের কোনো সংশোধন করা হয়নি। ভারতে বিবাহ ও উত্তরাধিকারের আইনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

তুলনামূলকভাবে মুসলমান নারীদের, মা, স্ত্রী বা ভগ্নিদের, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে শরিয়ত মতো অংশ নির্দিষ্ট ছিল। সুন্নীদের চেয়ে শিয়া নারীদের সম্পত্তির অধিকার ছিল প্রশস্ত।

মুসলমান নারী ১৯৩৯ সালের আইনের বলে স্বামীকে তালাক দেয়ার কিছু অধিকার পান। ১৯৬১ সালে সহজ তালাকের বিরুদ্ধে ও বহুবিবাহ সীমিত করার জন্যে মুসলিম পারিবারিক আইন পাস করা হয়। আমাদের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আর নারী পুরুষ ভেদে বৈষম্য প্রদর্শন করা চলবে না। রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সম্প্রতি, যৌতুকবিরোধী ও নারীনির্যাতন-বিরোধী আইন পাশ করে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

আজ বিশ্বে বহু নারী স্বয়ম্ভরা। তাঁরা নিজের ভাগ্যে খান বলে তাঁরা স্বাধীন। তাঁরা কেউ কেউ মাতৃত্বে শৃঙ্খলের শব্দ পান এবং বিনা গর্ভযন্ত্রণায় দত্তকগ্রহণে স্নেহক্ষুধা মেটাতে চান। পুরুষকে প্রতিপক্ষ জেনে নারীপক্ষ আজ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলেছে। 'জায়া' ও 'পতি' মিলে যদি একশব্দপ্রাণ 'দম্পতি' হতে পারে, তবে সেই অতি পুরাতন শব্দটি যা শ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্ট বলে আমরা বলি, তার সন্ধিবিচ্ছেদের জন্যে কী এক যুগের পাণিনিরা এক নতুন সূত্র দেবেন—নর+নারী=মানুষ?

শিল্পকলা

মানুষ প্রথম বাসা বেঁধেছিল হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে। কিন্তু তার মন ভরেনি, সে বাস্তুবিদ্যা আয়ত্ত্ব করে। মহাভারতখ্যাত বাস্তুকলাবিদ ময়-দানবের জন্ম হয়েছিল ঈশান কোণের দেশে। লোহার দা-কাটারি আবিষ্কার করার পর এদেশে ঘর বানানো সহজ হয়ে গেল। এক সময় ছিল যখন হাতে একটা দা থাকলে, সহজে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করা যেত। যে ঘর বাঁধছে তার কাছ থেকে বাঁশ, শন, খড় বা গোলপাতার দাম নেওয়া হতো না, বরং প্রতিবেশিরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে ঘর তুলতে সাহায্য করত। প্রাকারবেষ্টিত গা–ঘেঁষা বাড়ির সারি এখানে তেমন দেখা যায় না। আবহাওয়ার জন্য এদেশে লোকে খোলামেলা জায়গায় থাকতে চায়। লোকের সহজ টান গ্রামের প্রতি। গোষ্ঠীবদ্ধতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে গঞ্জ-বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। নগর কেন্দ্রে যে সব প্রাসাদ, তোরণ, বিজয়তোরণ, স্তম্ভ, মিনার, স্তূপ, মন্দির, মসজিদ, মকবরা ইত্যাদি ইমারত গড়ে উঠেছিল তার বেশির ভাগ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আমাদের কাছে পরিত্যক্ত ইমারত সরীসৃপ ও অশরীরিদের আড্ডাখানা। যখন বর্তমান দুঃসহ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তখন পুরাকীর্তি সংরক্ষণে তাগিদ থাকার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের অধীত বিদ্যা মাত্র একশ' বছরে এখনও রপ্ত হয়নি।

পশ্চিম বঙ্গে চব্বিশ পরগনার চন্দ্রেকেতুগড়ে খনন কার্য চলছে। সেখানে নাকি গঙ্গাঋদ্ধির রাজধানী গাঙ্গে অবস্থিত ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীনতম রাজধানী, মৌর্যযুগের পুণ্ড্রনগরী। বগুড়ার মহাস্থানে করতোয়া তীরে মাটি থেকে দশ হাত উচুঁতে প্রায় মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে সেই রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ। সেকালের প্রশস্ততম নদী করতোয়ার ভাঙন থেকে নগরী রক্ষা করার জন্য বিশাল প্রকার ও বিশেষ ধরনের ভিত্তি-গাঁথুনি ব্যবাহার করা হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে গোবিন্দ ভিটা, লক্ষ্মীন্দরের মেধ এবং কার্তিকেয় মন্দির। কাছেই ভাসু বিহার। পুণ্ড্রনগরী ও কোটিবর্ষের ঠিক মধ্যখানে তুলসীগঙ্গার তীরে সোমপুরীতে, বর্তমান পাহাড়পুরে, ধর্মপাল তৎকালীন এশিয়ার বৃহত্তম বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশালকায় ক্রুশাকৃতি বিহারের আয়তন ৯২২×৯১৯

ফুট। ভিক্ষুদের জন্য কুঠরি ছিল ১৭৭টি। এই বিহারের নির্মাণশৈলী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হয়ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতীশ দীপঙ্কর বেশ কয়েক বছর এই বিহারে অবস্থান করেন।

পুরাকীর্তির মানচিত্রে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ ফেরালে চোখে পড়বে প্রায় ১১ মাইল লম্বা ময়নামতি-লালমাই পাহাড়। শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া, আনন্দরাজার বাড়ি, চরপত্রমুড়া ও ময়নামতি রানীর বাড়িসমেত পঞ্চাশোধিক প্রত্নস্থান সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে।

বৌদ্ধবিহারগুলো ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। তীব্বত, চীন ও শ্রীলঙ্কা থেকে পণ্ডিতরা আসতেন। আবার, বিহার-কর্তৃপক্ষ পার্শ্বস্থ অঞ্চলে কৃষিকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করত। প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। রাজানুকুল্যের যখন অভাব হলো, তখন আর ওরা টিকে থাকতে পারল না।

তুরস্কশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন ধরনের ইমারত গড়ে উঠল। পশ্চিম বঙ্গের গৌড়-পাণ্ডুয়ায় রয়েছে আদিনা মসজিদ (১৩৭৩), দাখিল দরওয়াজা (১৪৬৫), এখলাখি মকবরা (১৪২৫) সোনারগাঁয়ে গিয়াসুদ্দিন আযমশাহের মকবরা (১৪০৯), ঢাকায় বাবা আদমের মসজিদ, (১৪৮৩), দিনাজপুরে শুরা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), গৌড়ে ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), রাজশাহীতে বাঘা (১৫২৩) ও কুসুম্বা (১৫৫৮) মসজিদ, ময়মনসিংহের কুতুব, শেরপুরের খেড়ুয়া মসজিদ মোগল-পূর্ব যুগের উল্লেখযোগ্য ইমারত। বাগেরহাটে রয়েছে খান জাহানের মকবরা। খান জাহানের ষাট গম্বুজ (আসলে সাতাত্তর গম্বুজ) মসজিদে ভারি তুঘলকি নির্মাণশৈলী অনুসরণ করা হয়। ১৬১০-১১ সালে টাঙ্গাইলে আতিয়া মসজিদ নির্মিত হয়।

মোগলযুগে এদেশের স্থাপত্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে— কেন্দ্রীয় গম্বুজ, খাড়া কেন্দ্রীয় তোরণ, পলস্তারার কাজ, চক্‌চকে্‌ টালির ব্যবহার ইত্যাদি দিল্লি-শৈলীর নানান প্রভাবে। মোগলপূর্ব ও মোগলপর যুগের স্থাপত্যের সুষ্ঠু সমন্বয় দেখা যায় টাংগাইলের আতিয়া জামে মসজিদ ও এগারোসিন্দুরের শাহ মুহাম্মদ মসজিদে। ঢাকায় মোগল যুগের নিদর্শনঃ ধানমণ্ডির ঈদগাহ, অসম্পূর্ণ লালবাগ দুর্গ, পরীবিবির কবর, সাত গম্বুজ মসজিদ, খাজা শাহবাজ, খান মুহাম্মদ মৃধা ও কর্তলব খানের মসজিদ। কাটারা-নামীয় ইমারতগুলোতে মধ্য-এশিয়ার কারওয়ান সরাইয়ের প্রভাব লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মন্দির ছিল শিখর ও রত্ন মন্দির। ফরিদপুরের মথুরাপুর দেউল, বাগেরহাটের কাছে কোদলা মঠ, বাগেরগঞ্জে মাহিলারার সরকার মঠ, টুংগিবাড়ির সোনারং মন্দিরগুলো ছিল শিখর-মন্দির। রত্ন মন্দিরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন : পুঠিয়ায় গোবিন্দর পঞ্চরত্ন-মন্দির, দিনাজপুর কান্তজীর নবরত্ন-মন্দির এবং কুমিলায় সতেরো-রত্নমন্দির। 'পীড়' নীতিতে মন্দির নির্মাণ চন্দ্রকেতুগড়ে সর্বতোভদ্র নীতির ইট নির্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্যে, বিশেষ করে রত্নমন্দিরে, মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়।

বাংলা অপরিবর্তনীয় বাস্তুশৈলী, দেশের ও ভাষার নামে নাম, বাংলা/বাংলো পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। দূর থেকে দেখতে উল্টো নৌকার মতো, বাংলা ঘরের প্রেরণা হাতি, না কাছিমের পিঠ? বাংলা ঘরের ছাদ মোগল-পূর্ব যুগ

থেকে পাকা ইমারতে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। দিল্লি-লাহোর হয়ে রাজপুতানা পর্যন্ত তার গতি। ইংরেজদের বদৌলতে ইউরোপেও। এগারোসিন্দুরের মসজিদের ফটক কুঁড়েঘরের আদলে তৈরি। পাবনার জোড়বাংলা দোচালামন্দির ও কুমিলায় চান্দিনার চৌচালামন্দির এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে আরাকান থেকে পলাতক মগ সম্প্রদায় কক্সবাজার-কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বর্মীছাঁদে ক্যাং (মঠ) ও স্তূপ নির্মাণ করেন। ইংরেজ আমলে ইউরোপীয় বাস্তুকলার প্রভাব পরে গির্জায়, জমিদারবাড়িতে এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে। অনেক বাড়িতে গথিক খিলান ও ডোরিক কলাম দেখা যায়। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকা যখন 'পূর্ববঙ্গ ও আসামের' রাজধানী হয় তখন ইঙ্গমোগল স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে বেশ কিছু ইমারত তৈরি করা হয়—নর্থব্রুক হল, কার্জনহল, সলিমুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি।

রাজশাহীর পাহাড়পুর, ময়নামতীর কোটিলামুড়া, ঢাকায় আশরাফপুর এবং চট্টগ্রামের ঝিওয়ারিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ স্তূপগুলো থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় কি ধরনের স্তূপ এদেশে নির্মিত হতো। থেরবাদী বৌদ্ধদের মতো মহাযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধরা স্তূপ-পূজায় তেমন আগ্রহ দেখায়নি।

ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভাস্কর্যের যা নিদর্শন পাওয়া যায় তা অধিকাংশই ধর্মাশ্রিত। প্রস্তরে ও পোড়ামাটির ফলকে অবশ্য লোকায়ত জীবনের কিছু ছাপ দেখা যায়। প্রস্তরের অভাবে মৃৎশিল্প ও ষ্টাকো শিল্পের চল এদেশে বহু দিনের। নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে মৃৎশিল্পী ছাড়া চলে না। জন্ম, মৃত্যু, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি নানা সময়ে বিভিন্ন সংস্কারবশত ব্যবহৃত হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙে ফেলা হতো। সংসারের বিবিধ প্রয়োজনে নানা ধরনের মৃৎপাত্র, খেলনা, পুতুল, পুত্তলি, প্রতিমা ছাড়াও বাংলার মৃৎশিল্পীদের স্মরণ করতে হবে, তাঁদের বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্প, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকের জন্যে। বিশেষ ধরনের মাটি ও মশলা ব্যবহার করায় ইটের চেয়ে ফলকগুলোর স্থায়িত্ব ছিল বেশি। টালির আকারে ছাঁচে ফেলে বা কাদামাটিতে খোদাই করে ফলকগুলো ভাটিতে পুড়োনো হতো।

বিহার ও মন্দিরের দেয়ালগাত্র সংরক্ষণ, আচ্ছাদন ও অলংকরণ এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনে টেরাকোটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জাতক-রামায়ণ-মহাভারতের নানান উপকথা, গাছপালা, জীবজন্তু, কল্পিত কিন্নরকিন্নরী এবং সাধারণ জীবনের ছোটোখাটো প্রতিকৃতি পোড়ামাটির ফলকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনকে পাশ কাটিয়ে এই মৃৎশিল্প এক নতুন প্রাণবানতার জন্ম দেয়, সন্দেহ নেই। অবশ্য, ছাঁচ-ফলকের কলাকুশলহীন পুনঃপুনঃ ব্যবহারে একটা ক্লান্তিকর গতানুগতিকতা রয়ে গেছে যা মনকে ধরে রাখতে পারে না, দৃষ্টিকে ব্যাহত করে।

মোগলদের কাছে এই অলংকরণ-রীতি তেমন আদর পায়নি। হিন্দু জমিদারদের বদৌলতে মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার অবশ্য অব্যাহত থাকে। দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের গাত্রালংকার পোড়ামাটি শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মধ্যযুগ থেকে মুসলিম প্রভাবে লতাপাতা ও নানান ধরনের জ্যামিতিক মোটিফ কেবল মসজিদে নয়, মন্দিরের দেওয়ালেও স্থান করে নেয়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্র তার ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় মানচিত্রের চেয়ে বড়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্শ্বস্থ অঞ্চলের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। এদেশের ভাস্কর্যে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ছাপ লক্ষণীয়। বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ সত্ত্বেও সপ্তম থেকে নবম শতকে মহাস্থানে একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্যরীতি গড়ে ওঠে যার সঙ্গে মগধী রীতির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। কালক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে বর্মীরীতি ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে ওড়িশিরীতিরও প্রভাব পড়ে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রাজমহলের কৃষ্ণপ্রস্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মেটে পাথর ব্যবহার করা হতো। দিনাজপুরের কাকদিঘী-অগ্রদ্বিগুণ-এনদায়, মালদহের গঙ্গারামপুর গাজোলে, বর্ধমান-চব্বিশপরগনায় এবং সমতটে বেশ কয়েকটি মূর্তিনির্মাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

মহাস্থানের স্কন্দের ধাপের প্রাপ্ত কার্তিকেয় মূর্তিটি কুষাণ শিল্পরীতির নিদর্শন। কুষাণ রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মালদহের হাঁকরাইলে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিও রাজশাহীর কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্তিতে, যদিও মূর্তিগুলো খুব সম্ভব গুপ্তযুগে নির্মিত হয়। বাংলাদেশের প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তিটি পাওয়া গেছে রাজশাহীর বিহরৈলে। এটি চুনারের বেলা পাথরে তৈরি এবং পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তরীতির নিদর্শন। বিহরৈলের অনুরূপ আর একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে ভাসুবিহারে। পাহাড়পুরের বিহারে প্রাপ্ত ৬৩টি মূর্তি মধ্যে সপ্তম শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাস্কর্যরীতির প্রভাব দেখা যায়।

মৃৎশিল্প ও প্রস্তরমূর্তির পাশাপাশি প্রচুর ব্রোঞ্জ ও তাম্রমূর্তির পাওয়া গেছে এদেশে। ধাতব শিল্পের প্রথম বিকাশ অজয়নদের তীরে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তামা পাওয়া যেত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম ব্রোঞ্জ মূর্তি মহাস্থানে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী গুপ্ত যুগের বলে মনে হয়। ১৯৮২ সালে পাহাড়পুরে যে ব্রোঞ্জ ভগ্ন বুদ্ধমূর্তিটি (৪-৩´´) আবিষ্কৃত হয়েছে তা নবম শতাব্দীর পাল ভাস্কর্যের এক অপরূপ নিদর্শন। ময়নামতীর রূপবানকন্যা মুড়ায় প্রাপ্ত ৩-৫´´ দৈর্ঘ্য ও ৮-৭´´ ব্যাসের বিরাট ব্রোঞ্জ ঘণ্টাটির উল্লেখ না করলেই নয়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কোনো বৌদ্ধ মন্দিরে এটি স্থাপিত ছিল।

শিল্পশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিহার ও মন্দিরগাত্র চিত্র দ্বারা শোভিত থাকার কথা। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৌদ্ধশাস্ত্র, পুঁথি ও চিত্রের অনুলিপি সংগ্রহণের জন্যে ফাহিয়েন এদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশের দেয়ালচিত্র সব হারিয়ে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন এখন কেবল পুঁথির পাতায় সীমাবদ্ধ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় চাঁরশত চিত্রের মধ্যে বেশির ভাগ হলো পাল যুগের। খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বরেন্দ্রে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল বাস করতেন। পুত্র মগধে প্রচলিত অজন্তারীতির সঙ্গে অভিন্ন মধ্যদেশিয় রীতি অনুসরণ করেন। পিতা একটি স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করেন। চিত্র সমালোচকরা একে পূর্ব ভারতীয় রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মুসলমান আমলে চিত্রকলার পরিবর্তে তুঘরা, নাস্ক ইত্যাদি বিভিন্ন রীতির হস্তলিপি শিল্পের নিদর্শন আমরা পাচ্ছি প্রস্তর অনুশাসনে। সীমিত পরিসরে শব্দের স্থান সংকুলানের জন্যে অক্ষরের ছাঁদ বাড়িয়ে, কমিয়ে, বাঁকিয়ে চুরিয়ে, বা জোড় লাগিয়ে, আবার কখনো নোকতা বা বিন্দুর ব্যবহার পরিহার করে লিপিকররা এক অলংকারময় দুষ্পাঠ্যতার সৃষ্টি করেছেন। তুঘরার ছিল বিভিন্ন ছাঁদ। নানা জনে তাদের নানান নাম দিয়েছেন — নৌকা-দাঁড়, তীর-ধনুক, সারিবদ্ধ-সৈনিক, জামাতে-দণ্ডায়মান-মুসল্লি

ইত্যাদি। ইংরেজ আমলে বিশ্বের চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আমাদের চিত্রকরদের যোগাযোগ ঘটল। আজ আমাদের চিত্রকর ও ভাস্কররা বিভিন্ন রীতিতে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন।

ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষার উৎস সংস্কৃত, দ্রাবিড়, দ্রাবিড়-প্রভাবান্বিত কোনো ইন্দ্রো-আর্য ভাষা, মাগধী প্রাকৃত, না গৌড়ীয় প্রাকৃত—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কাফিরি, পুরাতন নেপালি ও গুজরাটির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করা হয়েছে, মধ্য এশিয়া থেকে সংস্কৃতভাষী ইন্দো-আর্যদের আগমনের পূর্বে পশ্চিম-এশিয়া থেকে আগত ইন্দো-আর্যদের এক দল উত্তর পার্বত্য অঞ্চল বরাবর, আফগানিস্তান-কাশ্মীর-নেপাল হয়ে উত্তর বাংলায় আসেন, এবং আর এক দল গুজরাটে চলে যান। আবার, বাংলার সরল ব্যাকরণ এবং ভিন্ন ভাষার তদ্ধিত-প্রত্যয় ও উপসর্গ সহকারে নবশব্দপ্রবর্তনার প্রবণতা থেকে অনুমান করা হচ্ছে, নানান ভাষাভাষীর সংস্পর্শে একটি 'পিজিন' বা ব্যাপারিবুলি হিসেবে বাংলা ভাষার প্রথম বিকাশ ঘটে। কালক্রমে প্রাচ্য বা মাগধী প্রাকৃত ও সংস্কৃত থেকে ব্যাপক শব্দ আহরিত করে বাংলা তার বর্তমান আদল পেয়েছে। বাংলা 'পিজিনের' অন্তঃস্তরে মুণ্ডা, খাসি ও খাসিপ্রতিম ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। দা, কুড়াল, কোদাল, লিক, চাল, কলা, ওল, হলুদ, লাউ, নারিকেল, ঢেলা, পাড়া, গাং ইত্যাদি কৃষিজীবনের নিত্যব্যবহার্য শব্দগুলো আমরা মুণ্ডাভাষীদের কাছ থেকে পেয়েছি। এ শব্দগুলো অভিধানে 'দেশি' নামে চিহ্নিত। এদেশের বহুল প্রচলিত শব্দগুলো আর্যভাষায় সংস্কারকৃত হয়ে তার আসল আদল হারিয়ে ফেলে। গাং-এর সংস্কৃত গঙ্গা, না গঙ্গার অপভ্রংশ গাং?

সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, পর্তুগিজ, ইংরেজি ইত্যাদি বিংশাধিক ভাষার শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার তদ্ধিত-প্রত্যয় ও উপসর্গের সাহায্যে নতুন শব্দও নিত্য তৈরি হচ্ছে। আমাদের ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বিদেশিদের হাতে রচিত। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড লক্ষ্য করেন, বাংলাভাষীদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যথেষ্ট আরবি-ফার্সি বিশেষ শব্দ মিশিয়ে কথা বলতেন সমাজে তাঁদের বিশষে স্বীকৃতি ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের দাপটে সাত-আট দশকের মধ্যে ভাষার চোহারা পালটে গেল। হ্যালহেড প্রশংসিত বাংলা শব্দপ্রয়োগ ও বাচনরীতিকে ১৮৫৫ সালে রেভারেন্ড জেম্‌স লং রঙ মাঝিমাল্লাদের ভাষা বলে চিহ্নিত করলেন।

বাংলা লিপির আদি পুরুষ ব্রাহ্মিলিপি। এদেশের প্রাচীনতম লিপিনিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মহাস্থানের শিলাচক্রলিপির সঙ্গে আশোক লিপির যেমন মিল, তেমনি সাত' শ-আট'শ বছর পরের বাঁকুড়ার শুশুনিয়া লিপির সঙ্গে গুপ্তলিপির সাদৃশ্য। এই শুশুনিয়া লিপিকে বঙ্গলিপি বলে অভিহিত করা হয়েছে মহাবস্তু নামক গ্রন্থে। আমরা আদি বাংলালিপির নিদর্শন পাই দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত মহীপালের সময়কার দুটি পাণ্ডুলিপিতে। একাদশ শতাব্দীর বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে বাংলা অক্ষর চিনতে আমাদের ভুল হয় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশ্বরূপসেনের তাম্রপট্টে বাংলা-অক্ষর বাংলা সংখ্যা ও ভগ্নাংশ একেবারে পরিষ্কার।

ভুর্জপত্রে লেখা নিদর্শন আমরা পাইনি। প্রাচীনকালে পুঁথির জন্যে যে তাল/ তোড় পাতা ব্যাহার করা হতো তার মধ্যে 'খর তার' ছিল দৈর্ঘ্যে কম, পুরু ও পচনশিল। সূক্ষ্ম, নমনীয় ও সম্প্রসারণশিল 'শ্রীতাড়' টিকতো বেশি। পাতা মাস খানেক জলে ডুবিয়ে রাখা হতো। চার থেকে সাত দিন ছায়ায় ঝুলিয়ে রাখা পাতা শুকিয়ে শাঁক দিয়ে মেজে-ঘষে লেখার জন্যে প্রস্তুত করা হতো। পাতার দু'পাশে দুটো ফুটোর মধ্যে সুতো গলিয়ে কাঠের পাটার সঙ্গে শক্ত করে পুঁথি বাঁধা হতো। পুঁথিতে লিপিকরদের নাম থাকলেও চিত্রকরের নাম প্রায় থাকত না। তুরস্কদের আগমনের পর এদেশে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। 'কাগজি' বলে একটি ছোট সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ছাপার জন্যে চার্লস উইল্‌কিনস্ পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় ছেনিকাটা ছাঁচে প্রথম ধাতব বাংলা হরফ ঢালাই করেন।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে গঙ্গার ধারা বেয়ে সংস্কৃত আসে এদেশে। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ কথ্য সংস্কৃত বা প্রাচীন প্রাকৃতে লেখা হতো। গুপ্তযুগ থেকে সেন রাজাদের সময় পর্যন্ত সংস্কৃত ছিল রাষ্ট্রভাষা। ব্রাহ্মণের ধর্মশিক্ষার ভাষা এখনও সংস্কৃত। পরিভাষা তৈরি করতে কখনো কখনো আমরা সংস্কৃতের দ্বারস্থ হই। ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা হয়েছে এদেশে। সংস্কৃত কবিতার প্রথম সংকলন হয় বাংলাদেশে : সুভাষিতরত্ন-কোষ, সদুক্তি কর্ণামৃত ইত্যাদি। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি বৌদ্ধ-আচার্য, হিন্দু গুরু ও করণ-কায়স্থরা বাংলার বাইরে নেপাল, কাশ্মির, মালব ও চোল রাজদরবারে সমাদর লাভ করেন।

সেন আমল পর্যন্ত ধর্ম, প্রশাসন ও জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত। মধ্যযুগে সংস্কৃতের জায়গায় কায়েমমোকাম হলো ফার্সি। হিন্দু বা মুসলমান যাঁরাই সেদিন বাংলায় লিখতেন তাঁরা গলবস্ত্র হয়ে ভণিতায় মাপ চেয়ে নিতেন। সুলতান-সুবেদার-শিকদাররা দেবভাষা সংস্কৃত ও লোকভাষা বাংলার মধ্যে তেমন কোনো ইজ্জতের ফারাক দেখেননি। প্রজানুরঞ্জনে তাঁরা বাংলায় পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। ইতোমধ্যে অবশ্য সারা উপমহাদেশে ভক্তিবাদের জোয়ারে মাতৃভাষার চর্চা বেশ জোরেসোরে শুরু হয়ে গেছে।

ছড়ায়-ধাঁধায় বচন-প্রবচনে গীতে-পাঁচালিতে আমাদের সাহিত্যিক সংস্কৃতি বহুদিন ধরে বাচনিক। এর গুরুত্ব এখনো কমেনি। প্রথম লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতি (আ. ৭৫০-১০৫০)। অহমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী ও বাংলার সঙ্গে চর্যাগীতির ভাষার সাদৃশ্য থাকায় আজ বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশিরা সকলেই চর্যাগীতিকে নিজেদের বলে দাবি করছেন। চর্যাগীতিকে বাদ দিলে এগারো-বারো শতকের গোপীচন্দের গান বা ময়নামতীর গান বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

কাব্যের প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা* (১৩৮৯-১৪১০) না বড়ু চণ্ডীদাসের (১৪১৭-৭৭) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। পনেরো শতকের শেষার্ধে রচিত হলো কৃত্তিবাসের কালজয়ী রামায়ণ। *রসুলবিজয়ের* কবি মৈনুদ্দিন ও *শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের* কবি মালাধর বসু—যিনিই যাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হোন না কেন—তাঁরা এক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। অনুসারী অনুকারকদের হাতে এক 'বিজয়' সিরিজ বের হতে শুরু করল—মনসাবিজয়,

গোপালবিজয় ইত্যাদি। একটা নতুন পথের দিশা পেলেই এখানে এক গড্ডালিকা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পনেরো শতকে শুরু হলো আরও এক সিরিজের—মঙ্গলকাব্যের ধুম পড়ে গেল। 'ধর্মমঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'দুর্গামঙ্গল' ইত্যাদি শেষ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'। চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পর বাংলা সাহিত্যে এল আর এক জোয়ার। এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। বেশ কিছু মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন। 'মহাভারতের' অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ষোলশতক থেকে ত্রিংশাধিক কবি মহাভারতের পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ করেছেন। সতর শতকে রচিত হলো কাশিরাম দাসের 'মহাভারতের' অমৃত বচন।

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে ইরান থেকে এল নানান নতুন ভাবধারা। বয়েত, সালসা, রুবাই, খামসা ও মসম্মনের প্রভাবে রচিত হলো দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, পঞ্চপদী, অষ্টপদী কবিতা। শেখ ফয়জুলাহর 'গোরক্ষবিজয়' বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। মানবপ্রেমের উপখ্যান প্রথমে শুরু করেন মুহম্মদ সগীর তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা'-য়। বাহরাম, সাবিরিদ খান, দৌলত কাজী, কোরেশি মাগন ঠাকুর, আলাওল প্রমুখের রচনায় মানবপ্রেম প্রকাশ পেল বিচিত্ররূপে। কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হলো নানান মর্সিয়া, শোকগাথা ও জঙনামা যার শেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মির মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'। অলৌকিক পরিবেশ, অতিরঞ্জন ও অতিকথনে আবদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে নবোন্মেষ ঘটল উনিশ শতকে। রামমোহন রচনা করলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। গদ্যের আদর্শলিপি দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সাহিত্যিক নবজাগরণ দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধি লাভ করে দু'তিন দশকের মধ্যেই। ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' বা 'নববাবুবিলাস', হ্যানা ক্যাথরিন মলেন্সের 'ফুলমনি' ও 'করুণার বিবরণ' বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' – এর পরই ঝট করে এল বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। একেবারে মোড় ফিরে গেল বাংলা সাহিত্যের। ইতোমধ্যে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করলেন। দেশিয় ঐতিহ্যের খেলাফ করে তিনি বিয়োগান্ত নাটক লিখলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরই রবীন্দ্রনাথ — এক আশ্চর্য পরম্পরা। একক প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার যে উন্নতিবিধান করেন তা এক অনন্য ঘটনা। অনতিকাল পরেই এলেন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ও আরও অনেকে। মুহম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' গ্রন্থসংস্করণের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। ডম্বরু বাজিয়ে এলেন বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম, অক্ষরডম্বর ছড়িয়ে দিলেন সাম্য, বিদ্রোহ, ইসলামী নবজাগরণ ও প্রেমের গানে। দেশের দুটি প্রধান সাংস্কৃতিক ধারাকে ধারণ করার এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস প্রতিফলিত হলো তাঁর সাহিত্যকর্মে ও ব্যক্তিগত জীবনে। এক মনোহারী অনুপ্রাস তিনি ছড়িয়ে দিলেন যুগপৎ ইসলামি গজল ও শ্যামাসংগীতে। জসীমউদ্‌দীন গ্রাম-বাংলাকে নতুন সুষমায় পেশ করলেন শহুরে পাঠকের কাছে।

মধ্যযুগে হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান জীবনের চিত্র খুব সহজভাবে এসেছে। রাজা বা রাজার আমলাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। কিন্তু উনিশ শতকের হিন্দু লেখকদের লেখা পড়ে মনে হয় না, মুসলমান বলে কোনো জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে বাস

করে। ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার আন্দোলন হিন্দু সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল মুসলমান সমাজকে তা স্পর্শ করেনি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ মুসলমান মনে কোনো রেখাপাত করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, ভুদেব মুখোপাধ্যায় বা দীনবন্ধু মিত্রের মুসলমান, চরিত্র-চিত্রণ বরং মুসলমানের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

মানুষের দুঃখকষ্ট, হাসিকান্না বা প্রেমবিরহ নিয়ে সৃষ্টিকর্ম সেই সাহিত্য অবশ্য ধর্মনির্বিশেষে সকল পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। সৃজনশিল লেখকের লেখায় নিজেদের মুখ দেখতে না পেয়ে কাঙাল মুসলমান পাঠক শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন", আমাদের নিয়ে লিখুন না?" মুসলমান লেখকের কাছে যদি আজ হিন্দু পাঠক অনুরূপ অনুরোধ করেন, তিনি কি পারবেন সেই অনুরোধ রাখতে? না জেনে কি লেখা যায়? আজ কিছু কিছু পরিশ্রমলব্ধ রচনায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান, অস্তিত্ববাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার নানান প্রভাব আজ ব্যাপ্তি পেয়েছে বাঙলা সাহিত্যে।

সংগীত

বাঙালিরা না কি সবাই গান করে—বিদেশিদের কাছে আমাদের এরকম একটা নাম-দুর্নাম রয়েছে। ধর্মে ও কর্মে এবং আনন্দে ও বেদনায় এই ষড়ঋতুর দেশের গান একটা বড়ো ধরনের আশ্রয়। শ্রমের সঙ্গে সুর যোগ দিয়ে মানুষ হালকা হতে চায়। সমবেত সুরে মাঝি-মাল্লারা সারি গান গায়। নৌকা বাইচ, ছাদপেটানো ও ভারি জিনিস টানতে-ঠেলতে সারি ধরনের গানের বড়ো প্রয়োজন। গুণ গুটিয়ে দাঁড় তুলে দিয়ে ভাটির টানে মাঝি ভাটিয়ালি গায়। বর্ষায় বড় নৌকায় আসর জমিয়ে ঘাটে ঘাটে ঘুরে ঘাটু গায়েনরা। উত্তরবঙ্গে গোরু-মোষ যখন নিজের তালে গাড়ি টানে তখন গাড়োয়ান-মৈষাল ভাওয়াইয়া ধরে। সাঁওতাল কিষাণীদের ঝুমুর গানের মতো আদিবাসীদের অন্য কোনো সুর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি।

কবিতার মতো, আমাদের গানেরও আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। গান্ধর্ব শাস্ত্রের ছত্রিশ প্রবন্ধরীতির একটি রূপ হলো চর্যা। বিশেষ নিয়ম ছিল সেই প্রবন্ধরীতির। লোকসুরে তা নানানভাবে বদলে গেছে। প্রত্যেক চর্যার শির্ষে আছে গেয় রাগের নির্দেশ। বঙ্গাল রাগেরও উল্লেখ দেখি। চর্যার বিষয়ভাব ও সাংকেতিকতা প্রভাব রয়েছে এদেশের মরমি গানে। ফকির চাঁদ, লালন শাহ্ প্রমুখ বাউলের সুর ও বাণী রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবান্বিত করে। চর্যার পূর্ববর্তী (না সমকালীণ?) নাথগীতির মধ্যে ময়নামতীর গান পূর্বাঞ্চলে বহুদিন ধরে ছিল জনপ্রিয়।

রাধাকৃষ্ণের মিলনকাহিনী নিয়ে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী সেই গানের নৃত্য-রূপ দিতেন। 'গীতগোবিন্দের' ধ্রুপদাঙ্গ গায়ন এদেশে হারিয়ে গেছে। তার কীর্তনাঙ্গ গায়ন বেঁচে গেল বৈষ্ণব পদাকর্তাদের বদৌলতে। কথাপাগল বাঙালির গানে সুর প্রায়শই কথার তাঁবেদারি করে, যদিও কীর্তনে কথা ও সুর উভয়ই প্রবল। কীর্তনের আখরকে বলা যেতে পারে কথার খেয়াল। নরোত্তম দাসের গরানহাটি ঘরানার কীর্তনই সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে যে দেবীদের বন্দনা তাদের নিয়ে নানান ধরনের গান-পাঁচালি বহু দিন ধরে চলে আসছে। পীরের কেরামতি নিয়েও লোকে গান বেঁধেছে। কীর্তন ছাড়াও শ্যামাসংগীত, ভজন এবং ব্রহ্মসংগীত স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগের শুরুতেই পশ্চিম থেকে এল আমির খসরুর খেয়াল। হামদ-নাত ও গজল বয়ে নিয়ে এল পশ্চিম এশিয়ার সুর। কারবালার স্মৃতি ধৃত হলো জারি মর্সিয়া শোকগীতিতে। মোগল দরবার থেকে এল ধ্রুপদসংগীতের রেওয়াজ। উনিশ শতকে কলকাতা ও তার আশেপাশে এবং মফঃস্বলে জমিদারদের জলসাঘরে ধ্রুপদ সংগীতের চর্চা অব্যাহত থাকলেও বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চা এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বীকৃতির জন্যে ওস্তাদরা দেশ ছেড়ে বাইরে চলে গেছেন। এখন বাংলা খেয়াল যদি অবস্থা বদলায়। ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির সংগে টপ্পা যোগ করে রামনিধি গুপ্ত আধুনিক গানের সূত্রপাত করেন। উনিশ শতকে যে দেশাত্মবোধক গানের শুরু তা এখনও উর্মিমুখর। চলিশের দশকে সাম্যবাদের প্রভাবে এল গণসংগীত। ভাষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান রচিত হলো। আর যে দু'জনের সহস্র সুরে আজ আমাদের সংগীত সমৃদ্ধ তাঁদের নামেই আজ আমাদের গানের দুটি প্রধান ঘরানা—রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল-সংগীত। সাহিত্য ও চিত্রকলায় যেমন, সংগীতে ইউরোপীয় ভাবধারা তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। নতুন প্রজন্মের কাছে ধ্রুপদী সংগীতের চেয়ে পাশ্চাত্য পপ্-এর আকর্ষণই বেশি।

সমষ্টি চেতনা

মাৎস্যন্যায়ে উত্ত্যক্ত মানুষের প্রার্থনায় খুশি হয়ে দেবতারা মানুষরূপী রাজার বিধান দেন। রাজা ধর্মরক্ষা করবেন, বিনিময়ে প্রজা ফসলের এক ষষ্ঠাংশ কর দেবে। হিন্দু পুরাণের এই তত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধমতের সামান্য পার্থক্য। স্বর্ণযুগের অবসানে সমাজে অবক্ষয় ঘটলে জনগণ সকলে মিলে একজনকে রাজা নির্বাচিত করেন এবং তাঁর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ফসলের এক ষষ্ঠাংশ কর দিতে রাজি হন। উভয় তত্ত্বে সরকারের আগে সমাজ ছিল। সমাজের স্থান বরাবরই সরকারের ওপরে। সেই সমাজের বাঁধনকষণে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হলেও, রাষ্ট্রবিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে সমাজ ছিল একমাত্র তার আশ্রয়। গত দু-শ' বছরে সমাজ থেকে ব্যক্তি-মানুষ নানা দিক দিয়ে বের হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রকাশ্য ভোজনালয়, বাস, রেল, স্টিমারে একত্রে ভ্রমণ, আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও আদালতে সকলে আশ্রয় লাভের সুযোগ বর্ণকেন্দ্রিক সমাজে বেশ পরিবর্তন এনেছে। কায়স্থ, শূদ্র কি না তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করাও সম্ভব হয়েছে। নাগরিক জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনির্ভরতার পরিবর্তে রাষ্ট্রমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে সব দায়িত্ব যদি রাষ্ট্রকে বইতে হয়, তবে সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বা মেজাজ খারাপ হলে মানুষ দাঁড়াবে কোথায়?

রাষ্ট্র-চেতনা না বলে, একেবারে গোড়ায় গিয়ে, আমরা সমষ্টিচেতনার কথা বলব। আমাদের আনুগত্য, মমত্ব ও সহমর্মিতা পরিবার, কৌম, ধর্ম, বর্ণ ও বৃত্তি অতিক্রম করে জাতির কোঠায় পৌঁছেছে অতি ধীরে। আমরা এখনো বাঙালি নামের বানান ঠিক করতে পারিনি। পাড়া-গ্রাম-জেলা ছাড়িয়ে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ পার হয়ে রাষ্ট্র-চেতনায় পৌঁছুতে

আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের আত্মীয়-সম্পর্ক লতায় পাতায় ছড়িয়ে বৃহত্তর চেতনাকে ছেয়ে রেখেছে। আত্মীয়-সম্পর্ক শব্দের সংখ্যা এখানে প্রায় ২১৫। স্বজনতোষণ ও স্বজনপোষণে কোনো পার্থক্য নেই। এই আত্মীয়বন্ধন চাওয়া-পাওয়ার প্রত্যাশায় অবশ্য ঝুরঝুরে হয়ে যায়, তেমন দানা বাঁধতে পারে না, রেখে যায় নিরন্তর কলহের রেশ।

এদেশের সমষ্টিচেতনার পুরাকীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড়পুর, মহাস্থান, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষে। পাহাড়পুরের মহাবিহারে গিয়ে দাঁড়ালে এই প্রশ্ন সহজে মনে আসবে — কত বড় সামগ্র্যমতি প্রচেষ্টায় এই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের যে আয়তক্ষেত্র, তার দুটো বাহুই এদেশে অনুপস্থিত — ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এখানে ক্ষত্রিয়ের কাজ করে হাঁড়ি, বাগদি, ডোম, রাজবংশি, কৈবর্ত্য ও নমঃশূদ্ররা। এখানে বৈশ্যের কাজ করে যে বণিকরা তাঁরা বড়জোর সৎশূদ্র। পাল সৈন্যবাহিনীতে মালব, খশ, কর্ণাট, কুলিক, লাট, কম্বোজ, হুণ ইত্যাদি হরেক জাতের লোক ভর্তি করা হতো। ইংরেজের পুলিশ বাহিনীতে যাঁরা কাজ করত তাঁরাও বেশিরভাগ বহিরাগত। অতীতের যে সার্থবাহ বা শ্রেষ্ঠীদের কথা শুনি তারা কি আঠারো শতকের বণিকদের মতোই বাইরে থেকে এসেছিল সোনার বাংলার আকর্ষণে? আজ সারা বিশ্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তির প্রাধান্য। আমরা দুটোকেই খাটো করে দেখেছি। এবং দুটোর কাছে আমরা মার খেয়ে আসছি বহুকাল থেকে। কর ও শুল্ক বিভাগের দাপট, চোরডাকাতের ভয়, যাতায়াতের অসুবিধা, বাজারের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্র প্রয়োজনাতিরিক্তি উৎপাদনে আমরা উৎসাহ বোধ করিনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বা কর্মকাণ্ডের তেমন তাগিদও বোধ করিনি।

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর 'মেমোয়ার্স' (জীবনস্মৃতি-এ বলছেন, "সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একমাত্র মারাঠাদের আছে ঐক্যের বন্ধন, অন্য কোনো জাতের নেই।"

গত দু'শ বছর ধরে যে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার অব্যাহত সম্প্রসার, তারই আলোকে এক বর্ণাট্য পৌত্তলিকতায় এদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে! দেশপ্রেম প্রথমে শুরু হয় বাংলাকে ঘিরে। কালক্রমে যখন ইংরেজ শাসন আসমুদ্র হিমাচল প্রসারিত হলো, তখন উনিশ শতকের শেষার্ধে উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের প্রচেষ্টায় এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হলো। যদি ইংরেজ অধিকার সুবা-বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ কি আকার ধারণ করত? আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকালে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। নতুন চেতনায় ভারতমাতা বনাম বঙ্গজননী জাতীয় কোনো বিবাদ ছিলনা, মুসলমানরাও সর্বভারতীয় পশ্চাদ্‌পটে চিন্তা করত, নিখিল ইসলামের আকর্ষণ থাকলেও। এ শতকের ত্রিশ দশকে তারা স্বতন্ত্র আবাস ভূমির কথা চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণভিত্তিক যে সীমানা নির্ধারণ ও ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তার একটা প্রভাব ছিল সেই স্বদেশভূমির দাবিতে। বাংলা ভাষার জন্যে আমরা বিদেশিদের কাছে বহুদিন ধরে বাঙালি বলে পরিচিত। সেই ভাষার প্রতি মমত্ববোধ এক ভাষাকেন্দ্রিক ভাসাভাসা জাতীয় চেতনা থাকলেও তা পুষ্টতা লাভ করতে পারেনি,

আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় বা প্রমথ চৌধুরীদের মতো কেউ কেউ স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করলেও।

গত এক'শ বছরের দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে নানা মোড় ফিরে স্বাধীন বাংলাদেশের যে অভ্যুদয় ঘটেছে তা একটি চমকপ্রদ ঘটনা—অনেকের কাছে অভাবিত, অনেকের কাছে বহুপ্রতীক্ষিত এবং মুষ্টিমেয়ের কাছে, হয়ত বা অবাঞ্ছিত। বর্তমান জগতে উৎপাদনে প্রযুক্তির প্রয়োগ, ব্যবস্থাপনায় ও প্রশাসনে ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টিচেতনায় সমন্বয়সাধনের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একটি লিমিটেড-কোম্পানি, একটি সমবায় সমিতি বা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে যে ন্যূনতম সমষ্টিচেতনার প্রয়োজন সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা যদি প্রসার লাভ করে, তা হলে সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি ইতিহাসের দূর্জ্ঞেয় ধারায় অর্থবহ হয়ে দাঁড়াবে।

সাংস্কৃতিক ভূগোলে পূর্ব-ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো এদেশ নাকি বিধ্বস্ত বলয় (shattered belt)-এর অবস্থিত। আর্য, মৌর্য, চালুক্য, তিব্বতী, চোল, তুরস্ক, পাঠান, মোগল, মগ, পর্তুগিজ, ইংরেজ নানান জাতের হানাদারের হামলায় এদশের ধোলাই, পিটাই ও ঢাকলাই হয়েছে বহুবার। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাই অতীত হারিয়ে গেছে, বর্তমান শুধু দিনগত পাপক্ষয়। প্রাণধারণ ও মুখরক্ষা, এই দ্বিবিধ দায়ে জীবনচক্র এখানে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতি এখানে হাতের সুখে গড়ছে আবার পায়ের সুখে ভাঙছে। সেই লীলাময়ীর সঙ্গে যে গাঁট-ছড়ায় বাঁধা তা-ই আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এ যাবৎকাল নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। এক খণ্ডিত, প্রান্তিক ও লৌকিক সংস্কৃতি যে কুঁড়েঘরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তা গড়তে বাঁশ-খড় লাগে কম। পুড়ে ছাই হতেও সময় লাগে না। কিন্তু সুবাদে ঘর ফিনিক্সের আত্মীয়। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশে একটি শির্ণ স্বর্ণরেখা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান, সে বাঙালির জ্ঞানপিপাসা ও সাহিত্যচর্চা, তার গুণগত মান যা-ই থাকনা কেন।

এক উল্লম্ফন-উল্লঙ্ঘন প্রক্রিয়ায় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা এক অতিসামান্যকৃত বক্তব্য রাখলাম। পাঠকের কৌতূহল জাগিয়েই এই উপক্রমণিকার কাজ শেষ।

সমাজ বা সভ্যতার বিকাশের কারণ নিয়ে দূরকল্পনা, অর্ধসত্য ও বিতথ্য মিশিয়ে দর্শনোপম বা বিজ্ঞানোপম নানান নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব আমাদের আজ মাতিয়ে রেখেছে। অতীতের নিয়তিবাদ ও আধুনিক নিয়ন্ত্রণতত্ত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য রয়েছে। তার পৌরুষ, অহংকার ও দৌরাত্ম্যের জনে্য মানুষ কোনো তত্ত্বকে শেষ কথা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতি বা পরিবেশও মানুষকে কবুলিয়ত দিয়ে বসে নেই। তার স্বীয় ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষ এখনও সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেনি। তার প্রভাবের বাইরে এমন সব সহঘটনা বা দুর্ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যায় যে, তার জীবনধারাটি ঠিক সেই আগের মতো আর থাকে না। ঘটনা ও ঘটনার পেছনে যে ঘটনা, মানুষ তার কারণ জানতে চায়। এই তার স্বভাব। এই অনুশীলন তার মনকে বহমান ও সজীব রেখেছে। ইতিহাসের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে কথাটা উঠেছে সেটা কী সত্যি সত্য?

গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ

দ্বিতীয় ভাগ

শেখ মুজিবুর রহমান

আজ বংশরাজনীতি যেভাবে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছেয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তেমন অবস্থা বাংলাদেশে ছিল না। দাবি-দাওয়ার প্রস্তাব এবং তা আদায় করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিব সেই কৈশোর ও ছাত্র অবস্থা থেকেই এক ধরনের পারঙ্গমতা অর্জন করেন। সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রা-হরতাল সংঘটনের অভিযোগে ১৯৪৮ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দু'বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ভবিষ্যতে সৎ আচরণের মুচলেকা দিলে কয়েকজন আন্দোলনকারীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিব কোনো মুচলেকা না দেওয়ায় তাঁর সম্পর্কে বহিষ্কারাদেশ বহাল থাকে। কর্মী থেকে আঞ্চলিক নেতা এবং আঞ্চলিক বা গোষ্ঠী নেতা থেকে সারা দেশের অবিসংবাদিত নেতা হতে শেখ মুজিবকে নিরলস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হয়েছে। তার জন্য সরকারের রুজু করা একাধিক মামলায় তাঁকে আসামি হতে হয়েছে এবং কারাবরণ করতে হয়েছে।

শেখ মুজিব একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। বংশ-কৌলিন্য, বিদ্যার প্রাখর্য্য বা বিত্তের আনুকূল্যে তিনি বড় হননি। তাঁর কর্মোদ্যম, সাহস ও কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর বড় সহায়। কঠোর পরিশ্রমে সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করে তিনি বড় হয়েছিলেন। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে তিনি দেশের মানুষকে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়েছেন এক অননুকরণীয় এবং অতুলনীয় ভঙ্গিতে। তিনি যেমন দুর্দশার বর্ণনা করেন, তেমনি দেশের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তাঁর দুর্দশা-বর্ণনায় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁর আশার কথায় মানুষ উদ্দীপ্ত ও আশ্বস্ত হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার কোনো বিরতি বা ছেদ ছিল না। ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলন ও ছাত্রলীগ গঠন, ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগ গঠন ও খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ভুখা মিছিলের আয়োজন, ১৯৫১ সালে পাকিস্তান গঠনতন্ত্রের খসড়া মূলনীতির বিরোধিতা, ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে কারাগারে অনশন, ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিজয়, ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ, ১৯৫৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও সাংবিধানিক সংখ্যাসাম্যের বিরোধিতা, ১৯৫৭ সালে কাগমারি সম্মেলনে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে কারাবাস, ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতিবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, ১৯৬৩ সালের আইয়ুবি সংবিধানের বিরোধিতা এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক থেকে পদত্যাগ, ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের অনিরাপত্তাজনিত অবস্থার পর্যবেক্ষণ, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবির

প্রস্তাব, ১৯৬৭ সালে ১২টি মামলার সঙ্গে যোঝাযুঝি, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণকার্যে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা ও সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১৯৭১ সালের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন – একটি বাক্যে শেখ মুজিবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের এক অসম্পূর্ণ সারসংক্ষেপ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বছর না যেতেই রাজস্ব-বন্টন, উর্দুকে একক রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কথাবার্তা ও আচরণে এক অসহ্য শ্রেয়ম্মন্যতার আবহাওয়ায় তিতিবিরক্তি হয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ তাদের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা সম্পর্কে সোচ্চার হয়।

২৫শে আগস্ট ১৯৫৫ সাল পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববাংলা নামের বিলুপ্তির বিরোধিতা করে শেখ মুজিব বলেন:

Sir, you will see that they want to place the words 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it.

পূর্ববাংলার বেশির ভাগ নেতা পূর্ববাংলা নাম বিলোপের বিরোধিতা করলেও মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামপন্থীরা পূর্ব-পাকিস্তান নামের বিরোধিতাকে পাকিস্তান আদর্শ বর্জনের সমতুল্য বলে তুমুল হইচই করেন।

শেখ সাহেব নাকি কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহকে বলেছিলেন, 'দাদা, কী কন?' মণি সিংহ ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, যথার্থ সময়ের আগে কোনো কিছু করলে হঠকারিতা হয়ে যায়।

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ লাহোরে শেখ মুজিব ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সংবাদপত্রে এই শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারি দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী ছয় দফাকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করেন। প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম ও এমএনএ খাজা খায়রুদ্দিন এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফাকে বিপজ্জনক বলে বিশেষিত করেন। ১০ই মার্চ ১৯৬৬ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হুমকি দিয়ে বলেন, ছয় দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ চাপাচাপি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ হয়ে যাবে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানে যেসব ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে, তার সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলীর মৃত্যু, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে নাজিমউদ্দীনকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নিয়োগ, পূর্ববাংলায় গভর্নর শাসন, ১৯৫৪–তে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া, ১৯৫৬-র সংবিধান বাতিল ও ১৯৫৮-র সামরিক অভ্যুত্থান,

১৯৫৮-৬২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও আমলার নিয়োগ-বদলি, ১৯৬২-তে আইয়ুবের সংবিধান প্রবর্তন, ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৯-এ পূর্ব-পাকিস্তানবাসী স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল এবং অবশেষে ১লা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ – সব ঘটেছে অবাঙালি আমলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসাজশে। এরপরও ইসলামি সৌভ্রাতৃত্বের মমতায় যাঁরা পাকিস্তানের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অতি দ্রুত নতুন প্রজন্মের শ্রদ্ধা হারান। আরবি হরফে বাংলা প্রবর্তনের চেষ্টা, নজরুল-প্রক্ষালন ও রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ভোল পাল্টানোর যে চেষ্টা হয়, তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বাংলাদেশের তরুণদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিব বলেন : "এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে... একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই... আমি ঘোষণা করিতেছি – আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

৭ই জুন ১৯৭০ তিনি ঘোষণা দেন, আসন্ন নির্বাচন হবে ছয় দফার প্রশ্নে গণভোট। ১লা জুলাই ১৯৭০ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট-প্রদেশের অবসান ঘটে। পশ্চিম পাঞ্জাবের নতুন নাম হয় পাঞ্জাব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নাম অপরিবর্তিত রইল। পূর্ব-পাকিস্তান বাংলা বা এমনকি পূর্ববাংলাও হলো না।

১২ই নভেম্বর ১৯৭০ মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেশের উপকূলীয় জেলাগুলো প্লাবিত এবং নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অমনোযোগের কারণে মানুষের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সেই বেদনার কথা শেখ মুজিব বললেন, 'ভাগ্যের পরিহাস, যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান বাম্পার ক্রপ উপভোগ করছে, সে সময় দুর্গত এলাকায় প্রথম খাদ্যবাহী জাহাজ এসেছে বিদেশ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পটুয়াখালীতে মৃতদেহ দাফন করতে হচ্ছে ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যদের। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ অলসভাবে বসে আছে, সেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তের দেশের হেলিকপ্টারের জন্য। যে ক্ষেত্রে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র আমাদের জন্য উদারহস্তে সাহায্যের কথা ঘোষণা করতে পেরেছে মাত্র দু'দিনের মধ্যে, সেক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্গতদের জন্য পাঁচ কোটি টাকা সাহায্য ঘোষণা করতে সময় লেগেছে ১০ দিন।' শেখ মুজিব এক চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মারা গেছে, স্বাধিকার অর্জনে বাংলার আরও ১০ লাখ প্রাণ দেবে।'

১লা ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তানে সংঘটিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর

নাখালপাড়ায় মারা গেলো, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দিশিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো – তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬ দফা ও ১১ দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারও সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।'

৩রা জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ জনগণের সামনে এক শপথ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব হুঁশিয়ার করে দিলেন, 'যদি কেউ জনগণের রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।' শাসনতন্ত্র ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১ দফার প্রতিফলন থাকবে–এই আশ্বাস দিয়ে শেখ মুজিব বললেন, 'যে ভালোবাসা ও সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন তা আমি সারা জীবন মনে রাখব... জনগণের ভালোবাসা আমাকে যেন দুর্বল করে ফেলেছে।'

৭ই মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব তাঁর উদাত্ত ভাষণে জাতির উদ্দেশে এক সংগ্রামের ডাক দিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

এই ভাষণের শেষ কথা কি ছিল, তা নিয়ে যে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে তা বক্তৃতাটির গুরুত্বকে বিন্দুমাত্র খর্ব করে না।

একজন মানুষের কণ্ঠস্বর তার পরিচয় বহন করে। শেখ মুজিবের উচ্চারণে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, কোনো ভঙ্গিমা ছিল না। আর পাঁচটা বাংলাদেশের মানুষের মতো তা ছিল সাধারণ। কিন্তু সেই উচ্চারণের মধ্যে যে সাবলীলতা ছিল, তা অসাধারণ। তাঁর বজ্রকণ্ঠে যে নির্ঘোষ ছিল, তাও অতি বিরল। তাঁর ভাষণে 'আমি ও আমার' জাতীয় অহংপ্রবল শব্দের বহুল ব্যবহার ইতিহাসের কিছু খ্যাতনামা বাগ্মীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫ই এপ্রিল ১৯৭১ এক প্রতিবেদনে *নিউজ উইক* সাপ্তাহিকীতে শেখ মুজিবের বাগ্মিতা সম্পর্কে বলা হয়, 'উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি পাকিস্তানের এ তিনটি ভাষাতেই

সাবলীল, মুজিব নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে ভান করতেন না। তিনি প্রকৌশলী নন, রাজনীতির কবি; তবে যেভাবেই হোক প্রযুক্তির চেয়ে বাঙালিদের শিল্পকলার প্রতি প্রবণতা বেশি, আর তাই তাঁর শৈলীই যথার্থ ছিল সেই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে একতাবদ্ধ করার প্রয়োজনে।'

৭ই মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত থাকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত। ২৫শে মার্চ ভুট্টো বলেন, 'আওয়ামী লীগ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তাকে আর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। ওদের দাবি তো স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশি, প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।' ২৬শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ফলে অতি দ্রুত 'স্বাধীনতা'র প্রশ্নটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। ইতিমধ্যে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এবং ২৩শে মার্চ থেকে দেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।

২৬শে মার্চ চট্টগ্রামে মুখে মুখে একটা খবর হয় যে ওই রাতে 'প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে শক্তি সংহত করার জন্য শেখ মুজিব এক বাণী পাঠিয়েছেন। ২৭শে মার্চ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র কালুরঘাট থেকে 'মহান নেতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে' ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান এক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। পরে ১০ই এপ্রিল 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন, সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা' বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগর) এক গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

বদরুদ্দীন উমর ১৫ই জানুয়ারির *সাপ্তাহিক ২০০০*-এ বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, এটা এখন অতি উচ্চস্বরে প্রচারিত হলেও এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। এ রকম কে কবে শুনেছে যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে এবং জনগণকে সেই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কোনো সেনানায়ক কিংবা মহান রাজনৈতিক নেতা নিজে বাড়িতে বসে থেকে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এটা করেন যখন তাঁর নিজ দেশের হাজার হাজার মানুষ ফ্যাসিস্ট সামরিক বাহিনীর হাতে মারা পড়েছেন।'

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বক্তব্য : "১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিলাম। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটির প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে, স্টেশন রোডের ডাকবাংলোয়। ২৬শে মার্চ দুপুরে সেখান থেকে আমাকে টেলিফোন করেন অ্যাডভোকেট রফিক। বলেন, জরুরি বার্তা আছে, লিখে নিন এবং ক্যাম্পাসে ও আপনাদের এলাকায় প্রচারের ব্যবস্থা করুন। লিখে নিলাম বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা ঘোষণা'। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নান সেটাই পাঠ করেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে। ২৭শে মার্চ মেজর জিয়া স্বকণ্ঠে ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওই বেতারকেন্দ্র থেকেই। আমি শুনিনি, অনেকেই শুনেছিলেন। ২৮শে মার্চে

জিয়াউর রহমান সংশোধিত ঘোষণা পাঠ করেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাঁর সঙ্গে ১০ই এপ্রিল রামগড়ে আমার দেখা হয়। আমি যখন বলি যে, বেতারে তাঁর ঘোষণা শুনেছি, তিনি জানতে চান, 'কোনটা?' আমি বলি, যেটায় আপনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

মেজর জিয়ার ঘোষণা আমাদের অনেক শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। এ ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব লঘু করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু জিয়ার অনুরাগীরা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কথা অস্বীকার করতে চান। বঙ্গবন্ধু নিজে ঘোষণা লিখে গিয়েছিলেন, না তাঁর নামে ওই ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল এ সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু ঘোষণা যে প্রচারিত হয়েছিল এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার আগেই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বঙ্গবন্ধুর নামে ওই ঘোষণা প্রচারিত না হলেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে থাকতেন।" (*মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫)।

পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে ঘরের ছেলে শেখ মুজিব ঘরে ফিরলেন ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্সের ময়দানে পৌঁছতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লাগে। শেখ মুজিব তাঁর আবেগাপ্লুত বক্তৃতার মাঝে কয়েকবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি বললেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না।

তিনি বললেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি বাঙালির হে বঙ্গ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।'–কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ।"

বিজয়ের নয় মাসের মধ্যে দেশের সংবিধান প্রণীত হয়। শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করেছে।' বোধ হয় নয়, সত্যিই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাঁদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করেছেন। চার মূলনীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি বললেন, 'ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন সকলের আগে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি।... জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে, সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।'

গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র – সেই গণতন্ত্র যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে।' সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বললেন, 'আমাদের সামজতন্ত্র মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না।' তিনি বললেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়...ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না... যদি কেউ বলে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে শেখ মুজিব বলেন, 'আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপনের আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, তারাও অনুতপ্ত হলে তাঁদের দেশগড়ার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।'

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষণ দান করেন। তিনি বিশ্বশান্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে বলেন : 'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ওই সব যুদ্ধবন্দী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।'

তাঁর ভাষণের উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন, 'মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করিবার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি। কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।'

২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'কোনো দেশের ইতিহাসে নাই বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো দেশে, কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম... সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম।... বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাসুন, দেশের জন্য কাজ করুন, (দেশের) স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নিন, থাকুন। কিন্তু (তাঁদের) অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনো গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।'

২৬শে মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় শেখ মুজিব বললেন, 'ভায়েরা, বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমরা সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা কো-একজিস্টেনসে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এজন্য যে, এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানিরা আমার সম্পদ এক পয়সাও দিল না, আমার বৈদেশিক মুদ্রার কোনো অংশ আমাকে দিল না। আমার গোল্ড রিজার্ভের কোনো অংশ আমাকে দিল না। একখানা জাহাজও আমাকে দিল না। একখানা প্লেনও আমাকে দিলো না। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ এক পয়সাও আমাকে দিল না এবং যাওয়ার বেলায় পোর্ট ধ্বংস করলো, রাস্তা ধ্বংস করলো, রেলওয়ে ধ্বংস করলো, জাহাজ ডুবিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানিরা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখাতে পারবো যে, তোমরা কী করেছো।'

১৯শে জুন ১৯৭৫ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সভাপতির ভাষণে শেখ মুজিব বলেন, 'আমাদের অনেক পুরোনো নেতৃবৃন্দ আছেন, আমার মনে পড়ে না যে, দশ-বিশ বছরের মধ্যে তাঁদের কেউ পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালাগালি না করে ফিরে গেছেন। এ আমার জানা নাই বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু তাও বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বললাম, যদি কিছু ভালো কথা বলতে চাও, বলো। যদি দেশের মঙ্গল হয়, বলো। কিন্তু দেখতে পেলাম কী? আমরা যখনই এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এ দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তারা এ দেশের স্বাধীনতা বানচাল করবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস – একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কাল থেকে সংবিধান প্রবর্তন পর্যন্ত শেখ মুজিবের যে অবিসংবাদী নেতৃত্ব ছিল তাতে অতি দ্রুত চিড় ধরতে থাকে। যে রাজনৈতিক দল দেশের স্বাধীনতা আনে, সেই দলকে উৎখাতের পথ সংগোপনে তৈরি হতে শুরু করে। এক অগাধ আত্মবিশ্বাসে নিজেকে অজাতশত্রু মনে করে শেখ মুজিব বিভীষণদের কাছে টেনে মিত্রদের দূরে ঠেলে দেন। তিনি ভেবেছিলেন যে বিভীষণদের তিনি ব্যবহার করবেন। কিন্তু বিভীষণদেরই শেষ পর্যন্ত জয় হলো। যে কালকূটদের বাহ্য আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাৎসল্য রস তৃপ্ত হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, ওরা আমার সন্তান, আমার কোনো ক্ষতি করবে না, তারাই শেষে তাঁর কাল হলো। এক সময় জনগণের ভালোবাসা পেয়ে যিনি নিজেকে দুর্বল মনে করতেন, সেই শেখ মুজিব আত্মীয়স্বজনের প্রতি দুর্বলতায় দ্রুত জনপ্রিয়তা হারালেন।

বাকশাল প্রশাসন পদ্ধতির পক্ষে বলতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন, 'আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম। আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখব না, সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আর সকলই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেশতা নই, শয়তানও নই। ফেরেশতা হইনি যে সব কিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট, রেকটিফাই ইট। কেননা, আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে।'

বাকশালের বিরোধিতা করেন জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। যাঁরা পরে ১৫ই আগস্টকে নাজাত দিবস অভিহিত করেন, তাঁরা সকলেই বাকশালে যোগ দেন।

চতুর্থ সংশোধনী এমন এক সংকটকালে পাস করা হয়েছিল, যে সময় দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে বেশি। নৈরাজ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তা রোধ করতে বহু রাজনীতিবিদ হিমশিম খেয়েছেন। চতুর্থ সংশোধনী এমন এক সময় পাস হয় যখন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে একদলীয় সরকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আমাদের বিদেশি শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে দেশি পরামর্শকদের বিভ্রান্তি অযথা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শেখ সাহেবকে একবার কথায় কথায় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর অননুকরণীয় ভাষাতেই শোনা যাক, "আপনার হাতে তো অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, 'তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল।' শেখ সাহেব কইলেন, 'আগামী ইলেকশানে অপজিশন পার্টিগুলো ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইবো না।' আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, 'আপনে অপজিশনের একশো সিট ছাইড়া দেবেন না?' শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবের স্টেটম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।" (আহমদ ছফার *যদ্যপি আমার গুরু*)

পরে যখন শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখন বাংলাদেশ*: স্টেট অব নেশন* বক্তৃতায় অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে উল্লেখ করেন ষোলবার। বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এ সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধ। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক

অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা, তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল।' (উক্ত ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা ভাষ্য)

রাষ্ট্রপতি সায়েম বলেন, '১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, চতুর্থ সংশোধনী একটি সাময়িক পদক্ষেপ এবং তিনি উক্ত সংশোধনীর পূর্বেকার সংবিধান আবার ফিরিয়ে আনবেন। রাষ্ট্রপতি সায়েম তাঁর এক বইয়ে লেখেন, 'আমার এ কথা মনে করার কোনো কারণ ছিল না যে, তখন তিনি যা বলেন তা তার মনের কথা নয়, সংসদ তারই, মানে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য ছিল তারই দলের।'

তানজানিয়ার জুলিয়াস নিয়েরেরেকে শেখ মুজিব অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। নিজেকে তাঁর মতো সংশোধন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশ তার বহু অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রতি যে একাত্মতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বের মানুষের মনে উৎসারিত হয়েছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ সংশোধনীর নানা সমালোচনা সত্ত্বেও পরে শক্তিধরদের কাছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ মোটামুটি বেশ উপাদেয় ঠেকেছিল।

শেখ মুজিবের জীবন লক্ষ করলে একটা জিনিস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে একজন অবিসংবাদী নেতার জনপ্রিয়তা কত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে পারে এবং ব্যক্তিটি কত বিভিন্ন বিষয়ে অকস্মাৎ বিতর্কিত হয়ে উঠতে পারেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তা কিছুটা নষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল তার পেছনে রয়েছে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ও হতাশার টানাপোড়েন, শেখ মুজিবের শত্রুদের নিরলস প্রয়াস এবং তাঁর বন্ধুবর্গের নিষ্ক্রিয়তা। ক্ষমতায় আসার আগে শেখ মুজিব যে সাফল্যের সঙ্গে বিরোধী রাজনীতি করেছিলেন, সরকারি প্রশাসনের কর্ণধার হওয়ার পর সে সাফল্য অন্তর্হিত হলো। সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি শনাক্ত করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল না তাদের প্রশাসনে রেখে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন সাবধানবাণী কাস্ত্রো, টিটো বা বুমেদিয়েন উচ্চারণ করে থাকলেও বিরল আত্মবিশ্বাসে শেখ মুজিব সে সম্পর্কে তখন তেমন দুশ্চিন্তা করেননি। আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কাস্ত্রো শেখ মুজিবকে এই বলে হুঁশিয়ারি করেন যে পৃথিবীময় তিনি শত্রু সৃষ্টি করেছেন। শেখ মুজিব যে অহঙ্কারে নিজেকে অজাতশত্রু মনে করেছিলেন, তার ভিত্তি মোটেই শক্ত ছিল না।

দেশের কতটুকু শক্তি বা কতটুকু দুর্বলতা তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বাঙালি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করায় এবং তা বড় অসম্পূর্ণভাবে সমাধা করায় জাতীয় অর্থনীতিতে সুফল আসেনি। বরং তাতে দেশের উৎপাদক ব্যবসায়ীরা মনঃক্ষুণ্ণ হন। খুচরো ব্যবসায়ী রাতারাতি বড়লোক হয় মজুদদারির সুযোগ পেয়ে। হঠাৎ অনর্জিত মুনাফার মধ্যে পুঁজির প্রয়োজনীয় কাঠিন্য বা স্থৈর্য ছিল না। শেখ মুজিব গঠনমূলক চিন্তা করার অবকাশ বা অবসর পাননি। রাজনৈতিক দলগুলোর

ক্ষমতাহীনতা ও কোন্দল, সুযোগসন্ধানী বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের ক্ষমতার বলয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ও দুর্নীতি, অর্থনীতিবিদদের অবাস্তব পরিকল্পনা এবং তার চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিদের সীমাহীন অর্থলিপ্সা মধ্যাহ্নে অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল।

শেখ মুজিবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল বিস্ময়কর। নাইজেরিয়ার জেনারেল ইয়াকুব গাওয়ান যখন বললেন, 'অবিভক্ত পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশ, কেন আপনি দেশটিকে ভেঙে দিতে গেলেন।' উত্তরে শেখ মুজিব বললেন, 'শুনুন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়তো শক্তিশালী ছিল। তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়ে শক্তিশালী হতো সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সবকিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়?'

কোনো আরব রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবের আমলে বাংলাদেশের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা দেশের নামের আগে বিশেষ কোনো শব্দ সংযোজনের প্রস্তাব করার সাহস পাননি।

যুগসন্ধির প্রভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রভাবান্বিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগে উপনিবেশ-বিমুক্তির আন্দোলনের সময় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্র এবং তা সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালে দেশে যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ করা হয়, তার দাবি ১৯৪৭ সালের পর থেকেই আলোচিত হয়ে এসেছিল। সেটা যে জনগণেরও দাবি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটি যে সফল হয়নি তারও কারণ অনেক। আমাদের পাশের দেশ ভারত মিশ্র অর্থনীতির জগতে সেদিন নেতৃত্ব দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি তিন দশক পরে ঘটত তবে কি আমাদের সংবিধানে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তেমন তাগিদ থাকত বা সমাজতন্ত্রের একটা নতুন অর্থ প্রদান করার প্রয়োজন হতো? দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে যে বেসরকারিকরণের কথা আজ এত প্রাসঙ্গিক, সোভিয়েত রাশিয়ার জয়কালের সময় তা উত্থাপিত হয়নি। সেদিন রাশিয়ার অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বহু রাষ্ট্রের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয় ছিল। আমাদের দেশের একদলীয় শাসনের সূত্রপাত বড় অসময়ে হয়েছে। সমাজতন্ত্র কোনো অর্থনৈতিক জীবন বা সামাজিক সুফল রেখে যায়নি।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ মিত্রশক্তির কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর পরই পাকিস্তানপন্থিরা দেশে ও বিদেশে তৎপর হয়ে ওঠে। যেসব দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের সামান্য চিহ্ন ছিল, সেসব দেশ বাংলাদেশের বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করায় সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে কোনো সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রকাশ করেনি। সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশকে সাহায্য করায় চীন তার মিত্র দেশ পাকিস্তানকে পুরো সমর্থন জানায়। সোভিয়েত রাশিয়া বা সমাজতন্ত্রী দেশ সম্বন্ধে যেসব দেশ ভিন্নমত পোষণ করত, তারা প্রায় সবাই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। জনসংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হলেও মুসলিম বিশ্বে তার অবস্থা ছিল বড়ই অনাদরের। সেই মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি এবং বিশেষ করে যে দেশ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, সে দেশের স্বীকৃতি সম্পর্কে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার বড় দুশ্চিন্তায় ছিল।

একটি সদ্য স্বাধীন দেশ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে বাজেট সমন্বয় করা ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণের জীবন ব্যতিব্যস্ত। সেই সংকটকালে অন্য দেশের মতামতকে অগ্রাহ্য করা সমীচীন মনে না করে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কয়েক লাখ লোক পাকিস্তানে আটকে পড়ে। কয়েক সহস্র বাঙালি কর্মচারীকেও পাকিস্তান সরকার আটক করে রেখেছিল। এই আটকে পড়া ও আটক হওয়া বাঙালিদের ফেরত নিয়ে আসার লবি বাংলাদেশ সরকারের ওপর এক দারুণ চাপ সৃষ্টি করে।

জে এন দীক্ষিত তাঁর *লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ডে* বলছেন, 'এমনকি এই স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধাপরাধীর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ কিংবা মামলার নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে তেমন তৎপর ছিল না।'

শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত) হাকসারকে নাকি বলেছেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধার কারণে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-বিষয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিত বলছেন, 'হয়তো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কথা ভেবেই মুজিব এ ধরনের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে চালিত হয়েছিলেন। তিনি এমন কিছু করতে চাননি যাতে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে আটকে রাখলে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করলে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হতো। স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশ উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চায় বলে সমালোচনা হতো : উপমহাদেশে শান্তি ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার বৃহত্তর স্বার্থে মুজিবুর রহমানের এ মনোভাব সঠিকই ছিল। আর তা ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ভুট্টো-ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক আয়োজনে সাহায্য করে।'

বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক মহলে যে সহানুভূতি ছিল, ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পর তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। আন্তর্জাতিক জগতে কূটনীতির নানা টানাপোড়েনে বাঞ্ছিত লক্ষ্যও অনেক সময় অনায়ত্ত থেকে যায়।

পাকিস্তান আমলে দেশের বরেণ্য নেতাদের 'শেরেবাংলা', 'কায়েদে আজম' বা 'কায়েদে মিল্লাত' অভিধায় ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে যে সম্মাননার নামে ভূষিত করা হলো সেই বঙ্গবন্ধুর নামের জন্ম বাংলা ভাষায়। চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু অভিধায় সম্মানিত করার নজির থাকলেও পদ্মা-যমুনা-মেঘনার দেশের নেতাকে সেই দেশের ভাষায় সম্মাননায় ভূষিত করার ব্যাপারটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, সিকান্‌দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান প্রমুখ বাংলাদেশের কবির কাছ থেকে শেখ মুজিব যে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা প্রশংসা পেয়েছেন তার সৌভাগ্য সমসাময়িক কালে আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

১৮ই জানুয়ারি ২০০১ জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি বেসরকারি বিল পাস করে জাতির পিতার প্রতি কটূক্তি ও অবমাননাকর কোনো লিখিত বা মৌখিক বিবৃতির জন্য অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ড ও অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান

করা হয়। ওই আইনে জাতির পিতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় : 'জাতির পিতা' অর্থ বাংলাদেশের স্থপতি এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ২ নম্বর আইন)-এর ধারা ৩৪-এর দফা (খ) দ্বারা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (;)।

২০শে জুন ২০০১ ধ্বনিভোটে সংসদে জাতির পিতার পরিবার সদস্যদের নিরাপত্তার আইন পাস হয়। ওই ২০০১ সালের ২৯ নং আইনে 'জাতির পিতা'র একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা দেওয়া হয় : 'জাতির পিতার অর্থ The Proclamation of Independence বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রূপকার এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ২ নং আইন) এবং ধারা ৩৪-এর দফা (৪) দ্বারা সাংবিধানিকভাবে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত (;)।'

উপরিউক্ত আইন দুটি অষ্টম সংসদ বাতিল করে দেয়। আইনের মাধ্যমে জাতির জনকের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা স্বল্পকালের জন্য কার্যকর ছিল। আমরা সাধারণত আইনের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা জানাই না, কিন্তু আইনের সর্বপারঙ্গমতা সম্পর্কে এক দারুণ অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করি।

ব্যক্তিবন্দনার অতিরঞ্জনে ও স্তাবকতায় একজন বড়মাপের মানুষও ছোট হয়ে যায়। টাঁকশাল থেকে সদ্যমুদ্রিত মুদ্রা বহুব্যবহারে ক্ষয় হয়, অনেক সময় মেকি বলে লোকের সন্দেহ হয়। আমাদের জীবনে যেসব মহৎ আদর্শকে আমরা উচ্চস্থান দিই তার সবগুলোই একজন ব্যক্তি বিশেষের স্বপ্ন বলে প্রচার করায় কোনো লাভ নেই।

গত পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসকে একটি দলের সাফল্য-অসাফল্যের সঙ্গে একাত্ম করে দেখলে দেশে বিভাজন বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না। এই বিরোধিতা-পরস্পরবিরোধিতার মধ্যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করার বা বাংলাদেশকে ভারতের প্রদেশ বানানোর মতো সব দারুণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

ইতিহাস চর্চায় নানা কারণে দিক পরিবর্তন হয়। 'ইতিহাস এখন রিম্যান্ডে' শীর্ষক একটি ছোট কবিতায় আমি ইতিহাসের পুনর্লিখনের দুর্গতির কথা বলেছি। তাই বলে আমার কথায় ইতিহাসের পুনর্লিখন বা পুনর্মূল্যায়ন থেমে যাবে না। এ বিষয়ে উৎসাহীদের অভাব নেই। যাঁরা বৈশ্যবুদ্ধি রপ্ত করেছেন তাঁদের রচনায় ইতিহাসের দেবী ক্লিও পর্যন্ত অধোবদনে নীরব সম্মতি জানাতে বাধ্য হন।

১৯৭১ সালে দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে শেখ মুজিবের নামে। বিশ্বে বাংলাদেশ শেখ মুজিবের দেশ বলে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আর কারও অবদান তাঁর চেয়ে বেশি ছিল না। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি-পিতা, অনেকের মতে জাতির জনক। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিবিসি) বাংলাভাষী শ্রোতাবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলাদেশের মানুষ শেখ মুজিবের মাঝে স্বদেশকে উপলব্ধি করে। সেই শেখ মুজিবকে নিয়ে দেশের মানুষের মনে যে অহঙ্কার ছিল, তা এক বড় আক্ষেপে শেষ হয়। বিজয়ের বছর শেষ না হতেই দেশে আইনশৃঙ্খলার ক্রমাবনতি, ভোগ্যপণ্যের অভাবিত মূল্যবৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন

অভাব-অনটনে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে ওঠে। দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফলে এক নিদারুণ হত্যালীলায় শেখ মুজিবের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর কাছে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরো পূরণ হয়নি এবং সেই আশা পূরণের কী সম্ভাবনা ছিল তাও অজানা রয়ে গেল। শেখ মুজিব এক অসাধারণ ব্যক্তি, এক অতি আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। মুজিব-সমর্থক ও মুজিব-বিরোধীদের জন্য বাংলাদেশ যে বিদ্বিষ্টভাবে বিভক্ত তাতে মুজিবের পক্ষে ও বিপক্ষে লিখতে গেলে সে এক সপ্তকাণ্ড ইতিহাস হবে।

১৪ই আগস্ট ১৯৯৬ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রথম শোক দিবস পালিত হয়। শেখ মুজিবকে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দায়মুক্তি দেওয়ার ইনডেমনিটি আইন ১২ নভেম্বর ১৯৯৬ বাতিল করা হয়। ১২ই মার্চ ১৯৯৭ সেই হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়। ২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৮ সেই মামলার সাক্ষী মে. জে. খলিলুর রহমান বলেন, 'যখন সরকার খন্দকার মুশতাক আহমদকে সরানোর এবং মে. জে. জিয়াউর রহমানকে অবসর দেওয়ার চিন্তা করেছিলেন তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।'

৮ই নভেম্বর ১৯৯৮ বিচার আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১৫ জনকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। আসামি বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আনা হয়।

১২ই নভেম্বর বিবিসির এক প্রতিবেদনে মার্কিন সাংবাদিক, লেখক লরেন্স লিফস্যুলজ মন্তব্য করেন,'সৈন্যদেরই শুধু বিচার হয়েছে, কিন্তু তাদের পেছনে যে রাজা বা রাজার হাতি ছিল তাদেরকে ছোঁয়া হয়নি।' ওই মামলার সরকারি কৌসুলি সিরাজুল হক বলেন, 'বহিঃশত্রুর ব্যাপারে আঁচ পেলেও যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে এ নিয়ে কিছু করা সম্ভব হয়নি।' রাজনৈতিক কারণে পরাশক্তির সংশ্লিষ্টতার প্রশ্নটি উত্থাপনের সমস্যার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে হত্যা মামলাটি বিচারাধীন আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি

রাষ্ট্র-স্বীকৃতির নিয়মগুলো আন্তর্জাতিক প্রথাভিত্তিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা চুক্তির শর্তাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পর একটি রাষ্ট্র জাতিসভার সদস্য হয়। সদস্য হওয়ার কারণে কিছু অধিকার ও দায়িত্ব সেই রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্তি একান্ত প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে তেমন ঐকমত্য নেই। স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের পরিষ্কার ইচ্ছা প্রজ্ঞাপন বা ঘোষণা দ্বারা ব্যক্ত হয়। পরোক্ষ স্বীকৃতি সহজে অনুমিত হয় না। স্বীকৃতিদানের পূর্বে কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করার অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে নেই। তবু আন্তর্জাতিক রেওয়াজে কোনো কোনো সময় শর্ত আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাৎসি জার্মান দখলিকৃত দেশসমূহের কাছ থেকে গণতন্ত্রায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি আদায় করে মিত্র শক্তিরা স্বীকৃতি দান করে।

যখন গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন সেই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্রকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে নতুন রাষ্ট্রের হালহকিকত কেমন, ঠিক মতো নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কিনা। একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সংঘটিত গৃহযুদ্ধের বিদ্রোহীদের যুধ্যমান কর্তৃত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে, যদি তারা রাষ্ট্রের কোনো এক অঞ্চল নিজের দখলে ও তাঁবে রাখে, নিজেদের শাসনের জন্য একটা সরকার গঠন করে এবং লড়াই করার সময় যুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন মোটামুটি মেনে চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন স্পেনের লাতিন আমেরিকান উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব ক্যানিঙ তাদের স্বীকৃতি জানানোর সময় বলেছিলেন 'একটা নতুন রাষ্ট্রের সরকারের স্বাধীনতাকে স্বীকার করার পূর্বে সেই সরকারের সব স্থায়িত্ব থাকবে পুরাতন এক সরকারের মতো, এমন অনমনীয় ও খুঁতখুঁতে হয়ে জিদ করার কোনো ছুতো আমাদের নেই।' যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কোনো মিত্রদেশে নির্বাসনে অস্থায়ী সরকার গঠন করে তখন সেই সরকারকে হুটোপুটি করে স্বীকৃতি দান জননীরাষ্ট্রের পক্ষে বেআইনি কর্ম বলে মনে হতে পারে। ১৪ই মে ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন রাতারাতি ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় তখন তা হঠকারিতার শামিল বলে গণ্য হয়। কারণ তখনো ইসরাইল রাষ্ট্র কোনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে যখন ভারত স্বীকৃতি দেয় তখন একই প্রশ্ন ওঠে। বলা হয়, সেই সময় প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব-পাকিস্তান, পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যে-অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে খুঁটি গেঁড়েছিল তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখে বড়ো অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। ১০ দিনের মধ্যে যখন পাকিস্তান বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধ নিশ্চিত বিজয় অর্জন

করে, তখন আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতিদানের চুলচেরা পর্যালোচনা করার আর কোনো অবকাশ রইল না।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ মিত্রশক্তির কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পরপরই পাকিস্তানপন্থিরা দেশে ও বিদেশে তৎপর হয়ে ওঠে। যেসব দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের সামান্য চিহ্ন ছিল সেসব দেশ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করে। রাষ্ট্র-পরিচালনের নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করায় সৌদি আরব ও তার মিত্র দেশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে কোনো সমবেদনাও প্রকাশ করেনি। সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশকে সাহায্য করায় চীন তার মিত্র দেশ পাকিস্তানকে পুরো সমর্থন জানায়। সোভিয়েত রাশিয়া বা সমাজতন্ত্রী দেশ সম্বন্ধে যেসব দেশ ভিন্নমত পোষণ করে তারা প্রায় সবাই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। জনসংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হলেও মুসলিম বিশ্বে তার অবস্থা ছিল বড়ই অনীর্ষণীয়। সেই মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি এবং বিশেষ করে যেদেশ থেকে বাংলাদেশ নিজেকে বিমুক্ত করে সেই দেশের স্বীকৃতি সম্পর্কে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার বড় ভাবিত ছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ইসলামি কনফারেন্সে মহাসচিবকে জানিয়ে দেয় যে যেহেতু পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি সেহেতু লাহোরে আহুত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ১৬ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করলেন এই শর্তে যে, বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ এই নিশ্চয়তা দান করবে যে ১৯৫জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করা হবে না। ২২শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। একই দিনে ইরান ও তুরস্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে পরের দিন লাহোরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

এক মাসের মধ্যে নাইজেরিয়া, কাতার, আরব আমিরাত ও কঙ্গো (ব্রাৎসাভিল) থেকে স্বীকৃতি আসে। পাকিস্তানসহ ১২১টি দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পথে তেমন কোনো বাধা রইলো না। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত প্রস্তাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হলো।

২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বিশ্বশান্তি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে বলেন : 'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই না। এবং সবশেষে ১৯৫জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।'

তার ভাষণের উপসংহারে শেখ মুজিব বলেন, 'মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করিবার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আন্তর্জাতিক সহাযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে'।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যদের হাতে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। পরের দিন সৌদি আরব ও সুদান এবং ১৬ দিন পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এক বন্ধুর ও কুটিল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে সুদৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেন এবং একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র গঠন করেন। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির এক আদেশের বলে দেশের অস্থায়ী সংবিধান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২-এর অধীনে ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ একটি নতুন গণপরিষদ গঠিত হয়। সংবিধান প্রস্তুত ও খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের জনগণ সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকার করা হয় : '...আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।'

আমাদের সংবিধানের শব্দ, বাক্যাংশ এবং ধারণাগুলো অন্যান্য দেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল থেকে ঋণ করা হয়। নয় মাসে সংবিধান রচনা সমাধা করার জন্য আমরা মাঝে-মধ্যে অহঙ্কার করি। চার মাসের কম সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে দেশে শাসনতন্ত্রের কাঠামো সত্বর সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজটা ভালো হয়েছিল।

১৯৭২ সালের পর সংবিধান কথাটা চালু হয়েছে। আগে সংবিধানকে শাসনতন্ত্র বলা হতো। শিক্ষিত সমাজে সংবিধান নিয়ে নানা বাহাস হয়েছে। সংবিধানের চেয়ে আইনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয়টা নিবিড়। এমনকি বকলমের লোকও আইনের ধকল বোঝে, কিন্তু তার পক্ষে সংবিধানের দায়দায়িত্ব বা তার প্রতি আনুগত্যের কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। শিক্ষিত লোকেরাই অনুধাবন করতে পারে না।

আমাদের বদ্বীপ দেশটির মতো আমাদের সংবিধানের ভাগ্যেও নানা ধরনের শিকস্তি ও স্বস্থলপয়োস্তি ঘটেছে। সামরিক শাসনামলে সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয় এবং চতুর্থ তফসিলের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয় : ১৯৭৭ সালের ঘোষণা আদেশ ১ অনুযায়ী সংশোধনীর ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠটি প্রাধান্য পাবে। সংবিধান যখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের অধীনে কার্যকর থাকে এবং যখন সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে সংবিধানকে কার্যকর থাকতে দেওয়া হয়নি – এই উভয় সময়েই সংবিধানের সুদূরপ্রসারী ও মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়।

১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল ১নং ঘোষণা আদেশ ১৯৭৭ দ্বারা প্রস্তাবনার শীর্ষে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং প্রস্তাবনায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা

ও বিশ্বাস' শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়। 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম' শব্দগুলোর স্থলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা তুলে দিয়ে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির একটি অর্থ দেওয়া হয়। নাগরিকত্বের নামকরণ 'বাঙালি' থেকে 'বাংলাদেশী' করা হয়। সরকারের সবচেয়ে কম বিপজ্জনক অংশ বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিধানগুলো ২১টি বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন করা হয়েছে।

১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ড একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে দু-দু'বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৭৫ সালে সংবিধান বাতিল করা হয়নি। ১৯৮২ সালে সংবিধান স্থগিত করা হয়েছিল। এই ধরনের সেনা স্বৈরতন্ত্রে পুরাতন আইনি কাঠামোকে সম্পূর্ণ বাতিল বা ধ্বংস না করার জন্য তা সাময়িক বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত হয় যখন সাংবিধানিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ঘটে।

সামরিক আইন একটি স্বল্পকালীন আয়োজন, অন্তর্বর্তীকালীন প্রয়োজন মেটায়। যখন বিদায় নেয়, তখন দায়মুক্তির জন্য সাধারণত তার অতীতের ক্রিয়াকর্ম আইনসিদ্ধ করতে হয় একটি অনুচ্চারিত স্বীকারোক্তি করে যে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এর হস্তক্ষেপ মার্জনা করা প্রয়োজন। বিদায়ের পর দেশের সাধারণ আইন-কানুনের ওপর কোনো ছায়া ফেলে না।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বাংলাদেশের মাটিতে কতবার উচ্চারিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষায় কতবার তা লিখিত হয়েছে তার শুমার করতে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। আইনের শাসন সম্পর্কে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে তাকে স্বায়ত্ত ও স্বতন্ত্র করা দরকার। ১৯৫৪ সালের একুশ দফার ১৫ দফার ছিল এ সম্পর্কে একটি অঙ্গীকার। এ প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৫৭ সালের ৩৬নং আইনটি পাস করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত দুই পঙক্তির একটি নোটিফিকেশন দিয়ে আইনটি জারি করার তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। পাকিস্তানের ল' কমিশন (১৯৬৯-৭০) এবং বাংলাদেশের ল' কমিটি (১৯৭৬) উক্ত আইনটি অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করে। এ-পর্যন্ত কোনো সরকার সেই আইনটি কার্যকর করেনি। সেই আইনটির গুরুত্ব সম্পর্কে ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদের দ্বিধাহীন থাকা উচিত ছিল। গণপরিষদ বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ২২ অনুচ্ছেদে সংবলিত করে। 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিজস্ব আর্থিক ও ক্ষমতার সাশ্রয় পর্যাপ্ত নয় বলেই সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা করিবেন।'

গত ত্রিশ বছরে এই অনুচ্ছেদের প্রতি বহুবার অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি আরোপ অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

সংসদের ৩০০ সদস্যের মধ্যে ৬০জনে কোরাম হওয়ার কথা। সেখানে কোরাম অভাবে বহু সময় বিনষ্ট হয়। এই অঘটন প্রতিটি নির্বাচিত সরকারের সময় ঘটেছে।

দল বেঁধে সংসদের পদ থেকে পদত্যাগ করা, সংসদে ঠিকমতো উপস্থিত না থাকা, কথায় কথায় সংসদ থেকে গাত্রোত্থান ও প্রস্থান, কালো পতাকা উড়িয়ে পাসকৃত আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং সংসদ সদস্যের দায়-দায়িত্ব ও দেয় সম্পর্কে গাফিলতি এবং আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসম্মানের এমন অভাব পরিলক্ষিত হয় যে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে যেকোনো আলোচনা বাজে মস্করা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাক-নির্বাচনী কর্মসূচির অঙ্গীকার অতি সহজে পরিত্যাগ করে থাকে এবং তার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে তেমন ধিক্কারও পায় না সেখানে আনুগত্যভঙ্গের প্রশ্ন তেমন মারাত্মক হয়ে দেখায় না।

"সংবিধান প্রজাতন্ত্রের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

সংবিধান ও আইন মান্য করা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যতম মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"২১(১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।"

উপরোক্ত কর্তব্য লঙ্ঘন করার জন্য সংবিধানে কোনো শাস্তির বিধান নেই। ওই কর্তব্য লঙ্ঘন করলে যদি দেশের কোনো আইন লঙ্ঘন করা হয় এবং সেই আইনে কোনো শাস্তির বিধান থাকলে সংবিধান লঙ্ঘন সেই মতো শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য বিচারপতি সকলেই শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, 'আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব।'

সংসদ সদস্য অনুরূপ শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন না বিধায় তিনি সদস্য সংবিধানের বিধানমতো সংবিধান সংশোধনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। শপথ ভঙ্গের জন্য দেশে এ-পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি এবং কোনো মামলায় সরাসরি সংবিধান ভঙ্গের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

আমেরিকার গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৩৫ সালে আলেক্সিস দ্য তোকভিল তাঁর *ডিমক্রাসি ইন অ্যামেরিকা* গ্রন্থে বলেন, 'অন্য জাতিগুলোর চেয়ে বেশি বিদগ্ধ হওয়ার মধ্যেই আমেরিকানদের বিরাট গুণ তা-ই নয় বরং নিজেদের ভুলগুলো শোধরানোর ক্ষমতাই তাদের আসল গুণ।' তিনি আরো বলেন, 'যখন গণতন্ত্র জ্ঞান ও সভ্যতায় এক অনুকূল পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কোনো কোনো জাতির প্রথম পাঠ এতই দূষিত এবং তাদের চরিত্রে

আবেগ, অজ্ঞতা ও সকল বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা এমন অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত যে, তারা তাদের নিজেদের দুর্গতির কারণ নিরূপণ করতে সক্ষম হয় না এবং এমন ব্যাধির শিকার হয়, যার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নাই।'

আমাদের অতীতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়কে 'রক্তের উত্তরাধিকার' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাংবিধানিকতাবাদ, সংসদীয় গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার এবং আইনের শাসন সম্পর্কে যেসব অঙ্গীকার করেছি আমরা সেসব মান্য করি না। অতি সামান্য কিছু আমূল পরিবর্তনবাদী ছাড়া নতুন করে সংবিধান প্রণয়নের মতো শ্রমসাধ্য দায়িত্ব নেওয়ারও কথা কেউ বলেন না।

সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলীকে কার্যকর করার জন্য একটা বিধান দেওয়া হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, জেনারেল, বিচারক যাঁরা সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতায় গিয়েছেন বা ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি, তাঁরা সবাই সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার নামে সংবিধান সংশোধন করেন। এই বিধানকে এলিভেটর সুটকেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অসাংবিধানিক মধ্যবর্তীকালের সব কর্মকাণ্ডকে বৈধ করে এক ধরনের দায়মুক্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

সামরিক শাসনের সঙ্গে সাংবিধানিক তত্ত্বের বাংলাদেশি মুনশিদের এ এক অনুপম মেলবন্ধন। এ নিন্দিত রাক্ষসবিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই ধরনের বিবাহে বর কন্যাকে অপহরণ করে বলপ্রয়োগে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করত।

যখন সংবিধানকে স্থগিত করা হয় বা বেআইনের অধীন করা হয় তখন আদালত প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে একজন বিচারকের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে – হয় পদত্যাগ করা নতুবা নিজের পদে জেঁকে বসে থাকা। যে বিচারক আইনের সমাবেশ ক্ষমতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেননি, তিনি কর্তব্যকর্ম ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাঁর কর্মের স্বাধীনতার সাময়িক বঞ্চনাকে মেনে নিতেও পারেন। বলাবাহুল্য, সংবিধান ছাড়া আদালতের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা থাকে না।

আমি অন্যত্র বলেছি, 'একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবিধান ধ্রুবতারার মতো। বাংলাদেশে আমাদের স্বভাবগুণে সেই ধ্রুবতারা সারাক্ষণ স্থান পরিবর্তন করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র, একদলীয় শাসন, সামরিক শাসন, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন – এরকম ভাঙাগড়ায় নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকায় সমাজ দিগভ্রান্ত। গুণধর রাজনীতিকরা দেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন এবং নিজেদের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলে খরচ হয়ে গেছেন। নক্ষত্রআইন লঙ্ঘন করে যদি ধ্রুবতারা তার উদয়, অবস্থান ও অবসানের অবস্থান নির্ধারণ করত তা হলে সারা বিশ্বে নাবিক-বণিক-বিজ্ঞানীদের কী দুরবস্থাই না হয়ে যেত।'

বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লিখিত সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সংবিধানের সূত্রপাতটা শুভলক্ষণ হিসেবে সমসাময়িকের চোখে বিবেচিত হয়নি। বেশির ভাগ প্রতিনিধির কাছে মনে হয়েছিল তাঁরা জোড়াতালি দিয়ে একটা মূল্যহীন সোলে দলিল তৈরি করেছেন। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন একে একটা দুর্বল এবং অসার কাঠামো বলে

বর্ণনা করেছিলেন। সংবিধানের সবচেয়ে বড় সমর্থকরা ভেবেছিলেন যে এটি দুর্বল রাষ্ট্র-সম্মিলনটিকে কয়েক বছর টিকিয়ে রাখতে পারলে পরে ভালো কিছু একটা করা যাবে। সংবিধানটি টিকে গেছে। জয়ের ক্ষয় নেই।

আমাদের সংবিধানের চৌদ্দটি সংশোধনী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো

১. প্রথম সংশোধন : ১৯৭৩ সালের সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইনে যুদ্ধাপরাধীসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বিধান রাখা হয়। সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধনের পরে একটি নতুন দফা এবং ৪৭ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। ৪৭ অনুচ্ছেদের (২) দফার সঙ্গে যে নতুন (৩) দফাটি সংযুক্ত হয়, তাতে বলা হয়, 'এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারীতে সেপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানে কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।' ৪৭ অনুচ্ছেদের পর সংযুক্ত ৪৭ক দফায় বলা হয় : (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪৭ অনুচেছদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না। (২) সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তির সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সংবিধানের অধীন কোনো প্রতিকারের জন্যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার অধিকার সেই ব্যক্তির থাকবে না।

. দ্বিতীয় সংশোধন : ১৯৭৩ সালের সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইনে বলা হয়; 'রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা ইহার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে। জরুরি অবস্থার ঘোষণা– পরবর্তী কোনো ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে; সংসদে উপস্থাপিত হইবে; একশত কুড়ি দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব- দ্বারা অনুমোদিত না হইলে উক্ত সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না; তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোনো ঘোষণা জারি করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপদফায় বর্ণিত একশত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।' এই সংশোধনে

সংবিধানের নবম ক ভাগ সংযোজন এবং ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

৩. তৃতীয় সংশোধন : ১৯৭৪ সালের সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইনে ভারত ও বাংলাদেশের স্থল-সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত ১৯৭৪ সালের দ্বিদেশীয় চুক্তি কার্যকর করবার উদ্দেশ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধান সংশোধন করে আইন প্রণীত হয়।

৪. চতুর্থ সংশোধন : ১৯৭৫ সালের (চতুর্থ সংশোধন) আইনের মাধ্যমে সরকার-পদ্ধতি, দলীয় ব্যবস্থা, নির্বাহী কর্তৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। দেশে সংসদীয় শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১ সালের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইনের দ্বারা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

৫. পঞ্চম সংশোধন : ১৯৭৯ সালের সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইনে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইনকে বৈধতা দান করা হয়।

৬. ষষ্ঠ সংশোধন : ১৯৮১ সালের সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন অনুযায়ী সংবিধানের ৫১ অনুচেছদের (৪) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৪) (৫) ও (৬) দফা প্রতিস্থাপন করা হয়; (৪) উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হলে, তিনি যে তারিখে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে তার পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। (৫) রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে, তিনি রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা পর্যন্ত অনুরূপ সংসদ-সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না। (৬) কোনো সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁর কার্যভারগ্রহণের দিনে সংসদে তাঁর আসন শূন্য বলে গণ্য হবে। ৬৬ অনুচ্ছেদের (২ক) দফায় 'কেবল প্রধানমন্ত্রী' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'কেবল রাষ্টপতি' উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়। পূর্বে সরকারের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকে কেউ রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না।

৭. সপ্তম সংশোধন : ১৯৮৬ সালের সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন অনুসারে ১৯৮২ সালের সামরিক শাসনকালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যে সব ফরমান, ফরমান-আদেশ, আদেশ, নির্দেশ, অধ্যাদেশ ও আইন জারি করেন সেগুলি সপ্তম সংশোধনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যেসব আদেশ, আইন ইত্যাদি জারি করেন সেগুলি বৈধভাবে প্রণীত হয়েছে বলে এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইবুন্যাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বলে ঘোষিত হয়।

৮. অষ্টম সংশোধন : ১৯৮৮ সালের সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে সংবিধানে তিনটি পরিবর্তন করা হয়। ১. সংবিধানে ২ অনুচ্ছেদের পরে ২ক

অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয় এবং বলা হয়; 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' ২. বাংলাদেশের মূল সংবিধানে ৩০ অনুচ্ছেদের তিনটি দফা বাদ দিয়ে একটিমাত্র অনুচ্ছেদ রাখা হয় এবং বলা হয়; 'রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।' ৩. সংবিধান ১০০ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়।

৯. নবম সংশোধন : ১৯৮৯ সালের সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশি বহাল থাকতে পারবেন না এবং প্রতি পাঁচ বৎসর পর রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০. দশম সংশোধন: ১৯৯০ সালের সংবিধান (দশম সংশোধন) আইনের দ্বারা ১২৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হবার আগে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের বাংলা ভাষ্য সংশোধন করা হয়। সংবিধানের বাংলা ভাষ্যে বলা ছিল রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে, তা পূরণের জন্য পদটি শূন্য হওয়ার ১৮০ দিন পূর্বে নির্বাচন করতে হবে। সংশোধন করে ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিধান করা হয়। দশম সংশোধনের দ্বারা ৬৫ অনুচ্ছেদে মহিলাদের জন্য সংসদে আরো ১০ বৎসরকাল ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

১১. একাদশ সংশোধন : ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের পর বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর অনুরোধে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে সম্মত হন, তবে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন শেষে স্বপদে ফিরে যেতে চান। ১৯৯১ সালের সংবিধান (একাংশ সংশোধন) আইনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান রাখা হয়।

১২. দ্বাদশ সংশোধন : ১৯৯১ সালের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইনবলে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধান রেখে সব নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদকে দেয়া হয়। মন্ত্রীপরিষদের নেতৃত্বে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য সংসদ সদস্যগণ কর্তক নির্বাচিত হবেন এবং কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি সময় এই পদে থাকতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্য সকল কাজ সম্পাদনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

১৩. ত্রয়োদশ সংশোধন : ১৯৯৬ সালের সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইনে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক ১০জন উপদেষ্টা নিয়ে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয়। এই সরকার যে—তারিখে প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করবেন তা হতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকবে। তত্ত্বধায়ক সরকার

প্রধানত নির্বাচন পরিচালনা এবং সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করবে, কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্রপতি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন। যদি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় বা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তাঁকে না পাওয়া গেলে আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপ্রতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলে সংবিধানের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

১৪. চতুর্দশ সংশোধন : ২০০৪ সালের সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইনে প্রধান যেসব সাংবিধানিক বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে, সেইগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহাহিসাব-নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং সাধারণ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের শপথপাঠ পরিচালনায় স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের অপারগতার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক শপথ পাঠ পরিচালনা। চতুর্দশ সংশোধনে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা-আসনসংখ্যা ৩০ হতে ৪৫ করা হয়। এর ফলে জাতীয় সংসদে আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৫। নতুন বিধান-অনুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে, চলতি সংসদ হতে সংরক্ষিত আসনসংখ্যা কার্যকর হবে এবং তা আগামী সংসদ হতে ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকিবে। সংশোধন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ হতে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়েছে। মহাহিসাব-নিরীক্ষকের অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর হতে বাড়িয়ে ৬৫ এবং সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর হতে ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ এবং বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান সরকার ২৬শে মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবেও উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যূষে দিবসটির সূচনা ঘোষণা করা হয়।

আমাদের জাতীয় পতাকা রং গাঢ় সবুজ এবং ১০:৬ অনুপাতে আয়তাকার এবং সবুজ অংশের মাঝখানে একটি লাল বৃত্ত। আমাদের জাতীয় ধর্ম ইসলাম। আমাদের জাতীয় পশু, পাখি, ফল ও ফুল যথাক্রমে বাঘ, দোয়েল, কাঁঠাল ও শাপলা।

সংবিধান পরিবর্তন

আমাদের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা কথাটি এমন সব অশ্রদ্ধেয় মুখে উচ্চারিত হয় যে এ সম্পর্কে কিছু বলতে আমার মন রাজি হয় না। সংবিধানে যা পরিবর্তন ঘটেছে তা বেশির ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আস্ফালন ও দাপটে, না হয় সামরিক শাসনকর্তার চোখ

রাঙানিতে। এই বিভক্ত-বিদ্বিষ্ট দেশ ১৯৯০ সালে ডিসেম্বরে ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। সেই বিরল মুহূর্তে নতুন করে সংবিধান সংশোধনের সোনালি সুযোগ ছিল। কিন্তু তা আমরা হেলায় হারিয়েছি। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অত্যুগ্র নেতাদের কাছে জোড়াতালি দেওয়া আশু প্রয়োজনীয় ছিল। ১৯৯৬ সালে এক প্রধান রাজনৈতিক দলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে প্রবিষ্ট করা হয় এবং এ জন্য আমাদের অনেকের মনে এক ধরনের অহঙ্কার ও আত্মপ্রসাদের আমেজ লক্ষ করা যায়। আমি নিজে মনে করি অবিশ্বাসের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের সংবিধান একসময় একটি আদর্শ কপিবুক সংবিধান হিসেবে বিবেচ্য হতো। নিন্দুকেরা বলতেন, টুকলিফাইং সংবিধান। আজকাল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল ও অন্যান্য দেশের সংবিধান আমলে নিয়েই টুকলিফাই করতে হয়। যারা তা সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। আমাদের একটি সংবিধান কমিশন থাকা প্রয়োজন, যা সময়ান্তরে সংবিধান রিভিউ করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ সুষ্ঠুতার প্রত্যয়নপত্র দিলেও, তার বিরুদ্ধে দেশে নানা প্রশ্ন করা হয়। যেহেতু প্রধান পরাজিত দলের শাসনকালে তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রপতি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারগণ এবং অন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁদের আপত্তি তেমন জোর পায়নি।

২০০৬ সালে অষ্টম সংসদের মেয়াদ শেষে নির্বাচন পরিচালনার ভার বিচারপতি কে এম হাসান নেওয়ার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি বিএনপির রাজনৈতিক দলের একসময় সদস্য ছিলেন এবং সেই দলে আন্তর্জাতিক সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সব অতীতের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়, যখন ২০০৪ সালে বিচারপতিদের চাকরির বয়ঃসীমা দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। তখন আওয়ামী লীগ থেকে আপত্তি করা হয় যে ওই বয়ঃসীমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান।

বিচারপতি কে এম হাসান সম্পর্কে আওয়ামী লীগ থেকে আরও অভিযোগ করা হয় যে বঙ্গবন্ধু হত্যার দু'জন আসামি-কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। দুই প্রধান দলের মধ্যে এ সম্পর্কে ব্যর্থ সংলাপের কারণে রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষে কিছু প্রাণহানি ঘটে। ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ বিচারপতি কে এম হাসান স্ব-উদ্যোগে ঘোষণা দেন যে তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে চান না। এরপর অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাড়াহুড়ো করে বাদ দিয়ে ২৯শে অক্টোবর ২০০৬ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের সব বিকল্প শেষ না করেই রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে একাধিক রিট আবেদন করা হয়। চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করায় সংকট আরও ঘনীভূত হয়। দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল যখন কোনো ঐক্যমতে পৌঁছাতে

পারল না, অরাজকতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল তখন অবশেষে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করে জাতির উদ্দেশে বলেন, 'গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করেছি। আমাদের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমাদৃত হয়নি।...৯০ দিন সময়সীমার মধ্যে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।' দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেওয়া হয়। পরের দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। আমরা জানি না, কোন দেশি বন্ধু বা বিদেশি মিত্রের তদারকিতে এই নতুন আয়োজন শুরু হয়। দেশের লোক নৈরাজ্য ও অরাজকতায় তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল বড় একটা ঝড়ঝাপটা আসবে। সুতরাং এই পরিবর্তনকে দেশের মানুষ মোটামুটিভাবে স্বাগত জানিয়েছে। এই সরকারের কাজকর্ম সম্পূর্ণ হয়নি। প্রতিশ্রুত কাজ সম্পন্ন হলে তার মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। এখন আংশিকভাবে মূল্যায়ন করতে গেলে সরকার চালানোর পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির তালিকাভুক্ত করব। প্রথম কাজ যেটা ভালো হয়েছে সেটা হলো চট্টগ্রাম বন্দর অনেকখানি খোলাসা হয়েছে এবং রাজনীতিকেরা, বিশেষ করে সংসদ সদস্যরা যে ধরনের দুর্নীতির ভেতরে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, সেখানে তাঁরা এখন কিছুটা ভয় পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও আমার মনে হয় এই ভয়টা কাজ করবে।

রাজনৈতিক দলগুলো যথাশিগগির নির্বাচন চাইলেও সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনী আইন সংস্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয় বলে একাধিকবার উল্লেখ করে এবং জাতিকে আশ্বস্ত করে যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নবম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সংবিধান ব্যবস্থা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা এবং দেশ কী কী সাংবিধানিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

২০০৫ সালের ২৯শে আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর এক রায়ে ঘোষণা দেন যে, মোশতাক, সায়েম ও জিয়ার ক্ষমতা দখল ১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ছিল। এক্ষণে ওই রায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

রাজনীতি

সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত যে, অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কার্য করেন এবং কোনো রাজনৈতিক মতপ্রচারে বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসংঘ হতে পৃথক কোনো অধিসংঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন। ৭০ অনুচ্ছেদ-অনুসারে, ১. কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো সংসদ-সদস্য, যে-দল তাঁকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করে–(ক) সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা (খ) সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা হলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলে গণ্য হইবে। (২) যদি কোনো সময়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠে তা হলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবিদার কোনো সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি-অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ-সদস্যের সভা আহ্বান করে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোনো সদস্য অমান্য করেন তা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে গণ্য হবে এবং সংসদে তাঁর আসন শূন্য হাইবে। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তা হলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হবে।

রাজনৈতিক দলের ভেতরে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের জন্য কিছু বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এতে কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তনকালে এর ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক. সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ. রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, ঘ. কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।

১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ দ্বারা ওই অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয় এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন দ্বারা তা সমর্থিত হয়। সংবিধান প্রবর্তনকালে ৩৮ অনুচ্ছেদে যে সংগঠনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়, সে–সম্পর্কে একটি শর্ত ছিল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য-সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করার বা তার সদস্য হওয়ার বা অন্য কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশ নেওয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না। ওই শর্ত ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রের আদেশ দ্বারা বিলুপ্ত হয় এবং তা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন দ্বারা সমর্থিত হয়। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারায় বিধান রয়েছে যে '১. কোনো ব্যক্তিই রাজনৈর্তিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে গঠিত কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করতে বা এর সদস্য হতে বা অন্যভাবে এর তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ২. যে-ক্ষেত্রে সরকার সন্তুষ্ট হয় যে, ১ উপধারার বিধান লংঘন করে সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে, বা সংঘ বা ইউনিয়ন কাজ চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনার পর সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারেন যে, তেমন সংঘ বা ইউনিয়ন ১ উপধারার বিধান লংঘন করে গঠন করা হয়েছে বা বিধান লংঘন করে চালানো হচ্ছে এবং এই ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙে গেছে বলে গণ্য হবে এবং এর সমস্ত সম্পত্তি ও তহবিল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। ৩. উপধারা ২ অনুসারে একটি সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি সেই সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেন বা তেমন সংঘ বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন বা অন্য কোনোভাবে কাজে অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

১৯ ধারায় ধ্বংসাত্মক সংঘগুলোর নিয়ন্ত্রণে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তার ৯ উপধারায় বলা হয়েছে, 'এই ধারায় বর্ণিত সংঘ ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দলকে অন্ত র্ভুক্ত করবে।' উপরিউক্ত বিধান লঙ্ঘনের জন্য এ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি, সংঘ বা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল একমাত্র সংস্থা, যার কোনো নিবন্ধন করতে হয় না। বর্তমান নির্বাচন কমিশন নিবন্ধনের সুপারিশ করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয় সম্পর্কে লোকজনের কোনো ধারণা নেই। রাজনৈতিক নেতারা ঘন ঘন বিদেশ সফর করেন, ওমরাহ্-হজ পালন করেন। সে ব্যয় কোথা থেকে আসে, মাঝে-মধ্যে লোকে প্রশ্ন করে।

১৪ই নভেম্বর ২০০৩ সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী দেশে সংকটকালে নতুন দল গঠন করার কথা বলে প্রস্তাব দেন, সংবিধানে দু'জন উপ-রাষ্ট্রপতি ও তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ৩০ থেকে ৪০ জনের মধ্যে মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রীদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রধানমন্ত্রী ২০ ভাগ সংসদীয় দল মনোনীত দল থেকে সদস্য হবেন। সংসদের ২০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন ও ১০০ আসনের ভোটের আনুপাতিক হারে

৮—

রাজনৈতিক দল থেকে সদস্য হবেন। এতে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, ড. কামাল হোসেন এবং তাঁদের মতো ব্যক্তিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমপি হতে হবে না। নির্বাচনের দুই বছর পর সংসদ-সদস্যরা এলাকায় ভোটারদের ম্যান্ডেট নিয়ে দল পরিবর্তন করতে পারবেন।

উত্তরাঞ্চল সফরে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন—'প্রধানমন্ত্রী মঙ্গাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে না এসে সৌদি আরবে ইবাদত করতে গেছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে বড় ইবাদত আর কী হতে পারে।'

১৬ই নভেম্বর ২০০৩ এক বিএনপি সমর্থক মন্তব্য করেন—'পবিত্র ওমরাহ পালন সম্পর্কে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা কেবল প্রধানমন্ত্রীর প্রতিই ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি, এই পবিত্র রমজান মাসে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর মতো তিলকধারী বহুরূপী নেত্রীর পক্ষেই পবিত্র ওমরাহ পালন সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা সম্ভব।'

২৪শে মে ২০০৫ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়ের উৎস ও ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগ এক নির্দেশ দেন। ২৯ মে ২০০৫ এই নির্দেশ সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদের উদ্যোগে একতরফা শুনানিতে আপিল বিভাগ স্থগিত করেন। পরে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন।

২৫শে মে ২০০৫ আদালত চত্বরে আন্দোলনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদের মুখে কালো কাপড় বেঁধে আইনজীবীরা প্রতিবাদ করেন এবং সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন, আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হবে।

পাঁচ দিন চিকিৎসার পর অগ্নিদগ্ধ অটো রিকশাচালক আমির হোসেনের (৪০) মৃত্যু হলে শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার পরিকল্পিতভাবে সিএনজিচালককে হত্যা করেছে।'

দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি মাসে একবার স্থায়ী কমিটির সভা হওয়ার কথা থাকলেও গত তিন বছরে বিএনপির একটিও সভা হয়নি।

হিউম্যান রাইটস ককাসের শুনানিতে কংগ্রেস সদস্য জোসেফ ক্রাউলি বলেন, 'বড় দুটি রাজনৈতিক সংগঠন—আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের জন্য দায়ী।'

১৪ই জুলাই ২০০৫ শেখ হাসিনার উদ্দেশে মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, 'গোঁফ আছে দাড়ি নেই মার্কা ওলামা-মাশায়েখদের কাছ থেকে ফুলের মালা নিয়ে ইসলামি জনতার কাছ থেকে ভোট নেওয়া যাবে না।'

২২শে আগস্ট ২০০৬ আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে সুবিধাবাদিতা যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান তা আরও একবার প্রমাণিত হয়। এরশাদকে জোটে নেওয়া প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির সভায় বিএনপির দলীয়প্রধান দল বলেন, 'আগামী নির্বাচনে হেরে গেলে কোনো নীতি কাজে লাগবে না।'

২৬শে আগস্ট ২০০৬ বিএনপির এক উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু দলনেত্রীর সমর্থনে দলের নির্বাহী কমিটির সভায় বলেন, 'দেশের প্রয়োজনে এখন চার

দলে এরশাদকে দরকার, এটা বাস্তবতা। কে স্বৈরাচার, কে রাজাকার দেখে লাভ নেই।'

২৩শে ডিসেম্বর ২০০৬ আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের মধ্যে এক নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় : ১. পবিত্র কোরান-সুন্নাহ ও শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। ২. কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। ৩. নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে: ক. হজরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। খ. সনদপ্রাপ্ত হক্কানি আলেমেরা ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদবিহীন কোনো ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবেন না। গ. নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।'

২৪শে ডিসেম্বর ২০০৬ : ফতোয়া চুক্তিকে অস্বীকার করে আবদুল জলিল বলেন, 'এটা মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং।' শেখ হাসিনা বলেন, 'ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে দেব না।'

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এমন এক মিত্র লাভ করেছে যে এরপর তার কোনো শত্রুর দরকার হবে না।'

সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার ধারকেরা আত্মসমর্পণ করেছে।'

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও সুশীল সমাজের পক্ষে যাঁরা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি তাঁদেরকে বলেন, 'এ সমঝোতা স্মারকে সই করে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসেনি। আমরা নির্বিচারে ফতোয়াবাজি বন্ধ করতে চাই। এ কারণেই খেলাফত মজলিসের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছে। সমঝোতার ফলে মহাজোট লাভবান হয়েছে। আজ শায়খুল হাদিসের মতো মানুষও বলছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাই নির্বাচনী কৌশল হিসেবে এ চুক্তি করা হয়েছে।' শেখ হাসিনা চুক্তি বাতিলের আশ্বাস দেননি।

২৭শে ডিসেম্বর ২০০৬ এরশাদের পাঁচটি মনোনয়নপত্রই বাতিল হলে রংপুরে বিক্ষোভ-ভাঙচুর হয়। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এরশাদের কিছু হলে সারা বাংলায় আগুন জ্বলবে।' কয়েক দিন পর বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'এরশাদ সাহেবের মামলার রায় আমরা দিইনি। এতে আমাদের কোনো হাত নেই। এ নিয়ে আবার অবরোধের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করা হলে জনগণ এবার আর আপনাদের ক্ষমা করবে না।'

পরে ৪ঠা জানুয়ারি ২০০৭ সালে খালেদা জিয়া বলেন, '২২ জানুয়ারি নির্বাচন হতে হবে। এরশাদের স্থান জেলে।' তখন অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছিল মহাজোট এরশাদের জন্যই নির্বাচন বর্জন করেছে।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবারতন্ত্রের সেবা করে। নবম সংসদের জানুয়ারির পরিত্যক্ত নির্বাচনে বিএনপি-প্রধান খালেদা জিয়া নিজে পাঁচটি আসনে এবং তাঁর ছেলে, ভাই ও বোনপো আরও তিনটি আসনে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা নিজে চার আসনে, চাচাতো ও ফুপাতো ভাই এবং মেয়ের শ্বশুর এবং ফুপাতো ভাইয়ের ছেলে আরও চার আসনে এবং জাতীয় পার্টি প্রধান এরশাদ নিজে

পাঁচ আসনে, স্ত্রী দুই আসনে এবং ভাই এক আসনে মনোনয়ন পান। প্রধান দুটি দলে সন্ত্রাসী, গডফাদার, ঋণখেলাপি ও জঙ্গিরাও স্থান পায়।

৩০শে ডিসেম্বর ২০০৬ ইরাকে ঈদের দিনে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর হলে বাংলাদেশে সরকার ও দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। সাধারণভাবে বাম দল ও ইসলামপন্থি দলরা বিক্ষোভ করে।

দেশে রাজনীতিক দলগুলোর প্রত্যেকটির অনানুষ্ঠানিকভাবে যে অঙ্গ দল ছিল তা জিয়াউর রহমানের এক আদেশ বলে আনুষ্ঠানিক রূপ নেয়। সাইফুর রহমান বলেন, 'নির্বাচনে ছাত্রদলকে প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।'

প্রথম আলোর এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'রাঘব বোয়াল ঋণখেলাপি প্রার্থী, বাংলাদেশ ব্যাংক ও নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা।...রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর ঋণখেলাপিদের যেভাবে ছলচাতুরির মাধ্যমে প্রার্থীযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা নিন্দনীয়।...মোসাদ্দেক আলী ফালু নামের একজন বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কেবল বানান বিচ্যুতির আড়ালে পার করিয়ে দেওয়ার কাহিনী প্রচারের রুচিবোধ যে কী করে জাগ্রত হলো – তা আমাদের বোধগম্য নয়।'

৩০শে ডিসেম্বর ২০০৬ জামায়াতে ইসলামীর আমির নিজামী বলেন, 'ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের জন্য আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার স্বাক্ষর রেখেছে বারবার। নির্বাচনের স্লোগানে পরিবর্তন এনে, বিশেষ পোশাক পরিধান করে; ইসলামের লেবাসধারী দু-চারজনকে নিজেদের সঙ্গে এনে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে।'

নিজামী বলেন, 'আওয়ামী লীগ খেলাফত মজলিসের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তা দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের এক কূটচাল আর কিছুই নয়। চুক্তির ফলে দেশের আলেমসমাজ শঙ্কিত।'

০৯ই মে ২০০৭ *প্রথম আলোর* মতবিনিময় সভায় ড. কামাল হোসেন বলেন, 'আমি মাইনাস টু বুঝি না। আমাদের রাজনীতি হবে প্লাস ১৪ কোটি। শহীদ নূর হোসেনকেও মনে রাখব আবার এরশাদকে পাশে নিয়ে লাফালাফি করব, এটা অসম্ভব। ভোটের জন্য মাওলানা হাবিবুর রহমানকে মনোনয়ন দেব, মুফতি শহীদুলের সঙ্গে চুক্তি করব, এটা মানা যায় না।'

চাতুর্যের সঙ্গে যে রাজনৈতিক দরকষাকষি হয়ে থাকে তাকে ইংরেজিতে হর্স-ট্রেডিং বলে। আর্দ্র জলবায়ু শুকনো আবহাওয়ার ঘোড়ার জন্য মোটেই আরামদায়ক নয়। তাই বাংলাদেশে হর্স-ট্রেডিংয়ের পরিবর্তে খচ্চর নিয়ে যে অহরহ টানাটানি হয় তার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

রাজনীতি এমন একটা পেশা বা নেশা যখন মাথা ঠিক রেখে কথা বলা যায় না। সাধারণ মানুষ কিন্তু নেতাদের বেসামাল কথা মনে রাখে। আটজন সংসদ-সদস্যকে খতম করার জন্য অনেকে সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকলেও পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয় এমন বক্তব্য নিয়ে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সংসদে যখন শেখ মুজিব বলেন, 'সেই সিরাজ শিকদার কোথায়?' তখন সে কথা সাধারণ লোকে পছন্দ করেনি। পছন্দ করেনি লোকে যখন শেখ হাসিনা এক 'অখ্যাত মেজর' বলে জিয়াউর রহমানকে উল্লেখ করেন

অথবা যখন তিনি বলেন, 'এতিম ও বিধবার ভাতা খেয়ে যারা মানুষ তারা এখন সবচেয়ে ধনাঢ্য' অথবা যখন তিনি বলেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁদের সঙ্গে ডার্টি রোল প্লে করেছেন।'

২৯শে জুলাই ১৯৯৮ পল্টনের জনসভায় খালেদা জিয়া বলেন, 'আগামী দিনেও '৭৫-এর মতো অবস্থা হবে। '৭৫-এ যেমন কেউ চোখের পানি ফেলেনি, ইনালিল্লাহ পড়েনি, জনগণ বলেছিল নাজাত পেয়েছি, আবারও তাই হবে। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ পাবনার জনসভায় তিনি বলেন, 'তাদের সবাইকে '৭১-এর মতো ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' তার উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, 'তাঁর স্বামীও তো ভারতে গিয়েছিলেন। তিনি যাননি। জিয়া যখন তাঁকে নিতে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, জিয়াকে পাকিস্তনে যেতে বলো, আমি পাকিস্তান যাচ্ছি।'

৩রা মে ১৯৯৯ জামাতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযম বলেন, '১৫ই আগস্টের পরিবর্তনে জনগণ কাঁদেনি বরং হেসেছিল। আবার এমন ঘটনা ঘটলে জনগণ খুশি হবে।' ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের কখনই স্বাভাবিক পতন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর পিতারও অস্বাভাবিক পতন হয়েছে। তাঁরও একই অবস্থা হবে।'

অপরপক্ষের প্রতি এরূপ বিষবাক্যবাণের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দেশে বিদ্যমান অস্থির পরিস্থিতিতে এসব কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

সংসদীয় রাজনীতি

নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামীয় দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে। পাকিস্তানের দিশেহারা সামরিক হোতারা নির্বাচনের রায় গ্রহণ করে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে পারল না। পাকিস্তান ভেঙে গেল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুরে যে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলো সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে প্রেসিডেন্ট করা হলো। দশ মাসের উপর পাকিস্তানে কারাবন্দি থেকে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব দেশে ফিরলেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং যে-কোনো আইন বা সংবিধানের যে-কোনো বিধানের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। বিরোধী সংসদ-সদস্যের সংখ্যা অতি নগণ্য থাকায় সরকারি দল সহজেই সংবিধানের চারটি সংশোধনী পাস করে। চতুর্থ সংশোধনীর বলে সংসদীয় প্রথা বিলোপ করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ফলে দেশে এক শূন্যতা বিরাজ করে। নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়। দারুণ এক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। প্রায় দেড় দশক পরে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বলে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হয়।

১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬-এর জুন ও ২০০১ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচিত হয়। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকলেও সেই নির্বাচিত ষষ্ঠ সংসদ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে দেশে অচলাবস্থা দূর করে। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী গত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে দুটি নির্বাচনের তদারকি করেন।

১৭ই জানুয়ারি ২০০১ আওয়ামী লীগের উপনেতা আবদুল হামিদ সাংবাদিকদেরকে বলেন, 'আওয়ামী লীগ '৭৩, বিএনপি '৭৯-এ এবং এরশাদের জাতীয় পার্টি '৮৮—তে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছিল, কিন্তু তাদের সরকার কতদিন স্থায়ী হয়েছিল? সুতরাং জোট সরকারের বাক-বাকুম করার কোনো কারণ নেই। তাঁর মতে, 'দুই নেত্রীর সুসম্পর্ক না হলে গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে।'

২০০১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ইউএনডিপি ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে আহূত 'একুশ শতকে বাংলাদেশ সংসদ' শীর্ষক সম্মেলনে স্বল্পসংখ্যক এমপি

উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিনিধি বলেন, গত তিন বছরে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ৯০ বার বসে এবং তদন্তের ফলে সরকারি পরিসম্পদে দু'বিলিয়ন টাকা উদ্ধার হয়।

২৩শে জুন ২০০১ নীলফামারীর এক জনসমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন, 'এবার নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।' পরের দিন সুনামগঞ্জের এক জনসভায় শেখ হাসিনা উত্তরে বলেন, 'খালেদা জিয়া নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে চেয়েছে। আর আমি ধানের শীষ কেটে নৌকায় ভরে কৃষকের গোলায় পৌছে দিতে চাই।'

২৯শে জুন ২০০২ সংসদে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রধান বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। কেউ পার পাবে না। বিরোধীদলের সদস্যরা কেবল সদস্যপদ রক্ষার্থে সংসদে যোগ দিয়ে অযৌক্তিক ছুতা তুলে সংসদ বর্জন করছে।'

২৮শে জুন ২০০৫ বাজেট বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশীদের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা চায় বিরোধী দল। বিরোধী দলের নেতা দেশের বাইরে আর বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদের বাইরে।'

আওয়ামী লীগের দাবির ওপর প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'দুঃখজনক ও নজিরবিহীন। জাতীয় সংসদের রীতিনীতি এবং সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত বিরোধীদলের ভূমিকা পালন না করে তারা ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ১৩ দফা না মানলে হরতাল'। সংসদে আওয়ামী লীগ কালো পতাকার মিছিল করে বিক্ষোভ জানায়।

সংসদের এক দিনের হিসেব দেওয়া যাক। পয়লা অক্টোবর ২০০৬ নির্ধারিত সময় সাড়ে দশটায় ১০জন এমপি ছিলেন। বিশ মিনিট পরে স্পিকার যখন অধিবেশন কক্ষে ঢুকলেন তখন ৪০জন এমপি ছিলেন। কোরান তেলাওয়াতের পর কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় ৬০জন সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে স্পিকারকে ঠায় ৪ মিনিট বসে থাকতে হয়।

সমাপনী অধিবেশনে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দু'জনই ভাষণ দেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকালে বিরোধীদলীয় নেত্রী অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। আবার বিরোধী দলের নেত্রীর ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী এক ঘণ্টা ১৩ মিনিট বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী ৫৫ মিনিটের ভাষণ দেন। সংসদ ছিল প্রাণবন্ত।

অষ্টম সংসদে ঘটেছে অনেক নজিরবিহীন ঘটনা। বিরোধী দল এই সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে একবারের জন্যও অংশ নেয়নি। সর্বোচ্চসংখ্যক আইন প্রণয়নের রেকর্ড গড়লেও এই সংসদে একটি আইন পাসের ক্ষেত্রেও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সম্মতি জানায়নি। আবার একটি বিলের ক্ষেত্রেও সরকারপক্ষ বিরোধী দলের কোনো সদস্যের দেওয়া পরামর্শ গ্রহণ করে বিল সংশোধন করেনি। বিরোধী দলের দাবি উপেক্ষা করে পৌনে দুই বছর পর ২০০৩ সালের জুলাই মাসে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। একটি কমিটিতেও বিরোধীদলের কোনো সদস্যকে চেয়ারম্যানের পদ দেয়া হয়নি।

মন্ত্রী-এমপিরা প্রতিশ্রুতি দেন এক হাজার ২০০টি। এর মধ্যে ৬০ ভাগও বাস্তবায়িত হয়নি। ২৩টি অধিবেশনে বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোট ৩৫টি প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬টি বাস্তবায়িত হয়। প্রতিশ্রুতি কমিটির হিসাব মতে, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ৬০ ভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।

অষ্টম সংসদের মোট ৩৭৩টি কার্যদিবসের মধ্যে ২৯৭ কার্যদিবসই শুরু হয় কোরাম সংকটের মধ্য দিয়ে। শেষ অধিবেশনটি ছাড়া কোরাম সংকটের কারণে প্রায় প্রতিদিনই গড়ে ২০ মিনিট দেরি করে অধিবেশন শুরু হয়। কখনো কখনো কোরাম না থাকায় নির্ধারিত কাজ ফেলে রেখেই অধিবেশন মুলতবি করার ঘটনা ঘটেছে। ৪৫জন মহিলা এমপি নির্বাচনের পরও সংসদে ৬০জনের কোরাম পূরণে স্পিকারকে প্রতিদিন তটস্থ থাকতে হয়।

ওয়াক আউট আপত্তি জ্ঞাপন বা বিরোধিতা প্রকাশের একটা ক্ষণকালীন ব্যবস্থা। এখন অনেক সময় তা লাগাতার হয়ে দেখা যাচ্ছে। বিরোধী দল ওয়াক আউট করে সরকারকে যে ওয়াক ওভার দিচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সরকারকে মোকাবিলা করার জন্য যেখানে বিরোধী দলকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কথা, সেখানে সংসদ বর্জন করে অতি সহজেই সংসদ সদস্যরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

১৩ই এপ্রিল ১৯৯৮ 'পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি মানি না'–সংসদে এই শ্লোগান দিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্যরা দু'মিনিটের জন্য ওয়াক আউট করেন। ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৮ বিএনপি ও সাত দল আহূত দেশব্যাপী হরতালে ঢাকা, খুলনা ও সুনামগঞ্জে তিনজন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদে সংসদে তুলকালাম সৃষ্টি হয়। স্পিকারের প্রতি ফাইল নিক্ষেপ করা হয় ও টিভি-ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়। বিএনপির বক্তব্য ছিল, 'আমরা স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম।' পরের দিন ফ্লোর না দেওয়ার প্রতিবাদে স্পিকার ও সরকারি দলের দিকে পেছন ফিরে বিএনপি সংসদ-সদস্যগণ এক অভিনব প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন এবং দু'দফা ওয়াক আউট করেন।

১৫ই এপ্রিল ১৯৯৮ সংসদে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ১২ই মে ১৯৯৮ স্পিকার ১৪জন সংসদ সদস্যকে সতর্ক করে দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'যেহেতু আমাদের দেশে এখন সংসদীয় কৃষ্টি সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাপথ এখনো সুগম হয়নি, সেহেতু চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে বিশৃঙ্খল আচরণে জড়িত সংসদ সদস্যগণের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।' স্পিকারের সহনশীলতার প্রশংসা করতে হবে।

২২শে জুন ১৯৯৯ স্পিকারের সম্মতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর আপত্তির কারণে বিএনপির উপনেতা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিয়ে কোনো বক্তব্য দিতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি, বাজেট আলোচনায় ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

২৫শে জুলাই ২০০৭ দৈনিক *সমকালকে* স্পিকার জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, 'দলীয় স্পিকার নিরপেক্ষভাবে সংসদ চালাতে পারেন না। তিনি বলেন, 'সংসদ নেতার

প্রভাবের কারণে বিগত ৫ বছর তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অনেক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে পারেননি।'

২০শে জুন ২০০৫ সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করে সাংসদরা বলেন, 'আমরা যখন সংসদে বাজেটের ওপর বক্তৃতা করি তখন অর্থমন্ত্রীকে দেখা যায় না।'

৯ই অক্টোবর ২০০১ বিএনপি-জামায়াত ইসলাম জোটের ১৯৭ এমপি শপথগ্রহণ করেন, আওয়ামী লীগ সদস্যরা সেদিন শপথ নেননি। সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, 'কারচুপির নির্বাচন মেনে নেওয়ার কথা আমি দেইনি, যেখানে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছে সংসদে গেলাম কি না গেলাম তাতে কিছু যায় আসে না।' সংসদে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা একাধিক বক্তব্য রাখেন।

১০ই অক্টোবর ২০০১ খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন। ২৮ মন্ত্রী, ২৮ প্রতিমন্ত্রী, ৪ উপমন্ত্রী মোট ৬০ জনের বিশাল মন্ত্রিসভার যাথার্থ্য বোঝা মুশকিল ছিল। মন্ত্রিসভায় জামায়াতের নিজামী ও মুজাহিদ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাম ১১ দলের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির দরবার হল ত্যাগ করেন। 'মন্ত্রিসভায় রাজাকার দেশব্যাপী হুঁশিয়ার' – এই শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বেরিয়ে আসেন।

২৪শে অক্টোবর ২০০১ আওয়ামী লীগ এমপিরা শপথ নেন। শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি বলেন, 'জনগণকে সম্পৃক্ত করে পুনর্নির্বাচনের দাবির আন্দোলনকে অসহযোগে নিয়ে যাবো।' ৩রা নভেম্বর ২০০১ স্পিকার বলেন, 'বিরোধী দলকে সংসদে আনয়নের বিষয়টি রাজনৈতিক। আপাতত আমার উদ্যোগ নেওয়া ঠিক হবে না।'

৪ঠা নভেম্বর ২০০১ সংসদে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'প্রধান বিরোধী দল অভিযোগ করছে, নীল নকশার নির্বাচন হয়েছে। আর সে নীল নকশা নাকি রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অনশনের হুমকির মুখে সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এত যত্ন করে যাঁকে রাষ্ট্রপতি বানানো হলো, নির্বাচনের পরদিন থেকে তিনি বেঈমান, মোনাফেক হয়ে গেলেন।...নীল নকশা হলে তা পাঁচ বছর আগে নির্বাচনের সময়ই হয়েছে। তাঁদের আশা ছিল, রাষ্ট্রপতি তাঁদের পক্ষে কাজ করবেন। নীল নকশা নিয়ে যে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তা নিয়ে সংসদে দুই ঘণ্টা সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।' তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে সরকারি দলের সংসদ-সদস্যগণ বারবার করতালি দেয়।

শিক্ষামন্ত্রী ভুল করে 'সাংসদ' বলেছিলেন। তা মুছে ফেলে সংসদ-সদস্য লেখার জন্য স্পিকার তাঁর রুলিং দেন। সংসদ-সদস্যকে উল্লেখ করতে 'সাংসদ' শব্দটা আর ব্যবহার করা যাবে না।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০২ এক আলোচনা সভায় মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'আওয়ামী লীগ নিজেরা পদক নিয়েছে অথচ মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার পদক দেয়নি।' অন্য এক আলোচনা সভায় আব্দুল জলিল বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একজন সেক্টর প্রধানকে পদক দিয়ে সরকার স্বাধীনতাকে অপমানিত করেছে।'

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৩ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান সমগ্র জাতির সম্পদ।' শেখ হাসিনা আপত্তি করে অন্যত্র বলেন, 'জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর সমান্তরাল করার চেষ্টা হচ্ছে।'

বিএনপির সদস্য মশিউর রহমান এক পয়েন্ট অফ অর্ডারে ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ সংসদে বলেন, 'দিনমজুর নই যে হাজিরা খাতায় সই করে টাকা নিতে হবে। হাজিরা খাতায় সই না করেই ভাতা তোলার বিধান চাই।'

১০ই জুলাই ২০০২ এক বেসরকারি বিল সংসদ সদস্যদের গাড়ির পতাকা, গাড়ির ফেরি ভাড়া এবং সবরকম টোল মওকুফ, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের মতো প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার ক্ষমতা, স্ব স্ব এলাকায় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করার অধিকার এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ ছাড়া কোনো মামলায় সংসদ শুরু ও শেষ হওয়ার আগে পরে সাত দিনের মধ্যে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা যাবে না। স্পিকার বা কোনো সংসদ সদস্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। বারো ভুঁইয়ার দেশে প্রত্যেক সংসদ সদস্য সামন্ত যুগের ভুঁইয়াদের মতো বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতা চান যার মহিমা ও দাপট হবে নিরঙ্কুশ।

যেকোনো দেশের পার্লামেন্ট ধ্বনি-নির্ঘোষের জন্য এক প্রশস্ত প্রসিনিয়াম। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পরিষদ সদস্য শাহেদ আলী আহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এ রকম প্রাণাত্মক ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন পার্লামেন্টে বিরল ঘটনা, ঘটেনি যে এমন নয়। সাধারণত মুখ থাকতে হাতের ব্যবহার করতে চান না সম্মান্য সদস্যবৃন্দ।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গোড়া থেকেই সমর্থক ও বিরোধীর চেয়ে স্তাবক ও নিন্দুকের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। ৩০শে মে ২০০০ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন সম্পর্কে বলেন, 'বাজেটে আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোটেশন শুনব। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির আলোচনাও তুলে ধরা হবে প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশনা করে। প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কৃতিত্ব প্রদান করা হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের তিনটি বাজেটের কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করেননি। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে সমস্ত কৃতিত্ব সংবদ্ধভাবে মন্ত্রিসভার।'

আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর হাবভাব রাষ্ট্রপতির মতো। আমাদের দেশের সরকারি সংসদ সদস্যরা বাজেট অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। কীভাবে প্রাণভরে সংসদ নেতার প্রশংসা করতে পারেন। মনে হয় পৃথিবীর সবকিছু সংসদ নেতার বদান্যতায় চলছে। আর কী মসৃণভাবেই না চলছে। আর বিরোধী দলের কাছে মনে হয় সরকার সব আজাব-অপকর্মের জন্য দায়ী। একদিকে সরকার প্রধানের প্রতি জয়োধ্বনি এবং অন্যদিকে বিরোধী দলের লাগাতার দুয়োধ্বনি। আমাদের সংসদে দুই প্রধান দল মুখিয়ে থাকে কার ওপর কখন কারা দুয়োধ্বনি চাপিয়ে দেবে।

২০০১ সালের অক্টোবরে সপ্তম সংসদের 'নির্বাচনের সময় জোটের নির্বাচনে তারেক রহমান যে ভূমিকা রাখেন রাষ্ট্রপতির ভাষণে তার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল।'—সংসদ সদস্য মশিউর রহমানের ওই বক্তব্যে টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান সংসদ নেত্রী ও বিএনপির এমপিরা।

১৭ই মে ২০০৪ আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ 'বাংলাদেশের অহংকার বেগম খালেদা জিয়া' শীর্ষক প্রকাশনা উৎসবে বলেন, 'রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার আবির্ভাব এক অসম্ভব ব্যাপার।'

কয়েকদিন পর জিয়াউর রহমানের মৃত্যু দিবসে চট্টগ্রামে ৩০শে মে ২০০৪ যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলেন, 'ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারেক জিয়া দেশের উন্নয়নে জিয়ার মতোই অবদান রাখবেন এবং আগামী ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকবেন।'

শেখ হাসিনাকে ভাষাকন্যা হিসেবে অভিহিত করেন কিছু কিছু সাহিত্যিক। ২৭শে এপ্রিল ২০০১ পল্টন ময়দানে কৃষক লীগ কর্তৃক শেখ হাসিনাকে কৃষকরত্ন উপাধি প্রদান করা হয়। প্রায় এক মাস পরে ১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দু'দশক উপলক্ষে পল্টনের এক ছাত্র সমাবেশে তাঁকে দেশরত্ন উপাধি প্রদান করা হয়।

সংসদে গিয়ে বিরোধী দলের নেত্রী এবং সংসদ-সদস্যরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেননি এবং তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরেননি। তাঁদের কথা, 'তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না।' এ কথায় সত্য থাকলেও বিরোধী দলের এটা বড় ত্রুটি যে তাঁরা তাঁদের কথা শোনাতে পারেননি।

যত দিন না আমরা অপর পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং তা গ্রহণ করি বা না-করি, সৎভাবে বিবেচনা করতে শিখব, তত দিন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে সংসদে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিলে বিরোধীদলীয় নেতা বা নেত্রী অনুপস্থিত থাকেন এবং বিরোধীদলীয় নেতা বা নেত্রী তাঁর বক্তব্য পেশ করলে প্রধানমন্ত্রী অন্তর্ধান করেন সেখানে গণতন্ত্র আসবে না। সেখানে সংসদের ভেতর কোরামহীন ধু ধু মরুভূমি এবং সংসদের বাইরে লাগাতার ধর্মঘটীদের হাতে ভগ্ন যানবাহন এবং পেটের দায়ে যে রিকশাওয়ালা রাস্তায় বেরিয়েছিল, তার দগ্ধ কালো কঙ্কাল দেখা যাবে।

কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান ২০০২ এক প্রকাশনা উৎসবে বলেন, 'শেখ হাসিনা দেশি ও বিদেশি চক্রের দ্বারা পরিচালিত। তিনি সংসদে যেতে রাজি হতে পারেন না। দলের সব এমপি একমত হয়ে সংসদে যেতে চাইলেও হাসিনা রাজি হবেন না। দেশের সম্পদ কোথায় যাচ্ছে সে প্রশ্ন তুলতে হলে সংসদে যেতে হবে। সংসদে গেলে দায়িত্ব নিতে হয়। দুই প্রধান দলের কেউ দায়িত্ব নেবে না। এক দল যখন ক্ষমতায় থাকে অন্যদল তখন বাইরে থাকবে এটাই তারা নিয়ম করে নিয়েছে।'

নির্বাহী বিভাগ

১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে নির্বাহী বিভাগ হচ্ছে সংসদীয় নির্বাহী বিভাগ। সংবিধানের চতুর্থ ভাগে স্থান রয়েছে রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, তাঁর পদের মেয়াদ, রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়সহ নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে আলোচনা। নির্বাহী বিভাগ ছিল দুটি অংশে বিভক্ত—পরোক্ষভাবে নির্বাচিত একজন আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান এবং ক্ষমতাবান ও নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিপরিষদসহ যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ।

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন ও নিয়োগকে সহজ করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য নিয়োগ লাভ করবেন। প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর এবং তাকে সহায়তা করত মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রেত সময়কালের জন্য নিজ নিজ পদে বহাল থাকতেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করার ক্ষমতাও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ওপর নির্ভর করত। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিপরিষদসহ ছিলেন প্রকৃত নির্বাহী এবং যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী। পরবর্তীকালে নিরাপত্তামূলক আটকাদেশ, জরুরি ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেগুলোর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ সংসদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারত।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। একটি একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যেখানে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্রপতি ৫ বছর মেয়াদকালের জন্য আইনসভার কাছে আর দায়বদ্ধ ছিলেন না। একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সব নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হয়, যা তিনি সরাসরি প্রয়োগ করবেন। তাকে সহায়তা ও পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়, যার সব সদস্যকে রাষ্ট্রপতি তাঁর ইচ্ছানুসারে নিয়োগ দান করবেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সব সভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সময়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদ দায়িত্বে বহাল থাকত। সংবিধানে একটি নতুন ৬-ক ভাগ যোগ করা হয়। সংবিধানের ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের অধিকার প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি আদেশবলে এ রকম একটি জাতীয় দল গঠন করলেই অন্য সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটত। জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যক্রম, সদস্যপদ, সংগঠন, শৃঙ্খল, অর্থসংস্থান ও কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে নির্ধারিত

হতো। চতুর্থ সংশোধনী মোতাবেক প্রবর্তিত নির্বাহী ব্যবস্থা প্রকৃত রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি পর্যবেক্ষণের কোনো অধিকার সংসদের ছিল না। রাষ্ট্রপতির পদ-কে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা হয় এবং তাঁর নির্বাহী ক্ষমতার ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণও রাখা হয়নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অধীনে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাহী ব্যবস্থা আবারো পরিবর্তিত হয়। ১৯৭৬ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনসহ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কতিপয় পরিবর্তন সাধন করেন।

১৯৭৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ঘোষিত ৪ নং আদেশ, যা পঞ্চদশ সংশোধনী নামে খ্যাত, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটায়। নির্বাহী কর্তৃত্ব তখনো' ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে, যিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন, যদিও রাষ্ট্রপতি পদে একজন কয়বার নির্বাচিত হতে পারবেন তা নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান নির্বাহী এবং সংসদ অধিবেশনে ভাষণের মাধ্যমে সংসদের অধিবেশনের উদ্বোধক এবং তা ভেঙে দেওয়ার অধিকারী। সংবিধানে ৯২ (ক) অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী হন, যার মাধ্যমে তিনি সংসদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

সংবিধানে ১৪২(১) (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে গণভোট প্রক্রিয়া চালু করা হয়, যা নির্বাহীকে সাংবিধানিক সংকটে সংসদ উপেক্ষা করে সরাসরি ভোটদাতাদের কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি প্রণীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিগুলো অনুমোদনের জন্য তাঁকে সেগুলো সংসদে পেশ করতে হতো। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষমতা অনেকটা সংযত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি একবার নির্বাচিত হলে পুরো মেয়াদ নির্বিঘ্নে স্বপদে বহাল থাকতে পারতেন। নিবর্তনমূলক আটকাদেশ, জরুরি ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো বিশেষ সাংবিধানিক যে ব্যবস্থাগুলো দ্বারা নির্বাহী একনায়কের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সেগুলো সবই বহাল থাকে।

চতুর্থ সংশোধনীর অধীন ৫৮ অনুচ্ছেদকে আরো সংশোধন করা হয়, যেমন ১. রাষ্ট্রপতিকে কার্য পরিচালনায় সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত একটি মন্ত্রি পরিষদ থাকবে; ২. রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদ বা কোনো মন্ত্রী কোনো পরামর্শ দিয়েছেন কি-না বা কী পরামর্শ দিয়েছেন সে প্রশ্ন কোনো আদালতে তোলা যাবে না; ৩. রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে একজন সংসদ সদস্যের আস্থাভাজন বলে প্রতীয়মান হবেন; ৪. রাষ্ট্রপতি সংসদের সদস্য অথবা সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ দেবেন; ৫. মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির অভিপ্রেত সময়কালের জন্য নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন, ৬. রাষ্ট্রপতি নিজে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতিত্ব করার নির্দেশ দিতে পারবেন।

পঞ্চম সংশোধনীর অধীনে নির্বাহী বিভাগ ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত একটি ব্যবস্থা। যাতে ব্যবস্থাটি আরো বেশি পরিমাণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার মতো দেখায়

সেজন্য গণতন্ত্রীকরণের জন্য জেনারেল এরশাদ সংবিধানে নবম সংশোধনী আনেন। রাষ্ট্রপতি পদের অনির্দিষ্ট মেয়াদকে নির্দিষ্ট দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ করার জন্য ৫২ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। অন্যদিকে ৪৯ অনুচ্ছেদের সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির সহযোগী হিসেবে সরাসরি উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান চালু করা হয়। একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন আইনসভার অবর্তমানে এখানে নির্বাহী কর্তৃত্বের ওপর কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। নতুন ধারা ৭২ (ক) সংযোজন সংসদের ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারটিকে স্পষ্টতর করে তোলে।

দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণের ফলে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধৃত সংসদীয় ব্যবস্থার সব বৈশিষ্ট্যই ফিরে আসে। প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্যকে নিশ্চিত করার জন্য নতুন কিছু ব্যবস্থা সংবিধানভুক্ত হয়। সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা আরো সীমিত করার জন্য ৭০ অনুচ্ছেদে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়। এ ব্যবস্থা এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অভাব প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকে কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাহী ক্ষমতা অত্যধিক মাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য নিয়োগ লাভ করবেন। প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর এবং তাকে সহায়তা করত মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রেত সময়কালের জন্য নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করার ক্ষমতাও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ওপর নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিপরিষদসহ ছিলেন প্রকৃত নির্বাহী এবং যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী। নিরাপত্তামূলক আটকাদেশ, জরুরি ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেগুলোর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ সংসদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারত।

প্রশাসন

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পাকিস্তান সরকার এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার তেমন কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান একটি প্রাদেশিক প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সরকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। সরকার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেস্টোরেশন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন পর্যায়ে বেসামরিক প্রশাসনের পুনর্গঠন এবং পাকিস্তানের সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আত্তীকরণের বিষয় পরীক্ষা করে সে সম্পর্কে পরামর্শ দান করা। ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক সচিবালয়কে জাতীয় সচিবালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এতে ২০টি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অধিদফতর বা বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রাখা হয়।

১৯৭২ সালে সরকার প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি এবং ন্যাশনাল পে কমিশন গঠন করে স্থানীয় সরকারসহ কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিবর্তন এবং একটি জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যমান বহুধাবিভক্ত প্রশাসনিক কাঠামো বাদ দিয়ে কমিটি একটি একক শ্রেণীবিহীন গ্রেড কাঠামোর আওতায় সব সরকারি চাকরিকে ১০টি গ্রেডে বিন্যাস করার সুপারিশ করে। আশা করা হয় এর ফলে যে কোনো স্তরে কর্মরত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য দ্রুত ও সহজে ওপরে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে, জাতীয় সদর দফতর থেকে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সিনিয়র কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং একই সঙ্গে জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। কমিটি ব্যাপকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে ক্ষমতা প্রত্যর্পণসহ জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়ার সুপারিশ করে। বলা হয়, স্থানীয় সংস্থাগুলোর ওপর দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে কোনো অপরিবর্তনীয় কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত হবে না। কমিটি আরো অভিমত প্রকাশ করে যে, থানাই হবে প্রশাসনের মূল ইউনিট। মহকুমাগুলোকে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়। এই সুপারিশমালা ওই সময়ে সরকারের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। সরকার তা শ্রেণীভুক্ত দলিল হিসেবে তাকে তুলে রাখে।

প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ বাংলাদেশ সরকার প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি গঠন করে। এ কমিটির কাজ ছিল : ক. টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল উভয় ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন চাকরি কাঠামো বিবেচনা করে সরকারের চাহিদা ও কার্যোপযোগী ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণ; খ. বিদ্যমান বেসামরিক সব চাকরিকে (প্রতিরক্ষা চাকরি ব্যতিরেকে) অভিন্ন চাকরি কাঠামোর আওতায় আনার প্রশ্নটি বিবেচনা করা; গ. সমন্বিত চাকরি কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কোন নীতির ভিত্তিতে একীভূত করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান; পুনর্গঠন বা সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্যেষ্ঠতা কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, সে ব্যাপারে সমন্বয়ের নীতি ও উপায় নির্ধারণ; ঘ. শিক্ষাগত ও অপরাপর যোগ্যতার আলোকে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে ভবিষ্যতে নিয়োগের নীতিনির্ধারণ করা এবং ঙ. প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যাপকভিত্তিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুপারিশ করা।

১৯৭৩ সালে পেশকৃত রিপোর্টের প্রথম অংশে ছিল সরকারি চাকরি পুনর্গঠনের প্রস্তাবনা এবং দ্বিতীয় অংশে ছিল সচিবালয় পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি, মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় সংস্থা এবং জেলা ও স্থানীয় প্রশাসন পুনর্গঠন সম্পর্কিত সুপারিশ।

অনেক বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক পরামর্শ প্রক্রিয়া কার্যবিধিতে দেওয়া থাকে, যাতে মন্ত্রিসভা বা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন। বিশেষায়িত বিষয় প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক কেবিনেট কমিটি রয়েছে, যার মাধ্যমে সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়। অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প ও ইস্যু প্রসঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ

এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি রয়েছে। এ দুটি কমিটির প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

কার্যপরিচালনা বিধির ১ নম্বর তফসিলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য আলাদাভাবে কর্মবণ্টন স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ মতামতের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যদি তা না হয় তবে কেবিনেটই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাঠ প্রশাসনে সমন্বয় সাধন জেলা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনার এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্বে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক জেলায় ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে জেলা পর্যায়ে কোনো নির্বাচিত কাউন্সিল না থাকায় ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমেই এখনো সমন্বয় সাধনের কাজটি সম্পন্ন হয়।

প্রশাসনিক আইনের আওতায় চার ধরনের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো থাকে। আইন কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট আইনের লক্ষ্য সাধনের জন্য যে বিধি-বিধান প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়, তাতে প্রণীত বিধান অবশ্যই ওই মূল আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বিধিবদ্ধ সংস্থার আইন-কানুন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবসার জন্য যে লাইসেন্স প্রদান করা হয় তা ইস্যু, নবায়ন বা বাতিল করার জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ আইনের তৃতীয় নিয়ন্ত্রণ কাঠামোটি তদন্ত মূলক। আইনের আওতায় সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোনো ঘটনার তদন্ত বা অনুসন্ধান চালানো হয়ে থাকে।

ন্যাশনাল পে কমিশন অভিমত দেয় যে, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য (১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল) নয় সারির প্রশাসনিক কাঠামোর অনুরূপ বেতন স্কেল বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে। কিন্তু কমিশনের এ অভিমত গৃহীত হয়নি।

১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল, পূর্বতন সব চাকরি এবং পরবর্তী কালের সরকারি সেক্টরসহ সব বেসামরিক চাকরি একীভূত করা, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধানীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ, প্রাথমিক পর্যায়ে সমান বেতন স্কেল এবং ন্যায়সঙ্গত সুযোগ প্রদান করে প্রশাসনিক পদোন্নতির ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চাকরির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের অবসান। সিভিল সার্ভিস ২৮টি ক্যাডার সৃষ্টি হয়, সিনিয়র সার্ভিসেস পুল গঠিত হয় এবং প্রবর্তন করা হয় নতুন জাতীয় গ্রেড ও বেতন স্কেল। এক দশকেরও বেশি শীর্ষ অবস্থানগুলোতে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারায় এ ব্যবস্থা ১৯৮৯ সালে বিলোপ করা হয়।

১৯৭৭ সালে সার্ভিসেস (গ্রেড, পে অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার নামে একটি আদেশ জারি করে অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি খাতের চাকরিজীবীদের জন্য ২১টি গ্রেডে বেতন স্কেল প্রবর্তন করে। কতিপয় কর্মকর্তার অসন্তোষ নিরসনের জন্য সরকার ষষ্ঠ ও সপ্তম গ্রেডকে একীভূত করে এবং তাদের বেতন উন্নীত করা হয়।

জিয়াউর রহমান গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সাংগঠনিক সমস্যা এবং জনগণের নির্লিপ্ততার ফলে ব্যবস্থাটি ব্যর্থ প্রমাণিত হলে ১৯৮২ সালে তা বিলুপ্ত হয়।

সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিধান অনুযায়ী। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট ১৯৮০ পাস হয়। প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তির চাকরির শর্ত সম্পর্কিত বিষয়ে বিচারের জন্য ১৯৮১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন কার্যকর হয়। এক সদস্যবিশিষ্ট এই ট্রাইব্যুনালের সদস্য সরকার কর্তৃক জেলা জজদের মধ্য থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে।

প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির চাকরির শর্তাবলি পেনশনের অধিকার সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ এবং প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত যে কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁর আবেদনও ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করতে পারে। প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তি অর্থ যিনি চাকরিতে কর্মরত রয়েছেন বা অবসর নিয়েছেন অথবা অন্য কোনোভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদচ্যুত হয়েছেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরিতে কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হবেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বা বিচারক হওয়ার যোগ্য অথবা প্রজাতন্ত্রে কর্মরত এমন একজন কর্মকর্তা, যাঁর পদমর্যাদা সরকারের অতিরিক্ত সচিবের নিচে নয়। অপর দু'জন সদস্যের মধ্যে একজন হবেন এমন ব্যক্তি, যিনি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত এবং যাঁর পদমর্যাদা যুগ্ম সচিবের নিচে নয়। আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮৩ সালের ২২শে আগস্ট।

প্রশাসনিক আইনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের আইন দ্বারা আমলাতন্ত্র, তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট একেকটি মন্ত্রণালয় থেকে এসব আইন-কানুন কার্যকর হয়। আবার বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকেও এ আইন কার্যকর হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আইনগুলো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন— প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকরির শর্ত সম্পর্কিত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করে; কর নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল করদাতাদের অভিযোগ ও আপত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তি করে; সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। অপর একটি উদাহরণ হচ্ছে ট্যাক্সেস সেটেলমেন্ট কমিশন।

১৯৭৫ সালের কার্যবিধি (১৯৯৬ সালে সংশোধিত) এবং ১৯৭৬ সালের সচিবালয় নির্দেশাবলি অনুসারে প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় নির্বাহীদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াদি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ নিয়ন্ত্রক ভূমিকাটি সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থার (কর্পোরেশন) ক্ষেত্রে সেখানে কর্মরত সদস্য বা পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নন এমন কর্মকর্তা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। অন্যদিকে অধিদফতর বা অধীনস্থ দফতরে এ ক্ষমতা প্রয়োগের আওতা পঞ্চম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্পিত এ প্রশাসনিক ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নামে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিষয়সূচি অনুসরণেই প্রয়োগ করা হয়।

নিম্নতর পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা, অধিদফতর বা অধীনস্থ দফতরগুলো তাদের প্রয়োজনমাফিক নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিধিবদ্ধ সংস্থার সদস্য বা পরিচালক পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। অনুরূপভাবে সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্যাডার সার্ভিস কর্মকর্তাদের প্রাথমিক নিয়োগদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন বাছাই বোর্ড তাদের মতামত সুপারিশ পেশ করে। পেশকৃত সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লাভের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করে। উল্লিখিত পদমর্যাদার নিম্নতর পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিজস্ব বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ কমিটির প্রধান থাকেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব। কমিটিতে অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এবং সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের প্রধানরাও বিভাগীয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে উপসচিব পদে পদোন্নতিদানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে আলাদা একটি কমিটি উপসচিব পদে পদোন্নতি সংক্রান্ত চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করে থাকে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্বভার লাঘব করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ২ নম্বর বিধিতে কর্তৃত্ব অর্পণ সংক্রান্ত ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। অর্পিত এ ক্ষমতাবলে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব কিংবা ভারপ্রাপ্ত সচিব নির্দিষ্ট একটি বেতনক্রমের নিম্নতর পদের কর্মকর্তাদের ওপর কোনো কোনো ধরনের শাস্তি আরোপ করতে পারেন। সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯-তে সচিব বা ভারপ্রাপ্ত সচিবদের ওপর অনুরূপ কর্তৃত্ব অর্পণের বিধান রাখা হয়।

সচিবালয় নির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, একজন অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম সচিবের কর্মপরিধিও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। মন্ত্রীর কাছ থেকে ফেরত আসার সময় নথিগুলো মন্ত্রণালয়ের সচিবের হাত ঘুরে আসবে, যাতে সচিবও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রীর নেওয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন।

নীতি-সংক্রান্ত নয় এমন অথবা স্থায়ী আদেশবলে তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে এমন যে কোনো নথির কাজই একজন উপসচিব নিষ্পন্ন করার ক্ষমতা রাখেন। অনুরূপভাবে একজন সহকারী সচিবও প্রতিষ্ঠিত নজিরবলে অথবা স্থায়ী আদেশ কিংবা অন্য কোনো বিধানবলে তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে এমন সব বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তবে নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমাণ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব এখতিয়ার নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তিনি তাঁর অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাইতে পারেন।

ঠিকাদারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংগ্রহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এতদসংক্রান্ত কর্তৃত্ব সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পণ করা হয়।

বিধিবদ্ধ সংস্থার ক্রয়ক্ষমতা ১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমিত এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর ক্রয়ক্ষমতা ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত। ক্রয়ের অঙ্ক ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে গেলে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির মাধ্যমে তা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। সরকারি কাজে পরামর্শক সংস্থা নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত কাজের চুক্তির অনুমোদন দিতে পারে। এ কাজে টাকার অঙ্ক পাঁচ কোটির বেশি হলে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটি তা বিবেচনা ও সুপারিশ করবে এবং এতে প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে।

১৯৮২ সালের ২৮শে এপ্রিলে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটি নানা সুপারিশ করে। সামরিক সরকার সব সুপারিশ গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করেনি। যেসব ক্ষেত্রে সংস্কার সাধিত হয়েছিল তা হচ্ছে : ক. থানা প্রশাসনকে উন্নয়ন ও তদারকি প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উন্নীত করা; খ. প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহকুমা বিলুপ্তি; গ. পুরনো মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা ছাড়াও কিছু নতুন জেলা সৃষ্টি; ঘ. একটি থানার উন্নয়ন প্রশাসন (পরবর্তী সময়ে উপজেলা) একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের ওপর ন্যস্ত করা।

প্রশাসনিক সংস্কারে দুটি বড় ধরনের কমিটি গঠিত হয় : মার্শাল ল' কমিটি এবং প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি। মার্শাল ল' কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং এর অধীনে বিভিন্ন বিভাগ ও দফতরগুলোর গঠন কাঠামো পরীক্ষা করে দেখা এবং বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করা। এ কমিটি সচিবালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত করার ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংখ্যা এবং বেসামরিক কর্মচারী বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করা; সচিবালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো; সচিবালয় ও অন্য নির্বাহী সংস্থাগুলোর কাজ ঢেলে সাজানো; নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর বিধিবিধানুগ ও নিয়মিতকরণ। জাতীয় সচিবালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো ব্যতীত কমিটি প্রদত্ত অপর সুপারিশ সামরিক সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি যথোপযুক্ত, সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ প্রণয়নের। কমিটির পেশকৃত সুপারিশে বলা হয়, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত একজন প্রধান নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং একটি প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান থাকবেন মূল সমন্বয়কারী এবং তাঁর অধীনে পর্যাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবেন, প্রত্যেকটি পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে সংশ্লিষ্ট স্তরের সব কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও কর্মচারীদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বিচার বিভাগীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে, প্রশাসনিক স্তর হিসেবে মহকুমা ও বিভাগকে বাতিল করা হবে, নিম্নস্তরের পরিষদের

নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে নিকটতম উচ্চতর স্তরের পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং উপজেলা পর্যায় থেকেই উন্নয়নের ভৌত কাঠামো সৃষ্টি হবে। এই কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণের জন্য। ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম/রিঅর্গানাইজেশন গঠিত হয়। ওই কমিটির সুপারিশের ফলস্বরূপ স্থানীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় উপজেলা প্রশাসন।

ভোটারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত হতো। উপজেলার আওতাধীন সব পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করত উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় সরকারের ইতিহাসে নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে এই প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় আমলাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করেন। এ সময় জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল : গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউএনডিপি কর্তৃক প্রণীত পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফিসিয়েন্সি স্টাডি, চারজন সচিব কর্তৃক প্রণীত টুয়্যার্ডস বেটার গভর্নমেন্ট এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস। এসব রিপোর্টের কোনো সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ এসে দেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করে। স্বাধীনতার পর বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কিছুটা সংস্কার হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্বাধীন দেশ অর্জনের পর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ হারায়। প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের দু'বছরের অতিরিক্ত সিনিয়রিটি দিয়ে আমরা এক দারুণ তছনছ ব্যবস্থার সৃষ্টি করি। প্রশাসনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিষ্ক্রিয় ওএসডি (এক সমকালীন পূর্ণ উচ্চারণ ওই শালা দালাল) কর্মকর্তারা অযথা সরকারের প্রশাসন ব্যয় বৃদ্ধি করে। ২৬শে জুলাই ২০০৩ সালে প্রথম আলোর এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশাসনে ৩৫৫জন কর্মকর্তা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগের ফলে দশ কোটি টাকা অপচয় হয়। ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ ঐসব কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৬৫৮। ১৫ই আগস্ট ২০০৭ প্রশাসনে ঐসব কর্মকর্তা সবচেয়ে কম ছিল ৫৮জন।

দেশের কর্মবিভাগের জন্য সংবিধানের নবম ভাগে যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার প্রতি আমরা দারুণ অবহেলা করেছি। প্রশাসনে যে দলীয়করণ হয়েছে তাতে দক্ষতার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মারফত সরকারি কর্মচারীদের শুধু আজ্ঞাবহ দাসেই রূপান্তরিত করা হয়। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে পদোন্নতি ইত্যাদির ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রশাসনের একজনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে অধঃস্তন পাঁচজনের পদোন্নতি বিপর্যস্ত হয়। এ সত্ত্বেও এক প্রধানমন্ত্রী প্রায় গায়ের জোরেই বলেন, 'যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে।'

কর্মবিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততি, নারী, উপজাতি ও জেলাভিত্তিক কোটা পদ্ধতি নিঃসন্দেহে মেধা নীতির পরিপন্থি। প্রশাসনের শতকরা ৫৫ ভাগ এ ধরনের নিয়োগ জাতি কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা ভেবে দেখা দরকার। যা ব্যতিক্রমী ও সাময়িক হওয়া উচিত তা নিত্যকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইন-আদালত

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বাংলাদেশের মাটিতে কতবার উচ্চারিত হয়েছে এবং বাংলা ভাষায় কতবার তা লিখিত হয়েছে তার শুমার করতে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক। আইনের শাসন সম্পর্কে মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে তাকে স্বায়ত্ত স্বাতন্ত্র্য দেওয়া দরকার। ১৯৫৪ সালের ২১ দফার ১৫ দফায় ছিল এ সম্পর্কে একটি অঙ্গীকার। ওই অঙ্গীকার বহুবার ব্যক্ত ও পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৫৭ সালের ৩৬ নং আইনটি পাস করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত দুই পঙক্তির একটি নোটিফিকেশন দিয়ে আইনটি জারি করার তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। পাকিস্তানের ল' কমিশন (১৯৬৯-৭০) এবং বাংলাদেশের ল' কমিটি (১৯৭৬) উক্ত আইনটি অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করে। এ-পর্যন্ত কোনো সরকার সেই আইনটি কার্যকর করেনি। সেই আইনটির গুরুত্ব সম্পর্কে ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদের দ্বিধাহীন থাকা উচিত ছিল। গণপরিষদ বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ২২ অনুচ্ছেদ সংবলিত করে।

সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'

এ সম্পর্কে ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূল সূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।'

১৯৭৫ সালে ২৫শে জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর বলে বিচারকদের অপসারণ প্রধান নির্বাহীর ইচ্ছাধীন করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান এবং অধস্তন আদালতসমূহের ওপর সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়ে সে ক্ষমতা সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

আইনের শাসক সম্পর্কে যে গড়িমসির ঐতিহ্য জন্মকালে শুরু হয় তা এখনও বিরাজ করছে। অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট স্বউদ্যোগে মাসদার হোসেনের মামলায় ১৯৯৯ সালের নভেম্বর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি ১২ দফা বাস্তবায়নের সময়সীমা বেঁধে দেন।

যখন সরকারের পরামর্শে আদালত অবমাননাকারী আমলাকে মার্জনা করা হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে শাস্তি বাড়ানো হবে না কেন রুল ইস্যু করে এবং সেই ব্যাপারটির শুনানির আগেই দণ্ডপ্রাপ্তকে সব অভিযোগ থেকে

মার্জনা করা হয় এবং যখন মাদক পাচার অপরাধে দণ্ডিত শক্তিধর রাষ্ট্রের নাগরিককে তড়িঘড়ি অশোভন দ্রুততায় মার্জনা করা হয় তখন সাধারণ মানুষের মনে আইনের প্রতি ভক্তি বা সংবিধানের প্রতি আনুগত্যবোধ শিথিল হতে বাধ্য।

৩০শে জুলাই ১৯৯২ সালের কুদরত-ই-ইলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ ৪৪ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ মামলায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ বলেন, 'সংবিধানের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ৯নং অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫৯নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশিগগিরই নিতে হবে। তবে কোনো অবস্থায়ই যেন এ সময় এখন থেকে ৬ মাসের অধিক না হয়।' এ নির্দেশ সরকার এখনো পালন করেনি।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নিজস্ব আর্থিক ও ক্ষমতার সাশ্রয় পর্যাপ্ত নয় বলেই সংবিধানের ১১২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা করিবেন।'

গত ছত্রিশ বছরে এই অনুচ্ছেদের প্রতি একাধিকবার বড় অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। গত ২৯শে জানুয়ারি ভারত থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাকি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গত ২৬শে ও ২৭শে আগস্ট হাইকোর্ট ১২ শ' জনকে জামিন দিয়েছেন। এটা কিভাবে হলো এবং কেন? এটা কি যুক্তিসঙ্গত? এটা প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হয়। কিন্তু তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। যদিও সে বেঞ্চের পরিবর্তন করা হয়। যদি প্রধান বিচারপতি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেন এবং ব্যবস্থা নিতেন তাহলে বিচার ব্যবস্থা অনেক দায়িত্বহীন কাজ থেকে মুক্ত হতে পারত এবং মানুষের মনে বিচার বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নেরও নিরসন ঘটত।'

আদালত অবমাননার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেন, 'শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে একটি উচ্চতর আদালত সম্পর্কে কোনো তথ্য বা সংখ্যা প্রকাশে প্রধানমন্ত্রীর আরো সতর্ক ও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।'

বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলার আপিলে হাইকোর্টের কেউ কেউ বিচারক বিব্রত বোধ করলে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ লাঠি মিছিল করেন এবং বিব্রতবোধকারী বিচারকের প্রত্যাহার করার জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চান। বার কাউন্সিলের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বিচার বিভাগকে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। খুনের বিচার বিলম্বিত হলে খুন তো হবে।'

বিব্রত বিচারকদের সম্পর্কে বক্তব্য ও লাঠি মিছিলের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বনমন্ত্রীসহ দুই প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতার বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মতিঝিল থানায় অভিযোগ করা হয়।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, 'বিচারকদের বিরুদ্ধে মিছিল করে তারা লাঠিয়াল সরকার হয়েছে।' ২৬শে মে ২০০০ জামায়াতে ইসলামীর এক আলোচনা সভায় গোলাম আযম বলেন, 'বিচারপতিরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লাঠি দেখানোয় আপত্তি জানাননি।'

১৭ই জুলাই ১৯৯৯ দৈনিক সংবাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে বিচারাধীন মামলা পাঁচ লক্ষাধিক, বিচারক মাত্র ৬০০ জন। দুই লাখ মানুষের জন্য একজন বিচারক, আট শতাধিক মামলা প্রতি বিচারকের কাঁধে। ১৯শে জানুয়ারি ২০০০ সাবেক আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, 'আমরা যদি এ মুহূর্তে ধারণাতীত সৎ এবং দক্ষ হয়ে উঠি, ব্যবহার করি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি; তারপরও বিদ্যমান মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে আমাদের অন্তত ৫০ বছর লাগবে।'

১১ই মে ২০০০ হরতাল আহ্বান ও সংগঠনকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক দাবি জানিয়ে দায়ের করা রিট আবেদনের শুনানির সময় না দেওয়া হলে শুনানিতে অংশ নেবেন না এবং আদালতের অবস্থা বিরোধী দলহীন সংসদের মতো হবে বলে কৌসুলি মওদুদ আহমদ নিবেদন করলে বিচারপতি মইনুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'আদালত ও সংসদকে এক করে দেখবেন না।'

২৪শে জুলাই ২০০০ বিবিসিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দুর্নীতিবাজই হোক আর আসামিই হোক, তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে কোর্ট। যখনই যাচ্ছে তারা, জামিন পেয়ে যাচ্ছে আর ফিরে এসেই হত্যাকাণ্ড। আমি তো মনে করি, যে উকিল জামিন চাচ্ছে তাকেও ধরা উচিত এবং কোন কোর্ট জামিন দিচ্ছে তারও জবাবদিহি করা উচিত।' কয়েক দিন পর তিনি বলেন, 'খুনের আসামির বন্ডদাতারও শাস্তি দেওয়া উচিত।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসামি সুব্রত বাইন ওরফে শুভ্রর নাম করেন এবং ওই আসামির জামিন বাতিল আবেদনের শুনানির দিনে সরকারপক্ষ প্রস্তুত নয় বলে সময় প্রার্থনা করলে হাইকোর্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত আদালত অবমাননার তিনটি মামলা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হয়। আদালত ও বিচারক সম্পর্কে মন্তব্যকালে প্রধানমন্ত্রীকে আরও সতর্ক এবং শ্রদ্ধাশীল থাকতে আহ্বান করা হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'যেহেতু রুল জারি করা হয় নাই সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আদালত অবমাননা হয়নি বলা যেতে পারে।'

৯ই নভেম্বর ২০০০ সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বর্তমান সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সবচেয়ে স্বাধীনতা ভোগ করছে। বিচার বিভাগ এত স্বাধীনতা ভোগ করছে যে আমিও রেহাই পাচ্ছি না।'

জাতীয় সংগীতের প্যারোডি প্রকাশ করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপিত হলে দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদককে জামিন দেওয়ার জন্য রাতে আদালত বসে তার প্রতি ইঙ্গিত করে ১৮ই ডিসেম্বর ২০০৩ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজাদ বলেন, 'রাতে আদালতে বসে যদি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামিকে জামিন দেওয়া হয়, তাহলে ছুটির সময় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শেষ হবে না কেন?'

একজন বিদেশি পর্যবেক্ষক, জেমস নোভাক তাঁর *বাংলাদেশ: রিফ্লেকশন্স অন ওয়াটার* (১৯৯৩)-এ বলেন, 'আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হয়। এ জাতীয় আস্থার পিছনে একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে যা এদেশের গঠন প্রকৃতি অনেকটাই উদ্ভাসিত করে। বিফলতা সত্ত্বেও

এশিয়ার যেকোনো জায়গার চেয়ে এখানে মানুষ আদালতের ওপর বেশি আস্থাশীল, কেননা এখানে একটা ন্যায়বিচারের চেতনা বিদ্যমান রয়েছে।'

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ শুধুমাত্র শতকরা ২০ ভাগ হয়েছে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ এখনও কাজ করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে কি ধরনের নিয়োগ হয় তা আমরা গত ১০ বছরে দেখেছি।

সুপ্রিম কোর্টের কাজের পরিধি অনেক বেড়েছে। এজন্য নতুন কিছু পদে নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে। যিনি ভালো বিচার করতে দক্ষহস্ত তিনি ভালো প্রশাসক নাও হতে পারেন। ব্যবস্থাপনা, জনসংযোগ ও গবেষণায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের সহায়তা নিতে কোনো বাধা নেই। সংসদ নির্বাচনের মামলা সংসদের মেয়াদকালে নিষ্পত্তি যে হলো না, সেই কলঙ্কের ভার দিন নেওয়া ও দিন খাওয়া বিজ্ঞ আইনজীবীদের যেমন তেমনি দিন দেওয়া বিজ্ঞ আদালতকেও বহন করতে হবে। দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা কোনো মতে ফেলে রাখা যায় না। নিষ্পত্তির জন্য মামলা বুঝে একাধিক ট্র্যাকের বিধান দিতে হবে। ফাস্ট ট্র্যাকে থাকবে জনগুরুত্ব মামলা, প্রজাতন্ত্রের আয়কর ও শুল্ক বিষয়ক মামলা এবং আর সব মামলা যা প্রধান বিচারপতির আদেশে ফাস্ট ট্র্যাকে সন্নিবেশিত হবে।

স্থানীয় সরকার

একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করে না। নানা বিষয়ে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। এক অঞ্চল তুলনামূলকভাবে অগ্রসর, আরেক অঞ্চল অনগ্রসর হতে পারে। অবস্থার পার্থক্য বিবেচনা করে এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের হাতে না রেখে স্থানীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গলজনক। স্থানীয় সরকার পরিচালনায় নির্বাচিত ব্যক্তিরা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ঠেকে শেখেন এবং মিলেমিশে কাজ করার সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে পরিচিত হন। স্থানীয় সরকারের সূতিকাগারেই সুস্থ ও সবল জাতীয় সরকারের উন্মেষ ঘটার কথা।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।'

এ ধরনের উৎসাহ দানের বিধান মূল সংবিধানে ছিল না। সেখানে চতুর্থ ভাগের 'নির্বাহী বিভাগ'–এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সম্পর্কে পাকাপোক্ত দুটি বিধান ছিল:

'৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোনো আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

ক. প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

খ. জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

গ. জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন।

৬০। এই সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলিতে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।'

১৯৭৪ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা উক্ত বিধানদ্বয় বিলুপ্ত করা হয়। একদলীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় জেলা গভর্নরশাসিত সরকারের ধারণা ছিল সাংবিধানিক স্থানীয় সরকারের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পরে ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা বিলুপ্ত বিধানগুলো সংবিধানে পুনঃস্থাপিত হয়।

সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোনো এলাকা। আইনে উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকার-সবই এখন প্রশাসনের একাংশ। সংবিধানে যে জেলার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই কোনো স্থানীয় সরকার এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দেশে চারটি সিটি করপোরেশন, ৩০৯টি পৌরসভা এবং ৪ হাজার ৪৭২টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৮৫,৫০০টি। উপরিউক্ত সংস্থাগুলো সব নির্বাচিত সংস্থা। এরা পাঁচ থেকে ১০ বিলিয়ন টাকা বছরে খরচ করে। এই হিসাবের বাইরে রয়েছে ৬৪টি জেলা পরিষদ এবং ৪৮৯টি উপজেলা পরিষদ, যা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের শাখা হিসেবে গণ্য হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক হলেও তা তেমন কার্যকর নয়। নানা কারণে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করতে পারেনি। কর-কাঠামো অতি পুরাতন। কর আরোপযোগ্য সম্পত্তির ঠিকমতো মূল্যায়ন হয় না। কর্মচারীদের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত দুর্বলতার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাফল্য অর্জন করা খুব কঠিন। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে কর যুক্তিযুক্ত করাও হয় না। তাছাড়া কর ফাঁকির রেওয়াজ রয়েছে সর্বত্র।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশের থানাগুলোর নাম দেন উপজেলা। প্রশাসনের প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রীকরণের জন্য উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রথম উপজেলা নির্বাচন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বর্জন করে। পরে আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অংশ নেয়। উপজেলা নির্বাচনে সহিংসতায় বেশ লোক মারা যায়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় এসে উপজেলা ব্যবস্থাকে বিলোপ করে। পরে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগের সরকার উপজেলা সম্পর্কে নতুন আইন তৈরি করে। উপজেলাকে প্রশাসনিক অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উপজেলা নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন হয় কিন্তু কোনো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি।

অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপিসহ চার দলীয় জোট উপজেলা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়। মন্ত্রীদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। ২০০২ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিএনপির প্রতিনিধি সভায়, মাঠপর্যায়ের নেতারা উপজেলা বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানান। তাঁদের কথা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। উপজেলা হলে গ্রামপর্যায়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বর্তমানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোনো জবাবদিহি নেই। একটি উপজেলায় ৩৫জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা থাকেন, যার মধ্যে প্রতিদিন ২০জনকে কর্মস্থলে পাওয়া যায় না এবং অন্তত পাঁচজন মাসে একবার অফিসে গিয়ে সই করে বেতন তুলে নিয়ে আসেন। জেলা পর্যায়েও কোনো সমন্বয় নেই।

সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদদ্বয়ে সংসদ-সদস্যদের স্থানীয় সরকার পরিষদে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এমন কোনো বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধানের ৮০ থেকে ৯২ অনুচ্ছেদে যেখানে আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা

হয়েছে, সেখানেও স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংসদ সদস্যদের কোনো সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়নি।

১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইনের ২৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।' এ ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একাধিক সরকারি সার্কুলারও জারি হয়।

স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংসদ সদস্য যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ব্যাহত হবে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দেবে। সংসদ সদস্য একজন দলীয় ব্যক্তি। উপজেলা পরিষদ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয়ে থাকে নির্দলীয় ভিত্তিতে। সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হলে পরিষদের কর্মকাণ্ডে দলীয় প্রভাব পড়তে পারে।

উপজেলা পরিষদের সদস্য হচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান ও সরকারি কর্মকর্তা। এসব সদস্য কোনোভাবেই একজন সংসদ-সদস্যের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত কোনো বিরোধিতা করার প্রয়োজন থাকলেও কেউই তা করবে না।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে উপজেলা পরিষদে কয়েক শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নকাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব উপজেলা পরিষদের। চেয়ারম্যান তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে চাইবেন। সংসদ-সদস্য চাইবেন তাঁর ইচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। এ নিয়ে সংঘাত দেখা দেবে। তাছাড়া এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে উপজেলা ও সংসদীয় এলাকা একই, অর্থাৎ একই ভোটার সংসদ-সদস্য ও উপজেলা-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। এ অবস্থায় উপজেলা-চেয়ারম্যান সংসদ সদস্যদের কথা নাও শুনতে পারেন।

জাতীয় সংসদের স্পিকারের একটি লিখিত বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে সংসদ সচিবালয় মনে করে, বর্তমান সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি চালু করা ঠিক হবে না। এর ফলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেবে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মতে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদ ঠিক ছিল, কিন্তু মন্ত্রী পরিষদশাসিত সরকারে তা ঠিক নেই। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হতে পারে। যেখানে প্রত্যেক থানা এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ভোটে এক-একজন চেয়ারম্যান হবেন। একইভাবে থানা কাউন্সিল বা থানা কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল হতে পারে।

বিএনপির ২০০১ নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে যে উপজেলার কথা বলা হয় সে-সম্পর্কে সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনের সময় মেনিফেস্টোতে অনেক কিছুই বলা হয়। অথচ সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরই বদল হয়। একটি গতিশীল সমাজে কোনো স্থির বিষয় নিয়ে থেমে থাকা সম্ভব নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মনমানসিকতারও পরিবর্তন করতে হয়।'

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সরকারের মধ্যে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত বিরাজ করে।

৩০শে জুলাই ১৯৯২ সালে কুদরত-ই-ইলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ ৪৪ ডিএলআর (এডি) ৩১৯ মামলায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ বেঞ্চ বলেন– 'সংবিধানের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব-সংক্রান্ত ৯নং অনুচ্ছেদের আলোকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৫৯নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশিগগিরই নিতে হবে। তবে কোনো অবস্থায়ই যেন এ সময় এখন থেকে ছয় মাসের অধিক না হয়।' এ নির্দেশ সরকার লঙ্ঘন করে আসছে।

সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা স্থানীয় বিষয়াবলির ব্যবস্থাপনা করা। যদি সরকার কিংবা তাদের আজ্ঞাবহদের এসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আনা হয়, তাহলে এগুলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। সংসদ সদস্যরা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত, কিন্তু তাঁরা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচিত নন। সংবিধানের ৬৫ ধারা অনুযায়ী, শুধু 'প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের ওপর ন্যস্ত' করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বা সংসদ সদস্য দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে সংবিধানসম্মতভাবে স্থানীয় সরকার বলা সমীচীন হবে না।'

উপরিউক্ত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেন, 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত পদ্ধতিকে পরিবর্তন, পুনর্গঠন বা নতুন করে সাজানো যাবে এবং আইনের মাধ্যমে এগুলোর ক্ষমতা ও কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো অথবা কমানো যাবে, কিন্তু পুরো পদ্ধতিকে বাতিল করা যাবে না।'

২০০০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান স্থানীয় সরকার সম্পর্কে একটি মতামত জরিপ করেন। সারা দেশের ২৩টি জেলার ৩৪টি উপজেলায় এই জরিপ চালানো হয়। এক হাজার ৭০০ জনের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়।

সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে ৭৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ জবাবদাতার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। জবাবদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংসদ সদস্যদের মূল কাজ হলো, গুরুত্বের ক্রমধারায়, ক. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা (৭৩ দশমিক ১২ শতাংশ), খ. নির্বাচনী এলাকায় সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ করা (৭২ দশমিক ৩৩ শতাংশ), গ. স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও মসজিদ নির্মাণ করা (৭১ দশমিক ১২ শতাংশ), ঘ. নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার সমস্যা তুলে ধরা (৬৯ দশমিক ৩১ শতাংশ), ঙ. সমস্যায় নিপতিত মানুষকে সাহায্য করা (৬৬ দশমিক ১২ শতাংশ), চ. মানুষের চাকরি, ঠিকাদারি ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার জন্য তদবির করা (৬২ দশমিক ২২ শতাংশ), ছ. স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক কলহ-বিবাদের সালিসি করা (৫৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ), জ. গরিব-দুস্থদের বৈষয়িক সাহায্য-সহায়তা দেওয়া (৫৩ দশমিক ১২ শতাংশ), ঝ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে (ইউনিয়ন পরিষদ) সহযোগিতা প্রদান (৫১ দশমিক ১১ শতাংশ), ঞ. আইন প্রণয়ন করা (৪৩ দশমিক ১৩ শতাংশ) এবং ট. স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রমের তদারক করা (৪২ দশমিক ২২ শতাংশ)।

ওই জরিপের সময় ৭২ দশমিক ০৬ শতাংশ মানুষ পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। লোকে আশা করে, এতে সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় করতে পারবেন, স্থানীয় প্রশাসনে অধিকতর জবাবদিহি আসবে, উন্নয়নের পরিধি বৃদ্ধি পাবে ও নিশ্চিত হবে, উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে।

কেন্দ্রীয় সরকার তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কোনোক্রমেই সঙ্কুচিত করতে চায় না। মাঠপর্যায়ে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত নেতাদের নিয়ন্ত্রণে আমলারা কাজ করতে চান না।

স্থানীয় সরকার আর সংসদ এক জিনিস নয়। সংসদের কাজ আইন প্রণয়ন। তাঁকে স্থানীয় সরকার চালানোর জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। আইন প্রণয়নের কাজে তাঁর কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করলে স্থানীয় সরকারের কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।

জেলা, উপজেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন, গ্রাম সরকার–এই পাঁচ-পাঁচটি স্তরে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। এর একটাও আর্থিকভাবে সুস্থ ও কার্যক্ষম হবে না। এসব প্রতিষ্ঠান সরকার-মুখাপেক্ষী এবং সরকারি দলের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে অভ্যস্ত।

প্রতিটি স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত থাকছে। মহিলারা সাধারণ আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদে অনেক মহিলা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মহিলা চেয়ারম্যানের সংখ্যাও বেড়েছে।

স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বিদেশ থেকে আগত ধারণাটি সম্পর্কে আমাদের কোনো স্বচ্ছ উপলব্ধি নেই। ক্ষমতার পালাবদলের পর পরই যেসব উদ্যোগ ঘটা করে নেওয়া হয়, তার অন্যতম হচ্ছে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কমিশন বা কমিটি গঠন। পঞ্চায়েত, পরিষদ, উপজেলা, গ্রাম-পঞ্চায়েত, গ্রামপল্লী, গ্রামসভা, গ্রাম সরকার, থানা কাউন্সিল, থানা উন্নয়ন কমিটি, জেলা বোর্ড, জেলা পরিষদ, ডিভিশনাল কাউন্সিল–দেশদরদির এসব চিত্তাকর্ষক নামকরণের অনুশীলনে 'জেলা'র কথাটা সবচেয়ে অবহেলিত। যে প্রশাসনিক অংশে স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করার কথা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে প্রদত্ত, সেই জেলা পর্যায়ে গত ৩৭ বছরে কোনো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়নি।

প্রতিটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরে স্থানীয় সরকারগুলোকে তছনছ করে দেয়। স্থানীয় সরকারের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের হাতে ন্যস্ত হয়। নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা দুর্নীতির মামলার শিকার হন এবং সেই সুবাদে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসকদের দ্বারা অপসারিত হন।

এ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সচিব বা মহাসচিবকে প্রায়ই স্থানীয় সরকার দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের নিয়ন্ত্রণ, মঞ্জুরি-প্রদান ইত্যাদির বদৌলতে ওই মন্ত্রী নিজের দলের সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা, দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের বিরাট এক সুযোগ পান। দেশে স্বচ্ছতার অভাবের জন্য বিশেষ করে যখন স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ড সরকারের আমলারা বেশির ভাগ সময় নির্বাহ করেন, সেখানে স্থানীয় সরকারের স্থানীয়ত্ব থাকে না। নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ করে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতারও অপপ্রয়োগ হয়।

যখন হাজারো কর্মে ব্যস্ত ডেপুটি কমিশনারের ওপর জেলা পরিষদের প্রশাসকের ভার দেওয়া হয়, তখন স্থানীয় সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পালিত হতে পারে না। যখন একই ব্যক্তি জাতীয় সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী এবং ঢাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিটি করপোরেশনের মেয়র, তখন তাঁর পক্ষে তাঁর কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কোনো এলাকাকে পৌরসভা করতে হলে ওই এলাকার জনসংখ্যা কমপক্ষে ৫০ হাজার এবং ৮০ ভাগ মানুষকে অকৃষিজীবী হতে হতো। বর্তমানে ৩০৯টি পৌরসভার মধ্যে ১৭২টি গঠিত হয়েছে ১৯৯০ সালের পরে। এক জেলায় ছয়টি পৌরসভা করারও নজির রয়েছে। মন্ত্রী ও সাংসদদের তদবিরে আইন-কানুন না মেনে যেসব নবগঠিত পৌরসভা করা হয়েছে সেখানে এ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের জুন মাসে সরকার সাত সদস্যের 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ' কমিটি গঠন করে ১৩ নভেম্বর ২০০৭ প্রধান উপদেষ্টার কাছে চার খণ্ডের রিপোর্ট পেশ করে, যার মধ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের প্রস্তাবিত সমন্বিত খসড়া আইন অন্তর্ভুক্ত।

কমিটি গ্রামীণ পর্যায়ে তিন স্তরবিশিষ্ট নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করেছে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা শহর পর্যায়ে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউনিয়নভুক্ত এলাকাকে পৌরসভায় পরিণত করার মানদণ্ডকে আরও কঠোর করা হয়েছে এবং বিদ্যমান আইনের শর্তাবলি পূরণ না করা সত্ত্বেও যেসব এলাকাকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়েছে একটি নির্ধারিত সময়সীমার পর সেগুলো 'স্থানীয় সরকার কমিশনে'র সুপারিশের ভিত্তিতে বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। 'সাবসিডিয়ারি তত্ত্বে'র আলোকে ওপরের স্তরগুলোর দায়িত্ব হবে সীমিত। সর্বাধিক নিম্নস্তরের সরকারের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক এবং যেসব সমস্যা নিম্নের স্তরে সমাধান সম্ভব নয়, কেবল সেগুলোর দায়িত্বই ক্রমাগতভাবে ওপরের স্তরে অর্পিত হবে।

২০০৮ সালে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলনে ড. আকবর আলি খান বলেন, 'নির্বাচিত সরকার কখনো চায় না যে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হোক। আর অনির্বাচিত সরকার স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে চেয়েছে নিজের স্বার্থে।' ১০ হাজার জনপ্রতিনিধি নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে কী স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি কী সুস্পষ্ট করেছে এমন প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে।

জাতীয় সরকারকে দাতাগোষ্ঠীরা যেমন দুর্নীতিপরায়ণ ও জবাবদিহিবিহীন সরকার হিসেবে চিহ্নিত করে, তেমনি দেশের কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত এক অপচয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করছে। স্থানীয় সরকার পূর্ণভাবে চালু না করে এবং তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আইনানুগ ব্যবস্থা না নিয়ে পূর্বাহ্নেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা যে নাকচ করা হয়, তা তো নগরাভিমুখী নির্বাচিত নেতাদের স্বার্থে।

বাংলাদেশিরা যদি এক সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক মহাশক্তি হতো, তবে তাদের অধীনে কোনো ভূখণ্ড স্বায়ত্তশাসন পেত না।

পররাষ্ট্রনীতি

সারাবিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহু যুগের। আমাদের দেশ সুইজারল্যান্ডের মতো পর্বতবেষ্টিত কিংবা ইংল্যান্ড বা জাপানের মতো সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপাবলী নয়। সবার সঙ্গে মৈত্রী এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা না করে নিরুপদ্রবে 'দেশের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব এ দেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' বানাতে চেয়েছিলেন।

সমসমায়িক দ্বিমেরুর পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডের পরিচিতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের জন্মলগ্নের পৃথিবী বদলে গেছে। বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভাবের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠছে ছোট-বড় নানা ক্ষমতাবলয়। কেবল জনশক্তি আর তৈরি পোশাক রফতানির ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। আধুনিক শিক্ষাকে আমাদের মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো কোনো অপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষে একটি দীর্ঘমেয়াদি আর সক্রিয় বিদেশনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়, বাংলাদেশের মতো একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশের বিদেশনীতি জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত হতে পারে। দেশে যে সরকারই থাকুক না কেন, দেশের স্বার্থ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। সক্রিয় বিদেশনীতি রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সে দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করে। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'বাইপার্টিজান' পররাষ্ট্রনীতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি সুসংহত দেশ। আমাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আমাদের প্রতিকূল নয়। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার যাতায়াত ব্যবস্থায় – জলে, স্থলে ও আকাশপথে আমরা একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারি। ইংরেজি ভাষা, যা আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রধান মাধ্যম, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো দুশ' বছরের অধিক।

গত সাঁইত্রিশ বছরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর আমাদের বৈদেশিক নীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার বৈদেশিক সম্পর্কের রূপরেখা অনুযায়ী বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নীতিকে তার পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা দিয়েছিল।

পাকিস্তান শুরু থেকে তার পররাষ্ট্রনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত সামরিক জোট সিয়াটো এবং সেন্টোতে যোগ দিয়েছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পররাষ্ট্রনীতিতে ক্ষমতাধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বন করার জন্য মত প্রকাশ করলেও আওয়ামী লীগের ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত দলের গঠনতন্ত্রে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদ,

উপনিবেশবাদ, একনায়কত্বের শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সব আন্দোলনের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করে। এর পেছনে একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

সংবিধানের ২৫ (ক) (খ) (গ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; খ. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং গ. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।"

সংবিধানের ৬৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়, সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে না। বৈদেশিক চুক্তি সম্পর্কে ১৪৫(ক) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোনো চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।"

সুইজারল্যান্ডের মতো বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। অন্যদিকে কিছু আরব দেশও ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি।

দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যগুলোর মধ্যে গোড়ার দিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি অপরিহার্য ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য লাভ। স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে সৌদি আরব, লিবিয়া ও চীন ব্যতীত অন্য কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। মুজিব সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে যে 'সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ' বিরোধিতার নীতি সংবিধানে সন্নিবেশিত করে, জিয়া সরকার তা ত্যাগ না করলেও নতুন ধারা ২৫(২) যোগ করে ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মতাদর্শিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। এছাড়া তার সরকার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের ভারত-সোভিয়েতমুখী প্রবণতা ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চীন-মুসলিম বিশ্বমুখী প্রবণতার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিগুলোর রণতরীর আনাগোনা বেড়ে যায় এবং এর জলসীমায় পারমাণবিক সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারত মহাসাগরকে 'শান্তি এলাকা' হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানানো হয়। এ আহ্বানের

সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্মতা প্রকাশ করে। ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে পরমাণু শক্তিকে শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ভারতীয় ব্যাখ্যা ও যুক্তিকে সমর্থন করেছিল বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মত পোষণ করে যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বিশ্বশান্তির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হুমকি রূপে বিবেচনায় এনে পারমাণবিক ও প্রচলিত অস্ত্রসহ পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি ধারণা এই অঞ্চলের অপর ছয়টি রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরা হয় এবং ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) বাস্তবায়িত হয়। আশা করা হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সূত্রপাত হলে আঞ্চলিক দেশগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যৌথ দরকষাকষির সুবিধা লাভ এবং ভারতের সঙ্গে ছোট দেশগুলোর একটা সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এসব লক্ষ্য অদ্যাবধি অর্জিত হয়নি।

মাথাপিছু আয়ের নিম্নহারের কারণে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কম থাকা এবং আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রফতানি আয় কম হওয়ার দরুন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক সাহায্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করলেও পশ্চিমা দাতাদের সন্তুষ্টির জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিকে তাদের মনঃপূত করার চেষ্টা করে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উর্ধ্বসীমা প্রথমে ২৫ লাখ টাকা স্থির করলেও পরে দাতাদের মনতুষ্টির জন্য তা বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। শিল্পকারখানা জাতীয়করণ প্রসঙ্গে পরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে আর জাতীয়করণ করা হবে না। পরবর্তী সরকারগুলোকে পূর্ববর্তী সরকারের 'সমাজতন্ত্র' নীতি পরিত্যাগ করে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সমন্বয়নীতির আওতায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

নব্বইয়ের দশক থেকে সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতির আলোকে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাকে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কূটনীতির উদ্দেশ্য বলে বোঝাতে চেয়েছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রফতানির মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের যেমন পোশাকজাত পণ্য, মৎস্যজাত পণ্য, সিরামিক দ্রব্যাদি রফতানি বাড়াতে চেয়েছে, তেমনি বৈদেশিক বিনিয়োগে শিল্প স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্য রফতানি করে ভারসাম্যহীনতা হ্রাসের উদ্যোগ নিয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সোভিয়েত, লাওস ও কম্বোডিয়ার জনগণ কর্তৃক তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনের বক্তৃতায় ভিয়েতনাম সংক্রান্ত প্যারিস শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সময় ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও পরে তা গভীরতর করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারগুলো ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে থাকে। জিয়াউর রহমানের সরকার সংবিধান থেকে

১০—

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক ১২ নম্বর ধারা বাতিল করে। সংবিধানের মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়। এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। মুসলিম প্রধান দেশ বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলোকে আকৃষ্ট করা এবং পেট্রোডলারের আকর্ষণ এসব পদক্ষেপের পেছনে কাজ করেছিল। দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রধানত দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম প্রধান দেশগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলো, জাপান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে বেছে নেয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য এবং দু'দেশের নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শিক মিলের কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ বন্ধুত্ব গুরুত্ব পায়। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন এবং সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মুসলিম বিশ্বকে পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও জিয়া সরকার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অনুষ্ণ সম্পর্কের কারণে দেশটির বন্ধুত্ব লাভে আগ্রহী ছিল। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় জিয়া সরকারের আমলে। পরবর্তী সরকারগুলো বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলত জিয়া সরকারের অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে কাঠমুণ্ডুতে চার দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান) পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, সার্ক এবং ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ এবং এদের কর্মতৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যপদ লাভ করে। তবে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিল চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে। অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে এবং চীনের সম্মতিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে ওআইসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ডি-৮ এবং বিমসটেকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে এ দুটি আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ দুই বছরের জন্য (১৯৭৯-১৯৮০) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য ছিল। বৈদেশিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এবং ১৯৮০ সালে সার্কের ধারণাটি তুলে ধরে। সার্ক ছাড়াও দ্বিপক্ষীয় কাঠামোতে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তিনদিকে ভারতের অবস্থান হওয়ায় দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত একটি স্থায়ী উপাদান হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার পর সীমান্ত বাণিজ্যচুক্তি, গঙ্গার পানির ন্যায্য

হিস্যা, বাণিজ্যিক ভারসাম্য, সমুদ্র সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেওয়ায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টনের প্রশ্নে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ধারা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি।

দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা নামে দুটি ছিট মহলের সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৯২ সালে ভারত বাংলাদেশকে এ শর্তে তিন বিঘা হস্তান্তর করে যে, বাংলাদেশের নাগরিকরা দুই ঘণ্টা অন্তর করিডোরটি ব্যবহার করবে। এ সময়সীমা পরে এক ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়। হাঁড়িয়াভাঙা নদীর মোহনায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে ১৯৮১ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ চলে আসছে। অপরদিকে দু'দেশের সমুদ্র সীমানা অচিহ্নিত রয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশিদের ঠেলে দেওয়া নিয়েও কিছু সমস্যা হচ্ছে।

বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিক প্রত্যাবাসন এবং অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদের ওপর বাংলাদেশের দাবি নিয়ে বিবাদ রয়েছে, যা আজ অবধি মীমাংসিত হয়নি। বাণিজ্য ছাড়াও বাংলাদেশের জন্য গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নেপালের সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যদিকে নেপালের জন্য কলকাতা বন্দরের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বাংলাদেশের বন্দরগুলো ব্যবহারের একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিকল্প বিদ্যমান। ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক ছাড়াও সার্কের আওতায় বাংলাদেশের সহযোগিতার অবকাশ আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও প্রথম সরকারের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে দেশ থেকে প্রকল্প, পণ্য ও খাদ্য– এ তিন ধরনের সাহায্য পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে পি.এল ৪৮০-এর মাধ্যমে খাদ্য সাহায্যের আশায়। ১৯৭৪ সালে কিউবায় পাটের থলি রফতানি করার উদ্যোগ নেওয়া হলে যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্য স্থগিত করে। বাংলাদেশকে বাধ্য হয়ে কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করতে হয়। তৈরি পোশাক রফতানির বদৌলতে যুক্তরাষ্ট্র ওই পণ্যের বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয় এবং এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে রয়েছে। তেল ও গ্যাস আহরণের সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়।

কয়েক বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ যৌথ সামরিক মহড়া এবং মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তারা ঘন ঘন বাংলাদেশ সফর করছেন। ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমেরিকান সৈন্যদের অবাধ চলাচলের অধিকার চেয়ে 'সোফা' (স্টেটাস অব ফোর্সেস অ্যাগ্রিমেন্ট) চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিলে প্রবল গণবিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। 'সোফা' চুক্তি স্বাক্ষর না করলেও বাংলাদেশ 'হানা' (হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট নিডস অ্যাসেসমেন্ট) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর সঙ্গে কারিগরি প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত।

শেখ মুজিব তার প্রথম বিদেশ সফরের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। সফরের সময় যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়, ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের ৭ দফা দাবি সমর্থন, ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন ইত্যাদি এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনে হয়, বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতিতে মস্কোকে অনুসরণ করছে। পরে সেই নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং রাজনৈতিক সম্পর্কও শিথিল হয়ে পড়ে।

আরব বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো ১৯৭৩ সালে তেল অবরোধের ফলে অধিক মূল্যে তেল বিক্রি করে যে উদ্বৃত্ত অর্থ পায় তা এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশ তার সুযোগ নেয়। এসব দেশে সদ্যসৃষ্ট শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানও করে। ধর্মীয় বিবেচনা ও অর্থনৈতিক কারণে মুসলিম বিশ্ব তথা আরব দেশগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিন ইস্যু, আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর হস্তক্ষেপ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, কুয়েতে ইরাকি দখলের অবসান প্রভৃতি দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সমর্থন জানায়।

বাংলাদেশে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে একক দাতা দেশ হিসেবে জাপানের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের ব্যাপারে কাফকো হতাশার সৃষ্টি করে। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল মূলত ভারত ও সোভিয়েত বিরাগের কারণে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীন ভেটো দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ২৮শে এপ্রিল পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে আর আপত্তি করেনি। চীন ১৯৭৫ সালের ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘে ফারাক্কা বিষয়টি উত্থাপনেও চীন বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। সশস্ত্র বাহিনী ও নৌবাহিনীকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিতে চীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে সাধারণত চারটি প্রধান ধরনে ভাগ করা হয় : দীর্ঘমেয়াদি ঋণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য; নমনীয় ঋণ যা স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ্য; স্থানীয় মুদ্রায় প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে কোনো একটি দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যের সরবরাহ, যথা পিএল ৪৮০-এর অধীনে আমেরিকার খাদ্য সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।

জনবহুল দারিদ্র্যপীড়িত এবং দুর্নীতিপরায়ণ দেশে, যার অভ্যন্তরীণ বিবর্তন তার একটি সক্রিয় বিদেশনীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করা বড়ই সুকঠিন। আজ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘর্ষে প্রতি বছর যে লোকক্ষয় ঘটছে তা অতীব দুঃখের। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমাদের স্থল, জল ও মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণ করে এ অঞ্চলকে এক শান্তির বলয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সীমান্ত চুক্তি মেনে কেউ যদি কাঁটাতারের বেড়া দিতে চায় আমাদের তাতে আপত্তি নেই। বৈধভাবে বাংলাদেশের মানুষ যাতে অন্য দেশে ভাগ্যান্বেষণে যেতে পারে তার জন্য সহজ চুক্তি হতে হবে। অবৈধভাবে সাধারণ মানুষের যে যাতায়াত হয় তাকেও একটা অনুকম্পামূলক নিয়মের

মধ্যে আনতে হবে। আমরা কোনো আন্তর্জাতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চাই না। আমরা চাই না কোনো দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে কোনো অপতৎপরতা চলুক। জাতিসংঘের কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ তার যে পারদর্শিতা দেখিয়েছে এবং শান্তির জন্য যে অবদান রেখেছে তার জন্য সব রাষ্ট্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা– তারা এই দেশকে এমনভাবে সহায়তা দান করবে যেন আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

এনজিও

সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক এনজিও রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার। এদের পূর্বসূরিরা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দাসত্ববিরোধী ও মহিলা ভোটাধিকারের পক্ষের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এনজিওদের প্রভাব তুঙ্গে দেখা যায় বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সের সময়। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ স্থাপিত হওয়ার পর এনজিও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় পরামর্শক হিসেবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ ইকোসকের প্রস্তাব ২৮৮ (x) ইন্টারন্যাল এনজিওর (ইংগো) সংজ্ঞা দেয়া হয় – যেকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা যা আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত নয়। ইংগোর নানা আত্মীয় রয়েছে বিংগো, এংগো, গংখো, কোয়্যাংগো এবং ট্যাংগো। এখন বেসরকারি এনজিও বলতে আমরা বুঝি যেখানে সরকারের অংশীদারিত্ব বা প্রতিনিধিত্ব থাকে না, এমনকি যেখানে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অনুদানের ওপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলেও।

যেসব এনজিও বিদেশি সংস্থাগুলোর এজেন্ডা অনুযায়ী কাজকর্ম করে তারা বিদেশিদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪ হাজার ইসলামি এনজিও নিবন্ধিত হয়। এসব এনজিওর অর্থ কিভাবে আসছে তা খতিয়ে দেখার জন্য এনজিও খাতের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করে তার অধীনে বর্তমানে নিবন্ধনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী ও সংশ্লিষ্ট অন্য সরকারি সংস্থার দায়-দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। এনজিও গঠন ও নিয়ন্ত্রণের বেশিরভাগ আইন পুরোনো এবং সময়োপযোগী নয়। বর্তমানে দেশে ৪৭ হাজার এনজিও রয়েছে। এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত ২ হাজার ১৫৬টি এনজিওর কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়াদি ৬৭ জন কর্মীর পক্ষে সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ ও হিসাব করা সম্ভব নয়।

১৬ই মে ২০০৬ বিশ্বব্যাংক একটি এনজিও কমিশনের সুপারিশ করেন এবং ইসলামি এনজিওগুলোর অর্থসংস্থানে পরীক্ষা করার কথা উত্থাপন করে। বিশ্বব্যাংকের মতে দেশের অর্থসংস্থানে পরীক্ষা করার কথা উত্থাপন করে। বিশ্বব্যাংকের মতে দেশের নির্বাচনে এনজিও সংশ্লিষ্টতা উচিত নয়। ইদানীং এনজিওদের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এনজিওদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। বিদেশি তহবিল ছাড়করণে ব্যুরো ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুষ নিয়ে থাকে এবং এনজিওরাও ঘুষ দিয়ে থাকে। এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের ইচ্ছেমতো গভর্নিং বোর্ড গঠিত হয়। নিয়মিত সভা না হলেও সভার বিবরণী তৈরি করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কর্মীদের বেতন দেয়া হয় না। একই কক্ষ ও মালামাল একাধিক প্রকল্পে দেখিয়ে, একজন কর্মীকে একাধিক প্রোগ্রামে দেখিয়ে দাতাদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া হয়। কর্মীদের বেতন থেকে করের নামে টাকা কেটে রাখা হলেও সরকারি খাতে জমা দেয়া হয় না। অনেক এনজিওতে একাধিক

বেতন বিবরণী তৈরি করা হয়। উচ্চ,, মধ্যম ও নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন কাঠামোয় ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। অনেক এনজিও কর্মকর্তার বেতন বেশি হলেও তারা মূল বেতন কম দেখিয়ে বাসাভাড়া, চিকিৎসা, যাতায়াতভাতা দেখিয়ে কর ফাঁকি দেন। কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট অর্গানোগ্রাম, জব ডিসক্রিপশন, কর্মঘণ্টা, ছুটি ইত্যাদি থাকলেও তা মানা হয় না। কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা সময়সীমা নেই। অনেক এনজিওর পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নারী-কর্মীদের শারীরিকভাবে হয়রানির অভিযোগও রয়েছে। দাতাদের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একটি এনজিও একাধিক দাতা সংস্থার কাছ থেকে তহবিল নেয়। কৃত্রিম সমস্যা তৈরি করে দাতাদের কাছে উপস্থাপন করে তহবিল নেওয়া হয়। সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রকল্পের তহবিল পেতে কমিশন দিতে হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকেই আত্মীয়ের নামে এনজিও খুলে সরকারি তহবিল হাতিয়ে নেয়। এনজিওগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই, তৃণমূল সংস্থাগুলো শক্তিশালী হচ্ছে না এবং কেন্দ্র ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২৪টি সুপারিশ করেছে। স্বাধীন কমিশন গঠন ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে, এনজিও গঠন ও নিয়ন্ত্রণ সমন্বিত আইন করা। এনজিওর ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের বিধান করা, এনজিওর নির্বাহী প্রধানের জবাবদিহি বৃদ্ধির জন্য গভর্নিং বডি ও প্রধান নির্বাহীর মধ্যে সভার সাম্যপূর্ণ সম্পর্ক কার্যকর করা। প্রধান নির্বাহী পরিবর্তিত হলেও কর্মীদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা। আর্থিক অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মানব সম্পদ এজেন্ডার নিয়োগ ও হিসাব থাকা ও বাস্তবায়ন। 'আমব্রেলা' বডিতে কর্মীদের অভিযোগ গ্রহণ ও তার সমাধানের জন্য সেল চালু করা। এ সেলের কাছে সংস্থার সব কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়বদ্ধ থাকবেন।

ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইলে এনজিওদের বিশেষ সুবিধা দেয়া উচিত নয়। সেবার নামে অনেক এনজিও ব্যবসা ও লাভের দিকে ঝুঁকেছে। প্রভাবশালী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। মিথ্যা খরচ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা বা কর্মকর্তাদের কম বেতন দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। টিআইবি-এর ৪ঠা অক্টোবর 'এনজিও খাতে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে এনজিও খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। সরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক হিসেবে ক্রমবর্ধমান এ খাতের স্বচ্ছতা, সুশাসন নিশ্চিতকরণে নিজস্ব সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের স্বার্থেই অপরিহার্য। এ খাতের বিরাজমান সুশাসনের অন্তরায়গুলো দূর করে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও উন্নয়নমুখী এ বিতর্কমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুপারিশমালা দেয়ার

লক্ষ্যেই টিআইবি ওই গবেষণাটি পরিচালনা করে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়।

টিআইবি এ বিষয়ে যারা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাদের বক্তব্য ও মতামতের প্রতি সম্মান রেখে বলে, প্রতিবেদনে এ খাতের চ্যালেঞ্জ ও অনিয়মের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা একটি সার্বিক বিশ্লেষণ। ঢালাওভাবে এনজিও খাতকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মন্তব্য করা হয়নি। প্রতিবেদনটি তৈরিতে যে গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনস্বীকৃত। এতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে গুণবাচক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালীন প্রাসঙ্গিক গবেষণা, তথ্য ও গ্রন্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য এনজিও নির্বাহী প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার, কেস স্টাডি, এফজিডি ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তাছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীর দেয়া তথ্যের যাচাই-বাছাই করে তা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়। এ কারণে বাছাইকৃত ২০টি এনজিওর ওপর প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ খাতের সুশাসনের সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবন করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বেশিরভাগ এনজিও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে।

১৪ই নভেম্বর ২০০৭ এক আলোচনাসভায় বলা হয়, এক সময় ক্ষুদ্রঋণ সেবা হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে তা ব্যবসা। দেশে বর্তমানে ১৩ হাজার ক্ষুদ্রঋণ কারবারি এনজিওর ১ লাখ কোটি টাকার তহবিল আছে। করের আওতায় তাদের আনা হলে এদের থেকে সরকার আড়াই হাজার কোটি টাকা কর আদায় করতে পারে। গরিবি হটাও নামে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এনজিওগুলো যে ৬৬ হাজার কোটি টাকা বিদেশ থেকে আনে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ দরিদ্রের কাছে পৌঁছেছে।

বিদেশি দাতাদের কাছ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা অনুদান লাভ করেছেন–এ প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে একটি এনজিওর চেয়ারম্যান বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইতোমধ্যে অর্ধশত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভুক্ত না হয়েও সংস্থাটি একের পর এক প্রতারণা, দুর্নীতি আর নানা ধরনের জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এনজিওগুলোর সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে সার্বিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিতে হবে। সরকারি খাতের নানা অনিয়মের প্রভাব এনজিও খাতকে প্রভাবিত করে। সরকারের সঙ্গে এনজিওদের যে সংশ্লিষ্টতা সেখানে অনিয়ম অব্যবস্থাপনা থাকলেও এককভাবে এনজিও খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

এনজিওদের ভূমিকা সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে হলেও বর্তমানে সরকারের নীতির কারণে তার অবস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা ঠিকাদারের মতো। সরকারের সঙ্গে যে প্রক্রিয়ায় এনজিওরা উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাতে সেবামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করছে কি না এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। দাতাদের কাছ থেকে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে তাদের যেভাবে ব্যবহার করা হয় এতে একদিকে যেমন কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা যায় না,

অন্যদিকে এনজিওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না এ খাতের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির স্বার্থেই। ঢালাওভাবে সব এনজিওকে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির জন্য দায়ী করা সঠিক হবে না। যেহেতু দাতাদের কাছ থেকে সমর্থন নিয়ে এনজিওদের কাজ করতে হয় সেজন্য এনজিওর নিজস্ব স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। মানবাধিকার নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করে তারা তো কোনো লাভজনক কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। সরকারের উচিত এসব এনজিওকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া। মূলত সরকারি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই এনজিও খাতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এনজিওদের পাশাপাশি দাতা সংস্থার কর্মকাণ্ডেও স্বচ্ছতা আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা দরকার ।

৬ই নভেম্বর ২০০৭ 'রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনে'র চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান বলেন, দেশের বড় এনজিওগুলো যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, তা থেকে দূরে সরে গেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলে যাত্রা শুরু হলেও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের দিকেই এখন বেশি ঝুঁকে পড়েছে তারা।

অন্যান্য খাতের মতো এনজিওগুলোতেও ব্যাপক সংস্কার দরকার। শুরুতে এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, দরিদ্র মানুষরা এর নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে আনার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। ধনী ব্যক্তিরাই এসব জায়গা দখল করে আছেন। আগে এনজিও কর্মীরা যে সেবামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করত এখন সে রকম মনোভাব থেকে দূরে সরে এসে তার কাজকে নিছক চাকরি হিসেবেই চিন্তা করছে। কিছু কিছু এনজিও বাণিজ্যনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। কারও কারও মধ্যে কর ফাঁকি ও দুর্নীতির প্রবণতাও আছে। আবার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে যারা কাজ করে সেখান থেকে ওই এনজিওগুলো যে মুনাফা পায় সব সময়ই যে তা সেবা খাতে ব্যবহার করা হয় সে রকম প্রমাণ অবশ্য সব সময় পাওয়া যায় না।

যেসব দেশে আইন সাধারণত মেনে চলা হয় এবং মোটামুটি আইনের শাসন রয়েছে সেখানেও এনজিওর জগতে বেশ চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারির খবর বেরিয়েছে। সরকারের আলোকে আলোকিত হয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান চালচুলোহীন হয়েও দিব্যি বহাল তবিয়তে থাকে। যখন কেলেঙ্কারি কোনো মতেই চাপা থাকে না তখন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা সব বাবু সমাজের ফ্যাশনেবল ছেলেমেয়ে। কথাবার্তায় তুখোর কিন্তু কাজের কোনো হদিস নেই। আমাদের দেশেও দুর্নীতির জন্য এত নাম সেই সরকারি দুর্নীতির সঙ্গে বিদগ্ধ কিছু এনজিওদের যে যোগসাজশ রয়েছে, তা সহজে গোচর হচ্ছে না। 'রেগুলেটরি কমিশন' ইতোমধ্যে যথাস্থানে আলোকপাত করার চেষ্টা করছে।

সেনাবাহিনী

পলাশীর গোলাগুলির পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার ভার পড়ল ইংরেজদের ওপর। তার আগেও সেনাবাহিনীতে, যেমন পাল আমলে, সেনাবাহিনীতে মালব, খল, কর্ণাট, কুলিক, লাট, কম্বোজ, হুনরা কাজ করত। স্থানীয় লোকদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের কাজ করত হাঁড়ি, বাগদি, ডোম, রাজবংশী ও নমঃশূদ্ররা। মুসলমান আমলে তুরুক, পাঠান ও মোগল সেনারাই ছিল সর্বেসর্বা।

যে-সমাজে ঐক্যবন্ধন দুর্বল এবং সমষ্টিচেতনা নেই বললেই হয় সেখানে তরুণেরা আওয়াজ তুললো, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' কুচকাওয়াজ শুরু করল ছেলেরা, মেয়েরাও কাঠের রাইফেল নিয়ে। চাষাভূষার ছেলেরা অত হিসেব-নিকেশ না করে মাতৃভূমির ডাকে সাড়া দিল সোৎসাহে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এগারোটি যুদ্ধক্ষেত্র বা সেক্টরে ভাগ করা হয়।

১নং সেক্টর : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত। সেক্টর কমান্ডার : মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত) ও মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

২নং সেক্টর : নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ। সেক্টর কমান্ডারঃ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ও মেজর এটিএম হায়দার (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৩নং সেক্টর : সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা। কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলা এবং ঢাকা জেলার অংশবিশেষ। সেক্টর কমান্ডার : মেজর এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ও মেজর এএনএম নুরুজ্জামান (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৪নং সেক্টর : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তরদিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত। সেক্টর কমান্ডার : মেজর সিআর দত্ত।

৫নং সেক্টর : সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল। সেক্টর কমান্ডার : মেজর মীর শওকত আলী।

৬নং সেক্টর : সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা। সেক্টর কমান্ডার : উইং কমান্ডার এম কে বাশার।

৭নং সেক্টর : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা। সেক্টর কমান্ডার : মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

৮নং সেক্টর : সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা ও দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ। সেক্টর কমান্ডার : মেজর এমএ মঞ্জুর (ডিসেম্বর পর্যন্ত) ও সেক্টর কমান্ডার : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত)।

৯নং সেক্টর : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুরের একাংশ এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। সেক্টর কমান্ডার : মেজর এ জলিল (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত), মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের শেষার্ধ পর্যন্ত), মেজর এমএ মঞ্জুর (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিনের জন্য অতিরিক্ত সার্বিক দায়িত্ব)।

১০নং সেক্টর : নৌবাহিনীর কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রুপক্ষের জলযান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক কমান্ডো নিয়ে একেকটি গ্রুপ গঠিত হতো। যে সেক্টরের এলাকায় কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হতো সেই এলাকার সেক্টর কমান্ডোদের অধীনে থেকে কমান্ডোর কাজ করত। অভিযান শেষ হওয়ার পর কমান্ডোরা আবার তাদের ফুল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসত।

১১নং সেক্টর : কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থেকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর ও তীর অঞ্চল। সেক্টর কমান্ডার : মেজর আবু তাহের (আগস্ট থেকে নভেম্বর) ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় উপাধি 'বীরশ্রেষ্ঠ'। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী যে সাতজন বীর সন্তানকে মরণোত্তর 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাঁরা হলেন : ১. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ, ২. ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ, ৩. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ৪. ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ৫. সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ৬. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এবং ৭. সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান। বর্তমানে সাতজন বীরউত্তমের দেহাবশেষ বাংলাদেশের মাটিতে সমাহিত।

বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক উপাধি পান যথাক্রমে ৬৮, ১৭৫ ও ৪২৫জন।

শেখ মুজিব দেশের জনগণকে যার যা আছে তাই নিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। স্বীয় বিবেচনায় তিনি তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। মুক্তিযুদ্ধ শেখ মুজিবের নামে পরিচালিত ও পরিচিত হলেও তিনি সেই যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হলেও যখন ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সহসা অনেক জিনিসের মধ্যে কোনটা জরুরি, কারা মিত্র বা শত্রু ও কারা নির্ভরশীল বা কারা নয় তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বিভা বা ক্যারিশমা দু'একটি ক্ষেত্রে দারুণ কাজে আসে। অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ইপিআর (পরবর্তী সময়ে বিডিআর) ও গণবাহিনীর মধ্যে গোলাগুলির জন্য যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার অবসান ঘটে। ১৫ই মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে যায়।

পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালি এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা নিয়ে যে সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছিল, তাঁদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনেও সেসব সমস্যার সমাধান হলো না। মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার বিভেদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায়

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এর ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছর সিনিয়রিটি দান এবং রক্ষীবাহিনীর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে পাকিস্তান ফেরত সেনাকর্মকর্তাদের মনে আরো অসন্তোষ ধূমায়িত হলো। সিনিয়রিটি ভঙ্গ করে জিয়াউর রহমানকে বাদ দিয়ে সফিউল্লাকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আরো বিরোধ বাধল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জেনারেল ওসমানী প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। শেখ মুজিব ওই দফতর নিজের হাতে রেখে দেন। ২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৮ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, 'যখন সরকার খন্দকার মোশতাককে সরানোর এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অবসর দেওয়ার চিন্তা করছিল তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।'

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবকে যখন সপরিবারে সৈন্যবাহিনীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা হত্যা করেন তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বনিম্নে। তাঁর বাকশাল নামীয় একদলীয় গণতন্ত্র এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর নানা বিধান নিয়ে ছিল দেশে বড় অসন্তোষ। চেইন অব কমান্ড ভেঙে মুজিব হত্যার পর ঘাতকদের এবং তাদের অধিনায়কদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। সেনাবাহিনীর কোনো সুপারিশ ছাড়াই মেজর ফারুক ও রশিদকে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার বা শাস্তি যাতে না দেওয়া যায় তার জন্য 'ইনডেমনিটি' আইন পাস করা হয়। খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। সরকার গঠন করে তিনি 'জয়বাংলা'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রচলন করেন।

শেখ মুজিবকে হত্যার পর সামরিক বাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চেইন অব কমান্ড পুনঃস্থাপনের কথা বলা হলেও সে ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য ছিল না। এরপর চেইন অব কমান্ড ঠিক করার জন্য খালেদ মোশাররফ সেনাপতি জিয়াকে বন্দি করেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তিনি এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। বন্দি জিয়াউর রহমানকে তাহের ও তাঁর সেনা সমর্থকরা মুক্ত করেন। শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ এবং আবার জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তন এসব সেনাপতির যাওয়া-আসায় সেনাবাহিনী উদ্ভ্রান্ত হলো। ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫-এর পর তাহের, জলিল, রবসহ জাসদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আটক করা হয়। মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বিচার করে তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাহের প্রাণভিক্ষা করতে অস্বীকার করেন।

সেনাবাহিনীতে উনিশটা অভ্যুত্থান ঘটে। জিয়াউর রহমান বিংশতি অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে প্রাণ হারান। এটা ঘটেছিল কিছু তরুণ অফিসারদের ক্ষোভ প্রকাশের কারণে। কর্নেল মতিউর রহমান তাঁর চাইনিজ স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন গুলি জিয়ার ওপরে চালিয়ে দেন। আমেরিকায় সামরিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। জেনারেল মঞ্জুরকে একজন ডিভিশন কমান্ডার হিসেবে ওই ঘটনার দায়দায়িত্ব নিতে হয়। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিয়া হত্যার জন্য দায়ী করা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হলে সেনাবাহিনীর নানা বিশৃঙ্খল বিষয়ের আর বিচার হলো না। কোর্ট মার্শাল আইনে অভিযুক্ত ১৩জন অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৯৮১ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতি আবদুস সাত্তার সেনাবাহিনীর প্রকাশ্য সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেনাপ্রধান এরশাদ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের

মাধ্যমে দাবি করেন রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রাখা উচিত। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বললেও দেশের কোনো কাগজে তা প্রকাশিত হয়নি। কেবল মার্কিন সাপ্তাহিকী *নিউজ উইকে* তা প্রকাশিত হয়।

এক সামরিক অভ্যুত্থানে এরশাদ প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হলেন। সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা প্রায় দশ বছর টিকে থাকল। সংসদীয় পুনরুদ্ধারের পরও তা স্থিতি পেল না। কিন্তু সেনাবাহিনীর কু-অভ্যাস দূর হলো। সেনাশিবিরে কোনো নারী আর অকালে বিধবা হতে চাইলেন না। সেনা ও সেনাকর্মকর্তারা জাতিসংঘের শান্তিমিশনে সেবাদানের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করলেন। ১৯৯৬ সালের ২০শে মে তৎকালীন সেনাপতি নাসিম ও আরো কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীতে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে এল। ক্লিনহার্ট অপারেশন বা সাফদেলের মহড়ায় হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হওয়ার সংখ্যা এত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল যে, এই অপারেশনের সঙ্গে জড়িত সেনা ও অন্যান্য শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তি দান করতে হলো। দেশের দুর্নীতিবাজরা শুধু তাদের কালো টাকা সাদা করারই সুযোগ পায়নি, তারা তাদের ভাড়াটে হত্যাকারীদের সাফ করিয়ে সাধু সাজারও সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে দুর্নীতির সয়লাব রয়ে গেল। অবশেষে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ সেনা সমর্থনে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধিষ্ঠিত হলো। এ সরকার আশা করছে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করবে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে এক সিদ্ধান্তবলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্মিলিতভাবে ২১শে নভেম্বরকে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের শেষ অংশে এই ২১শে নভেম্বর সব সেক্টরে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা কোনো না কোনো একটি যুদ্ধের বা ঘটনার সূত্রপাত ঘটান। তাই এ দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই দিনে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ কর্মকাণ্ডে গত ৮ মাসের মতোই ভারতীয় সামরিক বাহিনী সহযোগিতা দিয়েছিল। ২১শে মার্চ ১৯৯৮ ঢাকায় ভারতীয় সেনাপতি অরোরা বলেন, 'ভারতের সহায়তা ছাড়াও বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত। প্রায় ৪ হাজার ৭০০ ভারতীয় সৈন্য ওই যুদ্ধে নিহত হয়।'

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সম্বন্ধে জনগণ অনেক কিছু জানেন, আবার অনেক কিছুই জানেন না। সশস্ত্র বাহিনীর অনেকগুলো বিষয় থাকে, যে বিষয়গুলো জনসাধারণ জানলে কোনো ক্ষতি নেই। বরং জনসাধারণ জানলে ভালো। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্য এখন শতকরা ১০০ ভাগ বাংলাদেশে কমিশনপ্রাপ্ত নিয়োগপ্রাপ্ত। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতিরা সবাই বাংলাদেশের একাডেমিগুলো থেকে কমিশন পেয়েছেন ও তিন বাহিনীতে যাঁরা সৈনিক তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশে চাকরি জীবন শুরু করেছেন এবং শতকরা ৭০ ভাগের জন্মই বাংলাদেশে। জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে জানেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাদের সেবামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে। সশস্ত্র বাহিনীকে জানেন সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে প্রদর্শনীর এবং বিজয় দিবসে অথবা স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন কুচকাওয়াজ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের

সেনাবাহিনী জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত। গত নয়-দশ বছরে যে সশস্ত্র বাহিনীর অনুষ্ঠানে একবার যদি প্রধানমন্ত্রী যান, তাহলে বিরোধীদলীয় নেত্রী যান না। এই কাজটি গত দশ বছরে বারবার ঘটেছে।

১১ই জানুয়ারি ২০০৭ থেকে প্রায় ৪০০ সেনা অফিসার লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেশের সর্বত্রই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এখন প্রায় দেড় শ' অফিসার বিভিন্ন কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন। আমাদের সেনা বাহিনী জাতিসংঘের নিমন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে সেসব দেশের জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে।

১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, গত দেড় যুগে বিভিন্ন সেনা বিদ্রোহের পর গঠিত সব কোর্ট মার্শালের রায় খতিয়ে দেখা হবে। ২রা অক্টোবর ২০০০ সালে এক সংসদীয় কমিটি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার বাতিল করার সুপারিশ করে। ৮ই জানুয়ারি ২০০১ জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার পর যে ১৯জন সেনাকর্মকর্তাকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ চাকরিচ্যুত করেন তাঁদের পুনর্বহাল করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে এক সংসদীয় কমিটি সুপারিশ করে। আমাদের সেনাবাহিনীর অভিযোগ সংবিধানে প্রদত্ত মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এবং সেনা আইনে যেসব রক্ষাকবচ রয়েছে সেসব থেকেও বাস্তবে গত সাঁইত্রিশ বছরে বহুবার তাঁরা বঞ্চিত হয়েছে।

দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিন্যাস, প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ভার বিনিয়োগযোগ্য তহবিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য আমাদের অঙ্গীকার স্বচ্ছতা লাভ করেনি। গত ৩৬ বছরে শৃঙ্খলাবাহিনীতে খুব অল্প সময় ছাড়া যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তা বড়ই মর্মান্তিক। একুশ-বাইশটি ক্যু'র মধ্যে দুটিতে দু'জন রাষ্ট্রপতি বড় করুণভাবে মারা যান এবং একটিতে প্রত্যক্ষভাবে গণতন্ত্র নিহত হয়, যা ইতোমধ্যেই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল।

আমাদের কোনো প্রতিরক্ষা নীতি নেই। গত ৩৬ বছর ধরে সশস্ত্র বাহিনী এডহক ভিত্তিতে চলছে, ওয়ারবুক বা যুদ্ধবই দিয়ে। আমরা তিনদিকে ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত। আমাদের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজন হবে ভারত ও মিয়ানমারের বিপক্ষে। এরা দু'জনেই আমাদের বড় প্রতিপক্ষ। আমরা যেন বহিরাক্রমণ দ্বারা একেবারে প্লাবিত না হই তার জন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হামলা মোকাবেলার বিষয়ে আমাদের জন্য ফিনল্যান্ডের কাছে কিছু শিক্ষণীয় জিনিস থাকতে পারে।

আমাদের দেশের কেউ কেউ মনে করেন সার্ক দেশগুলোর বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইসলামি দেশগুলোর প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সামরিক মহড়া ও যোগাযোগের বিস্তার করতে হবে। বর্তমান নাজুক অবস্থায় আমাদের দেশের পক্ষে কোনো সামরিক জোটের সঙ্গে জড়িত না হয়ে সবার সঙ্গে শান্তির সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করাই বোধ হয় ভালো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছর পাঁচেকের কম সময়েই সেনাবাহিনীতে বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। যাঁরা শত্রুপক্ষের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন,

সামরিক রেওয়াজের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান-ফেরত সেনাসদস্যদের রেষারেষি দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। রক্ষীবাহিনীর গঠনকাঠামো আরো জটিলতা সৃষ্টি করে। সেনাছাউনিতে নানা উদ্ভ্রান্ত দর্শনের আবির্ভাব ঘটে। দেশের মঙ্গলের জন্য শাসন ব্যবস্থায় সেনাসদস্যদের একটা বিশেষ স্থান থাকা দরকার—মুক্তিযোদ্ধাদের এই বাম মতবাদে রক্ষণশীল সেনানায়করা কয়েক বছর পর পরম উৎসাহে সাফল্যের সঙ্গে দীক্ষা নেন। ছাউনিতে ছাউনিতে রব ওঠে দেশের প্রশাসনে সেনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দেশের প্রশাসনকে সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয়। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসামরিক শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশে বিশেষ দায়িত্বে সেনাসদস্য নিয়োগের পর পদোন্নতি ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে একটা তোলপাড় ঘটে। নির্বাহী বিভাগ থেকে যেমন বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র থাকতে হয় বা রাখা উচিত, তেমনি সামরিক বাহিনীকেও বেসামরিক প্রশাসনে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ঢালাওভাবে বিশেষ দায়িত্বে সেকেন্ডমেন্ট করা ঠিক নয়।

সেনাসদস্য বলতেই পারেন, 'আমরা দেশের সন্তান, দেশের প্রশাসনে আমাদের ন্যায্য ভূমিকা থাকতে হবে।' এহেন আকর্ষণীয় বক্তব্যে মাথা ঠিক রাখা দুরূহ ব্যাপার। বেসামরিক নাগরিকের শুধু একটিই কথা, 'আপনার গাঁয়ে উর্দিবস্ত্র ও হাতে অস্ত্র থাকলে তো আমরা সমান দক্ষতা দেখাতে পারি না। আমাদের ডর করে।' আমাদের দেশে রাজনীতিকরা, এমনকি বিপ্লবী বাম রাজনীতিকরাও অতীতে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দহরম-মহরম করে অবৈধ ক্ষমতার শরিক হতে চান এবং হন। সবাই দলনির্বিশেষে অর্থায়নে ও নানা সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে সেনাবাহিনীকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। গণতন্ত্রচর্চার জন্য তা এক বড় অস্বাস্থ্যকর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। দেশের প্রশাসন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একজন সেনাসদস্য দেশ রক্ষার বা শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দেশ থেকে তার প্রাপ্যের দিকটাকে তো তিনি বড় করে দেখতে পারেন। লাতিন আমেরিকায় কতবার সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে তার শুমার করা কঠিন। অনেক সময় অতি তুচ্ছ কারণে—যেমন ছাউনিতে বিদ্যুতের রেট বাড়ানোর জন্য—সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে। যেখানে বন্দুকের নলই বিপ্লবের উৎস বলে তত্ত্ব আওড়ানো হয়, সেখানেও বন্দুকের পেছনের বড় কর্তা বেসামরিকই হতে হবে। প্রশাসনের ইতিহাসে নানা কারণে এটা অতিস্বীকৃত কথা। এর ব্যত্যয় ঘটলে দারুণ অনাসৃষ্টি ঘটবে। ১১ই জানুয়ারি ২০০৮ সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিবিসিকে বলেন, সেনাবাহিনীকে দেশের বেসামরিক প্রশাসনে সম্পৃক্ত করার ওই পরিত্যক্ত তত্ত্বটি কেন বা কী উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় বিবেচনা করার কথা বলেন তা পরিষ্কার নয়।

দেশের বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ ১৬ই জানুয়ারি ২০০৮ চ্যানেল আইয়ের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান 'তৃতীয় মাত্রায়' এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি মনে করি, এ রকম কোনো পরিস্থিতি ঘটেনি যে সেনাবাহিনী এসে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর এটা ঠিকও না। আজকের আধুনিক বিশ্বে মার্শাল ল' বা সামরিক আইন কেউ গ্রহণ করবে না।' আমরাও মনে করি, এটা সঠিক না, যার যা দায়িত্ব সেটাই পালন করা উচিত।

দেশে জঙ্গি তৎপরতা

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে নানা ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে তারা *আলশামস, আলবদর, রাজাকার* ইত্যাদি গোষ্ঠীতে নানাভাবে সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পক্ষে পঞ্চম বাহিনী হিসেবে কাজ করে। বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে বেশকিছু বুদ্ধিজীবীকে ঢাকায় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানপন্থিরা বিভিন্ন পাটকলে আগুন দিয়ে নানা ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে। দেশের পূর্বাঞ্চলের গহিন জঙ্গলে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা কুচকাওয়াজও চালিয়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগ–বিরোধী কিছু বামপন্থি গোষ্ঠী থানা-ফাঁড়ি লুট ও খতমের রাজনীতি করে। ষড়যন্ত্রকারীদের একদল ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ শেখ মুজিবকে হত্যা করে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি তারা এবার স্বীকৃতি দেয়। দেশে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ায় একের পর এক ১৯টি সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। জিয়াউর রহমান ২০ নম্বর অভ্যুত্থানে নিহত হন। এরপর সেনাপ্রধান এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করলে দেশে কিছুদিনের জন্য জঙ্গি তৎপরতা বন্ধ হয়। কিন্তু চোরাচালান ও মাদক পাচারের জন্য বাংলাদেশ মধ্যবর্তী ফানেল হিসেবে নানা ধরনের অবৈধ তৎপরতার ক্রীড়াভূমি হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে কাশ্মির, ফিলিস্তিন, লেবানন ও ভারতের মুসলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো রাষ্ট্রের মদদপুষ্ট হয়ে দেশে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো সংগঠিত হয়। বেসরকারি বেশ কিছু ইসলামি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আর্থিক সহায়তাও পায়। সালাফিয়া ও আহলে হাদিসের আদর্শে অনুপ্রাণিত জঙ্গিরা সব ধরনের বেদাতের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সিনেমা, যাত্রা-নাটক, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি অনুষ্ঠান এদের টার্গেট হয়ে পড়ে। একাংশ আহমদিয়া কাদিয়ানিদের অমুসলমান বলে ঘোষণা দেওয়ার দাবি করে।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা না করায় জঙ্গিরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে যোগ দেওয়ার পর জঙ্গিরা উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে। ঢাকায় শ্লোগান শোনা যায়, 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'।

দেশের বাইরে যারা বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে গবেষণা করছেন, যেমন সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক গুণন্ন তাদের কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আল কায়দার প্রত্যক্ষ সংস্রব না থাকলেও কিছু প্রভাব রয়েছে। ১৬ই মার্চ ২০০৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস বলেন, 'বাংলাদেশ ট্রাবলসাম সমস্যা সংকুল হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত)–কে আরো কিছু করতে হবে।' সরকারি দল বা প্রধান বিরোধী দল ওই বক্তব্যের ওপর কোনো মন্তব্য করেনি।

৮ই অক্টোবর ১৯৯৯ খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলায় আট জন নিহত এবং ত্রিশ জন আহত হয়। ২০শে জানুয়ারি ২০০১ প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পল্টন ময়দানের সমাবেশে ও আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের কাছে বোমা হামলায় সাতজন নিহত হয়। ১৪ই এপ্রিল ২০০১ রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় দশজন নিহত এবং পঞ্চাশ জন আহত হয়। ৩রা জুন ২০০১ গোপালগঞ্জের বানিয়াচঙে বোমা হামলায় দশজন নিহত ও ত্রিশ জন আহত হয়। ১৫ই জুন ২০০১ আওয়ামী লীগের নারায়ণগঞ্জ অফিসে বোমা হামলায় ২২ জন নিহত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০১ বাগেরহাটের মোল্লাহাট সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে আটজন নিহত এবং প্রায় এক শ' জন আহত হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০১ সুনামগঞ্জের এক আওয়ামী লীগ সমাবেশে বোমা হামলায় চারজন নিহত হয়।

৪ঠা জানুয়ারি ২০০২ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারকে বলেন, সরকারের দুই মন্ত্রী তালেবানপন্থি। ব্লেয়ারের কোনো অনুষ্ঠানে ওই দুই জামায়াতে ইসলামীর মন্ত্রী যোগ দেননি। কয়েকদিন পর এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, 'সরকারে কারা তালেবান নাম বলুন। তাদের সঙ্গে থাকলে, মিটিং-মিছিল করলে তালেবান হয় না। আর বিএনপির সঙ্গে এলে তালেবান হয়ে যায়।'

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০২ সাতক্ষীরায় বোমায় এক সিনেমা হলে ও সার্কাস প্যান্ডেলে ১০০ জন আহত হয়। ৬ই ডিসেম্বর ২০০২ ময়মনসিংহের একাধিক সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলায় ২৭ জন নিহত এবং দু'শতাধিক আহত হয়। ১৭ই জানুয়ারি ২০০৩ টাঙ্গাইলের এক মেলায় এক বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নিহত ও বিশজন আহত হয়। ২১শে মে ২০০৪ সিলেটের শাহজালাল মাজারে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন নিহত ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীসহ প্রায় ৭০ জন আহত হন।

২১শে আগস্ট ২০০৪ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এক গ্রেনেড হামলা হয়। ওইদিন ২২ জন নিহত ও শেখ হাসিনাসহ ৩ শতাধিক লোক আহত হয়। পরে আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানের দুই পা কেটে ফেলতে হয়। ৫৭ ঘণ্টা পর তিনি মারা যান। ওই ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সদস্য আহত হয়নি। হতবিহ্বল হয়ে প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।

২৪শে আগস্ট ২০০৪ হিকমত-উল-জিহাদের জনৈক হায়দার রব ই-মেইলে দৈনিক *প্রথম আলোকে* জানায়, 'শেখ হাসিনা বিপদমুক্ত বলে ভাববেন না, আমরা আসছি এবার ৭ দিনের মধ্যে আমাদের টার্গেট শেষ করব।' ইয়াহু ডটকম থেকে প্রেরিত বার্তাটি শেখ হাসিনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের তথ্য অনুযায়ী ১৭ই মে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তাঁকে ১০ বার হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। চট্টগ্রামের প্রাক্তন মাদ্রাসা ছাত্র মো. শাহিনূরকে দুটি এলএমজিসহ গ্রেফতার করা হয়। মাথায় টুপি ও দাড়ি দেখে কাউকে যেন হয়রানি না করা হয় এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

২রা জানুয়ারি ২০০৫ সালে রাজশাহীর বাগমারায় খালগ্রামের যাত্রা অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ হলে যাত্রাশিল্পীসহ আহত হয় ৫০ জন। ২৭শে জানুয়ারি নিরাপত্তার কারণে দেশে যাত্রা অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়।

২০০৫ সালের ২৩শে জানুয়ারি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশ দ্রুত তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। সাবেক তালেবানি যোদ্ধা বাংলাভাইয়ের সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমবি) কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিরোধ করার নীতি ঘোষণা করে পুরুষদের দাড়ি রাখতে ও মেয়েদের বোরখা পরতে বাধ্য করছে, প্রায় ৫ হাজার মানুষকে নির্যাতন করেছে এবং বিশজনকে হত্যা করেছে।'

২০০৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী রিপোর্টে সন্দেহ করা হয় যে বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে আল কায়দার সম্পর্ক রয়েছে। ওয়াশিংটনের এক সেমিনারে ২৭শে এপ্রিল স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা অভিমত প্রকাশ করেন, ইসলামি উগ্রপন্থিদের যেভাবে উত্থান ঘটেছে তাতে বাংলাদেশে তালেবানি শাসন কায়েম করতে ৩০ বছর সময় লাগবে।

২৭শে নভেম্বর ২০০৫ আল কায়দার নামে এক ফ্যাক্স পাঠানো হয়। জেএমবি ব্রিটিশ ও মার্কিন দূতাবাস উড়িয়ে দেওয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের হত্যা করার হুমকি দেয়। ২৯শে নভেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশে প্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলা ঘটে। আধ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বোমা হামলায় আইনজীবী, পুলিশ ও বিচারপ্রার্থী নিহত হয় ৯জন, গাজীপুরে ৭ ও চট্টগ্রামে ২জন নিহত হয়। চট্টগ্রামে পুলিশের বাধা পেয়ে গায়ে বাঁধা বোমা ফাটায় এক জঙ্গি। গাজীপুরে বারে উকিলের গাউন পরে ঢুকে পড়ে আরেক জঙ্গি। জেএমবির লিফলেটে হুমকি দেওয়া হয়। পরে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। ৩০শে নভেম্বর জঙ্গিবিরোধী অভিযানে আত্মঘাতী দলের সদস্যসহ গ্রেফতার হয় ৫৩ জন। গাজীপুরে দু'দিন বিচার বন্ধ থাকে। চট্টগ্রামে উদ্বেগ ছড়ায়। ঢাকায় মিছিল হয়।

২০০৪ সালের ২রা এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের মোহনায় কর্ণফুলীর তীরে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানির ঘাটে ধরা পড়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৬৯০টি একে-৪৭ রাইফেল, ৬ শ'টি একে-৫৬ রাইফেল, ৪ শ'টি উজি গান, ১ শ'টি টমি গান, ২৭ হাজার আর্জেস গ্রেনেড ও ১১ লাখ ৩৯ হাজার গুলি। দেশে এত বড় অস্ত্রের চালান আগে কখনো ধরা পড়েনি। অস্ত্র খালাসের কাজে নিয়োজিত প্রায় সবাই আদালতে আত্মসমর্পণ করলেও মামলার তদন্ত চলে ধীরগতিতে। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় *দ্য ট্রিবিউন* পত্রিকায়। তাতে উল্লেখ রয়েছে, আরব সাগর সমুদ্র পথ দিয়ে এ অস্ত্রগুলো বাংলাদেশে আসে। মাছ ধরার ট্রলারে চট্টগ্রাম হয়ে অস্ত্রগুলো প্রথমে মৌলভীবাজার ও সিলেটে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অস্ত্রগুলোর বেশিরভাগেরই মালিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফা। এছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগঠন অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা, নেপালের মাওবাদী গেরিলা ও কাশ্মিরি বিদ্রোহীদের জন্য পাঠানো হয়। অস্ত্রগুলো পাঠানোর পেছনে সক্রিয় ছিল ভারত ও বাংলাদেশের বাইরে সার্ক-অন্তর্ভুক্ত একটি দেশের

গোয়েন্দা সংস্থা। ভারত সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অবহিত করলেও জোট সরকার নীরব থাকে। বিষয়টি আবারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জানানো হয়। মামলার তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে নতুন সরকারি অভিযোক্তা তদন্তে ১৫টি ত্রুটি চিহ্নিত করে ১৯শে নভেম্বর ২০০৭ অধিকতর তদন্তের জন্য এক আবেদন পেশ করেন। ২৪শে জানুয়ারি ২০০৮ তার শুনানি নির্দিষ্ট ছিল।

জামায়াত নেতা ও মন্ত্রী মাওলানা নিজামী বলেন, 'এসব সন্ত্রাসী ঘটনা বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন।' সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'জামায়াতকে আপনারা এত পাগল মনে করছেন কেন, যে তারা এসব করে নিজের ক্ষতি করবে?'

চট্টগ্রাম হাসপাতালে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বলেন, 'আমার কোনো সাহায্যের দরকার নাই। আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন।' জঙ্গি উত্থানে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায়ে হাইকোর্ট রুল ইস্যু করে বলেন, 'সরকারকে কেন অভিযুক্ত করা হবে না?'

২৮শে ডিসেম্বর ২০০৫ জামায়াতের এক সমাবেশে শ্লোগান দেওয়া হয়, 'হটাও হাসিনা, বাঁচাও দেশ, শায়খ রহমান-বাংলাভাই, আওয়ামী লীগের দুলাহ ভাই।' ওইদিন আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে নিজামী বলেন, "তারাই ক্ষমতায় থাকাকালে বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার কথা উল্লেখ করে বই লিখে বিদেশে বিতরণ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরকালে জঙ্গি বিষয়ে বই প্রকাশ করে তা তাঁর কাছে দিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা সে সময় জঙ্গিদমনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এখন সরকারের জঙ্গিবিরোধী অভিযানে তারা নাখোশ হচ্ছে। আওয়ামী লীগ এমপি ও যুবলীগ সাধারণ সম্পাদকের ভগ্নিপতি হচ্ছে জেএমবি প্রধান শায়খ রহমান। আর নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল নেতা মুফতি আবদুল হান্নানের আপন ভাই হচ্ছে ছাত্রলীগ নেতা। কাজেই তাদের নির্মূল কমিটিই এখন নির্মূল হয়ে গেছে। তারা দু'বার ক্ষমতায় ছিল। অথচ কোনো অভিযোগেই জামায়াতের কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোথাও কোনো মামলা দায়ের তো দূরের কথা, একটি জিডিও করেনি।" তিনি আরো বলেন, 'যে নেত্রী দেশের নিরাপত্তার প্রতীক সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারকে সহায়তা না করার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন তিনি দেশের কত বড় ক্ষতি করতে পারেন তা সহজেই বোঝা যায়। এটি কোনো সুস্থ মানুষের কথা হতে পারে না।'

১৪ই নভেম্বর ২০০৫ সালে ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় বিচারক সোহেল আহমদ চৌধুরী (৩৫) এবং জগন্নাথ পাঁড়ে (৩২) নিহত হন। চারদিন পর জোট সরকারের এক সাংসদ আবু হেনা বিবিসিকে বলেন, 'জঙ্গি তৎপরতার পেছনে সরকারের একটি অংশের মদদ আছে।'

২১শে নভেম্বর ২০০৫ সালে অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধদের অশুভ শক্তিরোধে সর্বশক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে ল' কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, 'একদল লোক ইসলামী আইন চালু করার ব্যাপারে ধারণা করে ব্যাপারটা পার্লামেন্টের নয়, কেবল বিচারকের।'

২৪শে নভেম্বর ২০০৫ শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে রাজশাহী-৩ থেকে নির্বাচিত বিএনপির সাংসদ আবু হেনাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি বলেন, 'জামায়াতের ইঙ্গিতে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শতাধিক বিএনপি সংসদ সদস্য আমার সঙ্গে একমত।'

পরের দিন জোট সরকারের মন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'বাংলাভাই এক সময় মাঠে নেমেছিল যখন সর্বহারাদের বিরুদ্ধে জনমত ছিল প্রবল। আর তাই বাংলাভাইয়ের তৎপরতাকে কাজে লাগালেও লাগাতে পারে।' তিনি অস্বীকার করেন সাংসদ আবু হেনার বক্তব্য যে, জামায়াত জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক।

ওইদিন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটির সদস্য কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেন, 'এখনই জঙ্গি তৎপরতা দমন করা না হলে দেশের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে।'

এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে নিজামী বলেন, 'গোপনে যদি কেউ চেহারা বদল করে থাকে তাকে কি সহজে ধরা যাবে? জনযুদ্ধ ও সর্বহারাদের নেতা যুগের পর যুগ আত্মগোপন করে আছেন। সবাই ধরা পড়েননি।' তিনি *ডেইলি স্টার*-এর আট কলাম হেডিংয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'অপকর্ম করে কেউ যদি আট কলাম হেডিং পায় তাহলে শত শত বাংলাভাই সৃষ্টি হবে।' ওইদিন মাদারীপুর জেএমবি নেতা আলি আহমদের বাড়ি থেকে টাইম বোমা, রাজশাহী থেকে জিহাদি বই-লিফলেট এবং রংপুরে বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।

২০০৫ সালে দেশে বোমা ও গ্রেনেড হামলায় ৬২জন নিহত এবং ৯৮৩জন আহত হয়। উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর হামলায় ৩০ নিহত এবং ৩৪৭ আহত হয়। বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে ৮৮১জন গ্রেফতার হয়।

১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে দুই লাখের মতো পীর আছে। এক পীরের সঙ্গে অন্য পীরের মিল নেই। ১৬৩ দলের মধ্যে ১০০টি ধর্মীয় দল রয়েছে। সেই সংখ্যা আরো বেড়েছে। আহলে হাদিস ও কট্টরপন্থি দলগুলো পীরভক্তি বড় অপছন্দ করে। কুলাউড়ায় আশুরা উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় গ্রেনেড হামলা হয়। শাহডিঙ্গি পীরের মাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগের দিন শাহজালাল দরগার বোমা হামলার জন্য লজ্জা প্রকাশ করে আহলে হাদিস নেতা আল গালিব বলেন, 'জঙ্গিদের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই।' আহলে হাদিস সম্মেলনে অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, 'শাহজালাল ও শাহপরানের কোরান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। ইতিহাসে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু নেই। খাদেমরা হারাম খাচ্ছেন।'

১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে আহলে হাদিস আন্দোলনের সিলেট সম্মেলনে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি পালন ইসলাম পরিপন্থি কাজ।'

১৫ই মার্চ ২০০৬ শায়খ রহমান ও বাংলাভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়।

৪ঠা এপ্রিল ২০০৬ প্রধানমন্ত্রী সাপ্তাহিক *টাইম*-এর অ্যালেক্স পেরিকে বলেন, 'দেশে জঙ্গি আছে ১৭ই আগস্টের আগে জানতাম না।' পরের দিন জঙ্গি অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

২০০৬ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মার্কিন সাংবাদিক অ্যালেক্স পেরি বলেন, 'সময়ে জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসবে এবং এক পূর্ণ তালেবান রাষ্ট্র হবে।'

২১শে এপ্রিল ২০০৬ বাংলাদেশে গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এহসানুল হক সাদেকীকে যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই'র কাছে হস্তান্তর করা হয়। সাদেকি এবং পাকিস্তান-আমেরিকান সাইদ-হারিস আহমদকে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বোমা হামলার ষড়যন্ত্র করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় ফেডারেল কোর্টে সোপর্দ করা হয়। পাঁচদিনের মধ্যে জেএমবি মজলিশে শূরার সাত নেতাই ধরা পড়েন। ১৬ই মে বিশ্বব্যাংক ইসলামি এনজিওগুলোর অর্থসংস্থান পরীক্ষা করার পরামর্শ দেয়।

৪ঠা আগস্ট ২০০৬ মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র সিন ম্যাক্‌করম্যাক বলেন, 'বাংলাদেশে আল কায়দার উপস্থিতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই।' ২০শে আগস্ট ২০০৬ মার্কিন কংগ্রেসের ১৮জন সদস্য প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠিতে জানান, আগের বছরের ২১শে আগস্টের হামলা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ গ্রেনেড হামলার তদন্তের যে সহযোগিতা করেছিল তা কাজে লাগানো হয়নি।

১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে হু-জি আত্মপ্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে তাকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ২০০৫ সালে চারদলীয় সরকার ওই প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করে। নিজামী অবশ্য দাবি করেন আলোচিত বোমা হামলার পেছনে হু-জি নয়, দায়ী হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমাম।

অষ্টম সংসদের সমাপনী অধিবেশনে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'গত পাঁচ বছরে উন্নয়ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা হয়েছে জঙ্গিবাদের। জামায়াতের ক্যাডাররা রগকাটা, হাতকাটা এবং বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন ও সন্ত্রাসের উন্নয়ন করেছে। পাঁচ বছরে ২৬ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।'

জোট সরকারের মন্ত্রী নিজামী বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র চলছে। এটা ঠেকাতে হবে।' ইসলামী জঙ্গিবাদী ইহুদিবাদীদের নীলনকশা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যারা রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র করে মুসলমানদের উসকানি দিতে চেয়েছে, জঙ্গিবাদের পেছনেও তারা দায়ী।' দেশ, জাতি ও সংবিধানের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ করে নিজামী যখন কথা বলছিলেন, তখন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা নিজামীকে 'রাজাকার' বলতে থাকেন।

২৩শে ডিসেম্বর ২০০৬ ওলামা-মাশায়েখ কমিটির এক সভায় নিজামী হরকাতুল জিহাদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেন।

৩০শে ডিসেম্বর ২০০৬ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও সুশীল সমাজের পক্ষে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদেরকে শেখ হাসিনা বলেন, 'এ সমঝোতা স্মারকে সই করে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসেনি। আমরা নির্বিচারে ফতোয়াবাজি বন্ধ করতে চাই। এ কারণেই খেলাফত মজলিসের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছে। সমঝোতার ফলে মহাজোট লাভবান হয়েছে। আজ শায়খুল হাদিসের মতো

মানুষও বলছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাই নির্বাচনী কৌশল হিসেবে এ চুক্তি করা হয়েছে।' শেখ হাসিনা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের চুক্তি বাতিলের আশ্বাস দেননি।

জামায়াতের আমির নিজামী আওয়ামী লীগদের সম্পর্কে বলেন, 'তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার স্বাক্ষর রেখেছে বারবার। নির্বাচনের শ্লোগানে পরিবর্তন এনে, বিশেষ পোশাক পরিধান করে, ইসলামের লেবাসধারী দু'চারজনকে নিজেদের সঙ্গে এনে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে।' ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে খেলাফত মজলিশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বাতিল করা হয়।

৫ই জুন ২০০৭ জাতিসংঘের সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি প্রবাসী আয় সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়। বাংলাদেশে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ লেনদেন হয় নগদে। এখানে বছরে ৬০০ কোটি প্রবাসী-আয় আসে, যা সহজেই জঙ্গি অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে পারে। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ বলেছে, 'প্রবাসীরা তাদের পরিবারকে সহায়তা দানের জন্যই এই অর্থ পাঠান। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পাঠালে তা বিদ্যমান মানি লন্ডারিং আইনে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। ৬০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ প্রবাসী-আয় পাঠায় এক কোটি মানুষ। একজন প্রবাসী একক কোনো ব্যাংকে ৫০০ ডলারের বেশি পাঠান না। সেই কারণে জঙ্গি অর্থায়নে রেমিট্যান্স ব্যবহারের আশঙ্কা সঠিক নয়।'

শায়খ রহমান, বাংলাভাই ও অন্য জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর বর্তমানে দেশে জঙ্গি তৎপরতা বেশ কমেছে। তবে মানুষের মনে, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে হতাশা বিরাজ করছে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের অপনোদন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং বিচারাধীন সব জঙ্গি তৎপরতার মামলা যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তি করলে দেশে জঙ্গি তৎপরতা হ্রাস পেতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূগাঠনিক কার্যকারণের জন্য বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা বিপর্যস্ত হয়। ভূমিকম্প, বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়-ঝঞ্ঝা-সাইক্লোনের মধ্যে ভূমিকম্পের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম। একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পে ১৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন টিএনটি শক্তি নির্গত হয়, যা জাপানে যে প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তার প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি। সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত ভূমিকম্প স্থায়ী হয়। বাংলাদেশের ভেতরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের বিগত ২৫০ বছরের ভূমি কম্পনের ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক মাঝারি থেকে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫টিরও বেশি আঘাত হেনেছে গত ৫০ বছরে। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ৩,৭৫,৫৫০ বর্গকিমি এলাকায় দালান কোঠার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ প্রায় এক পক্ষকাল বন্ধ থাকে। ৭ই নভেম্বর ২০০৭ গত দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্প দুর্যোগ প্রতিরোধ মোকাবিলায় সাধারণ তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়— প্রাক-দুর্যোগ, ভৌত পরিকল্পনা, দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব লাঘব এবং জমি জরিপের ব্যবস্থাপনা। বর্তমানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে ঘনবসতির জন্য কেবল ঢাকায় কয়েক লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটবে। ভূমিকম্পের আঘাত সহ্য করতে পারে এমন হিসেবে অনেক বহুতল বিশিষ্ট ইমারত তৈরি করা হয়নি। বহুতল বাড়ির মেঝে যেভাবে গাড়ি রাখার জন্য খালি রাখা হয় তা বিপজ্জনক বলে ভূমিকম্পবিশারদরা মনে করেন।

বাংলাদেশের প্লাবনভূমিতে বন্যা একদিকে আশীর্বাদ এবং আরেকদিকে অভিশাপ। প্রতিটি ব্যাপক বন্যার পরে মাটির উর্বরতা ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রতিবছর আমাদের দেশের ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল অর্থাৎ ১৮ শতাংশ ভূখণ্ড বন্যায় ডুবে যায় এবং ৫৫ শতাংশের অধিক ভূখণ্ড বন্যার প্রকোপে পড়ে। প্রতিবছর গড়ে তিনটি প্রধান নদীপথে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমে আট লাখ ৪৪ হাজার কিউবিক মিটার পানি প্রবাহিত হয়। এটি বার্ষিক মোট প্রবাহের ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টির কারণে দেশের অভ্যন্তরে এক লাখ ৮৭ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার নদীপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে বন্যা তিন প্রকার – মৌসুমি বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও জোয়ারভাটা বন্যা। এ ছাড়া রয়েছে উপকূল অঞ্চলে অনিয়মিত ও আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস।

১৮৭০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত সংঘটিত বন্যার বিস্তারিত প্রতিবেদনে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ বলেছেন, দেশে গড়ে প্রতি দুই বছরে একবার এবং ভয়াবহ বন্যা গড়ে ছয়-সাত বছরে একবার সংঘটিত হয়। ১৯২৭ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের

উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা প্রতি সাত বছরে একবার এবং মহাপ্রলয়ঙ্করি বন্যা প্রতি ৩৩ থেকে ৫০ বছরে একবার হানা দিয়ে থাকে।

১৯৫৪ সালের আগস্টে ঢাকা শহরের বৃহৎ অংশ ডুবে যায়। পরের বছর ঢাকার ৩০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। ১৯৫৪ সালে বুড়িগঙ্গা তার সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে দেশের ৪০ শতাংশের অধিক ভূখণ্ড প্লাবিত হয়। পরের বছর বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং ৮২ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ রকম বন্যা ৫০ থেকে ১০০ বছরে একবারই হয়।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবানে প্রবল বর্ষণজনিত কারণে ছয়জনের মৃত্যু হয়। রংপুর, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জে তিন লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়। জুলাইয়ের প্রথমার্ধে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, করোতোয়া ও তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তিস্তার পাঁচটি প্লাবনরক্ষা বাঁধ ভেঙে যায়। আট জেলায় বন্যার অবনতি ঘটে। এক দিনের মধ্যে ১১টি জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়। চট্টগ্রামের সঙ্গে কক্সবাজার ও বান্দরবান বিচ্ছিন্ন হয়। পদ্মা-যমুনা বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙন এবং গোমতি বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। ১৪টি জেলায় ২০ লাখ মানুষ পানিবন্দী ও ১২ জনের মৃত্যু হয়। ত্রিমোহিনী-বাঙালি নতুন রেললাইনে ধস নামে। কয়েক দিনের মধ্যে ২৫টি জেলায় ৪০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় সব কটি নদীর পানি বিপদসীমার ওপরে প্রবাহিত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৫টি জেলায় এক কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশে বন্যাদুর্গত এলাকায় খাদ্যসংকট ও ডায়রিয়া দেখা দেয়। বন্যার জন্য সে-সময়ের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া (৪ঠা আগস্ট ১৯৯৮) বলেন, 'তারা কান্নাকাটি করে মাফ চেয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এখন দেশবাসীকে কাঁদাচ্ছে।'

সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কৃষিঋণ আদায় এক বছর বন্ধ ঘোষণা করেন। সরকারি তথ্যে ৩৭টি জেলায় এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৩ হাজার ৯৮৭ জন বন্যাক্রান্ত, মৃত ২৮০, ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত ৬৮ হাজার ৯৬১ এবং ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু চার হাজার দুইজন। ১৭ই আগস্ট ১৯৯৮ সালে ১২ ঘণ্টায় ১২১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় এবং ঢাকার সচিবালয়ে হাঁটুজল জমে। রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ শহররক্ষা বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। ঢাকার গুলশানে ত্রাণবিতরণে সংঘর্ষে আহত হয় ২০জন। বন্যার কারণে পাঁচটি রেললাইনে আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাষাঢ়া-নারায়ণগঞ্জ, সরিষাবাড়ি-জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, রাজশাহী-গোয়ালন্দ ও সিরাজগঞ্জ বাজার-সিরাজগঞ্জ ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন, 'সরকার বন্যা নিয়ে রাজনীতি করছে।' ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, 'বিরোধীদলীয় নেত্রী বন্যাকে পুঁজি করে ক্ষমতায় যাওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছেন।' তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, 'চীনে একে অপরের সমালোচনা করে সবাই বন্যাকবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি পানি ১৫ দশমিক চার মিটারের রেকর্ড অতিক্রম করে। ডিএনডি বাঁধ রক্ষায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৬১টি কারখানা জলমগ্ন হয়।

পটুয়াখালী, বরিশাল, গাইবান্ধা ও নাটোরে বাঁধ ভেঙে যায়। ময়মনসিংহ ছাড়া ঢাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ ও অস্ত্রের মহড়া বন্ধ হয়। আপাতত সবাই বন্যার্তের সেবায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণের কিস্তি আদায় তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। বন্যায় ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের পরিশোধ কার্যক্রম স্থগিত রাখার দরুন ঘাটতি পূরণের জন্য এনজিওগুলো সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে ২০০ কোটি টাকা সাহায্য চায়।

১৮ই জুলাই ১৯৯৮ সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনের 'বাংলাদেশে বন্যা : প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন কৌশল' প্রতিবেদনে বলা হয়, 'দেশের ৬০ শতাংশ জমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ ছয় মিটার উঁচু। বর্ষায় ২০ শতাংশ জমি বন্যাকবলিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনের পরেই বন্যার স্থান। স্থানীয় লোকের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সমাধান খুঁজতে হবে।'

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুর্যোগ হিসেবে বাংলাদেশের বন্যাকে বিবিসির এক প্রতিবেদনে চিহ্নিত করা হয়। একজন রেডক্রস কর্মীর মতে, এ সংকট একটা হেরে যাওয়া যুদ্ধের মতো।

বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা করার একটা সহজাত পারদর্শিতা আমরা অর্জন করেছি। কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুজিয়ানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্যাটরিনা নামের যে তাণ্ডব জলোচ্ছ্বাস ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল, তখন সে দেশের লোক তাৎক্ষণিকভাবে তার মোকাবিলা করতে সফল হয়নি। সে সময় বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলার সাফল্যের কথা প্রায় আলোচিত হতো।

বন্যানিয়ন্ত্রণে আমরা নেপাল, ভারত, চীন, জাপান ও হল্যান্ডের সঙ্গে নানা মতবিনিময় করেছি, কিন্তু আঞ্চলিক ঐকমত্যের অভাবে সমন্বিত কর্মকাণ্ডের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

২০০৭ সালের বন্যায় ৮০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার পানি রাজধানী ঘিরে ফেলে। বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ডায়রিয়ার জন্য কলেরা হাসপাতালের বাইরেও বিভিন্ন হাসপাতালে এবং হাজি ক্যাম্পে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবার বন্যার সঙ্গে আট জেলায় একাধিকবার টর্নেডো আঘাত হানে। ডায়রিয়ার সঙ্গে চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাপের কামড়ে বেশকিছু লোক মারা যায়। বন্যার পানিতে চৌকি ভাসিয়ে লাশের গোসল দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় ভেলার জন্য একটি কলাগাছ ১০ টাকায় বিক্রি হয়। ২০০৭ সালে বন্যা একবার চলে গিয়ে আবার ফিরে এলে বেশ কিছু এলাকা আবার প্লাবিত হয়।

বন্যার ক্ষতি কাটাতে সরকার দাতাদের কাছে ১৫ কোটি ডলার (এক হাজার ৫০ কোটি টাকা) সাহায্য চায় এবং খাদ্যসহায়তার কথাও বলে।

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বড় বড় এই তিনটি নদী অববাহিকার সর্বনিম্নে বাংলাদেশের অবস্থান এবং দেশের বিশাল অংশ সমুদ্রপিঠ থেকে সামান্য উপরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনেক নিম্নাঞ্চল রয়েছে এবং বন্যার কারণে নদীভাঙ্গন ব্যাপক আকারে ঘটে থাকে এবং ফলে প্রতিবছরই অনেক মানুষ ভিটেমাটিহারা, বাস্তুহারা হয়ে বিপর্যস্তদের কাতারে যোগ দিতে বাধ্য হন। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। সমুদ্রস্ফীতির কারণে বন্যা দীর্ঘায়িত হবে এবং বাংলাদেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা স্থায়ীভাবে প্লাবিত হয়ে যেতে পারে আর লবণাক্ততা দেশের অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

বাংলাদেশ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং ৪৫০ সেন্টিমিটার বা তার বেশি সমুদ্রস্ফীতির মুখোমুখি হতে পারে। স্থায়ীভাবে প্লাবিত হয়ে যাওয়া ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল বসবাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ততা হারাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল খরাপ্রবণ এলাকায় খরার প্রকোপ বাড়তে পারে এবং ফলে অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে।

সুন্দরবনে বিশ্ব উত্তরাধিকার (World Heritage) সাইট এবং রামসার (Ramsar) সাইট রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরো সুন্দরবন সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সিডর সুন্দরবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।

গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য তবুও সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যহত না করে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎসারণ আরও কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

জলবায়ুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) গঠন করা হয়। ২০০৭ সালের ৬ই এপ্রিল আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরই বিশ্ববাসীর টনক নড়ে। বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো প্রভাব পড়বে কি না তা নিয়ে যারা সংশয়ে ছিলেন, তাদের কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ১০০ কোটিরও বেশি লোক ২০৫০ সালের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়বে। হিমালয়ের বরফগলা পানিতে ভারত ও বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেবে। শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি কমে যাওয়ায় সেচ ব্যাহত হবে। ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেখা দেবে সংকট। বঙ্গোপসাগর, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরে সাইক্লোন বেশি হবে এবং বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে ঘটবে ব্যাপক পরিবর্তন। সমুদ্র ভেতরে চলে আসায় উপকূলীয় অঞ্চলে লোনাপানির প্রবাহ বেড়ে গিয়ে কৃষি এবং পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। এসব অঞ্চলের বন্দর, পর্যটন কেন্দ্র, মৎস্য চাষ ও কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে সব দেশের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে প্রতিবেদনে আশা করা হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৮-এর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বাতাস থেকে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণের কারণে সমুদ্রে এসিডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড় ইত্যাদির কারণে এখন পরিবেশগত শরণার্থীদের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র এক মিটার বাড়লে বিশ্বের একটি কোটি মানুষ পরিণত হবে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর সব দেশ যদি সমঝোতার মাধ্যমে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বছর গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়, তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এতদিন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেও এবার তারা সমস্যাটিকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ বলে স্বীকার করেছে। ১৮৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট তাপমাত্রা বেড়েছে ৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৯৯০ থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১.৪০ থেকে ৫.৮০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। শিল্পায়ন-পূর্ব সময় থেকে অর্থাৎ আঠারো শতক থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের (সিও-২) পরিমাণ বেড়েছে ২৮০ থেকে ৩৭৯ পিপিএম পর্যন্ত এবং ২১০০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৪০ থেকে ৯৭০ পিপিএম। মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক। বিশ্বের প্রায় ২৫ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ৩০ বছরের মধ্যে হিমালয়ের বরফের ৫ ভাগের ৪ ভাগই গলে যেতে পারে। এ সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে ০.০৯ থেকে ০.৮৮ মিটার পর্যন্ত। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে ধানের উৎপাদন কমবে ৮ ভাগ ও গম কমবে ৩২ ভাগ। তাপমাত্রা দেড় থেকে আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে এ শতাব্দীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর এক-তৃতীয়াংশ হুমকির মুখোমুখি হতে পারে বলে জাতিসংঘের আশংকা। এশিয়ায় বন্যা, খরা ও বিশুদ্ধ পানির অভাব তীব্র হয়ে উঠবে।

সিংহলী ভাষায় সিডর মানে চোখ। অনেকে মনে করেন লাতিন শব্দ 'সিড্রা' থেকে 'সিডর' কথাটির উদ্ভব। 'সিড্রা'র অর্থ উল্কা। এবং পশ্চিমা কুসংস্কারবাদীদের অনেকেই বিশ্বাস করেন, পৃথিবী থেকে 'শয়তান' দূর করার উদ্দেশ্যেই আলোকোজ্জ্বল 'সিডর'-এর আগমন। এবারের 'সিডর'-এর রক্তচক্ষু বলেশ্বর নদীর উন্মুক্ত মোহনা বরাবর নিবদ্ধ ছিল। সে কারণে সুন্দরবনের ব্যূহ ভেদ করে ঘূর্ণিঝড়টি মূল ভূখণ্ডের অনেক এলাকায় ক্ষতিসাধন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সার্বিক বিচারে বহু বছর খাদ্য ঘাটতির এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানকার অধিকাংশ জমি এক ফসলা এবং সে আমন ধান পাকা অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়ে নষ্ট হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান হলো, প্রায় ৬ লাখ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর প্রায়ই দেখা যায়, আমরা ক্ষয়ক্ষতির গাণিতিক হিসেব নিরূপণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভাবখানা এমন যে কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে, যা ঘাটতি আকারে দেখা দেবে এবং তা পূরণ করতে পারলেই জীবন ও অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে। দাতা-সংস্কৃতির প্রাধান্যের কারণে অনেক সময় এ ধরনের

উদ্যোগ নিতে হয়। আবারও ভিক্ষা-মানসিকতা থেকেও অর্থভাণ্ডারের রক্ষকেরা এ পথ বেছে নেন।

রাজনীতি ও বন্যায় থমকে যাওয়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কাজ ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির কারণে নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হয়। চলতি বছরে চালের উৎপাদনে (আনুমানিক) ৪ শতাংশ ঘাটতি মানে এ নয় যে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ চার শতাংশ কমবে এবং সে কারণে বাজারে দাম বৃদ্ধি পাবে। শুরুতে স্থানীয় বাজার থেকে ত্রাণ সংগ্রহের কারণে কিছুটা চাপ থাকলেও দাম যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে চালের বাজার দর ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু মুরগি, গবাদি পশু, ডিম, দুধ এবং নদী ও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত মাছের বাজার আর্ন্তজাতিক লেনদেনের সঙ্গে চালের মতো ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভোগ্যপণ্যের বাজার দরের ওপর অতিরিক্ত উর্ধ্বমুখী চাপ থাকে।

চিংড়ি এবং অন্যান্য রফতানিযোগ্য মাছ ও কুটিরশিল্প দ্রব্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় রফতানি আয় কিছুটা কমবে—কিন্তু এর আনুপাতিক পরিমাণ কম হওয়ায় আন্তর্জাতিক লেনদেন খাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না।

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে একটা দ্রব্যের সরবরাহ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশ গাছ ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। ১৫ হাজার টাকার গাছ এখন পাইকারেরা ৫ হাজার টাকায় কিনতেও দ্বিধা বোধ করছে।

ঝড়-বিধ্বস্ত মানুষের পাশে খাবার, পানি ও বেঁচে থাকার মৌলিক কিছু উপাদান নিয়ে হাজির হওয়া প্রধান করণীয়। মার্কিন জাহাজে নোনা পানি বিশুদ্ধ-পানযোগ্য করার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা ব্যবহার করে পানির আশু সংকট কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এককভাবে সরকার বা যৌথ বাহিনীর পক্ষে এ ধরনের সংকট মোকাবেলা যে সম্ভব নয়, তা স্বীকৃত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আজ সত্যিকার অর্থেই যদি কেউ সংকটের প্রসারতা উপলব্ধি করেন, তাদেরকে বিকেন্দ্রীভূত (এবং কিছুটা বিশৃঙ্খল) ত্রাণ–ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। অতি নিয়ন্ত্রণ বারবার আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করছে।

ত্রাণ কাজের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, অনেক এলাকায় বাজারের এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে সেখানে টাকা-পয়সা বিতরণ অর্থহীন। যেখানে বাজার রয়েছে সেখানে স্থানীয় শ্রমবাজারকে চাঙ্গা করা আবশ্যিক এবং এ জন্য গৃহ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ ও শ্রম ব্যবহার করে নিজেদের পছন্দমতো ঘর তৈরিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। গ্রাম পর্যায়ের সমাজ সংগঠনকে সচল করে, তাদের দিয়েই স্থানীয় অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত ও অবকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ জরুরি এবং সেভাবেই পর্যাপ্ত সাহায্য (তাদের দ্বারা চিহ্নিত প্রয়োজনের ভিত্তিতে) প্রতি গ্রাম সমাজকে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।

১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সিডর ২২০-২৪০ কিলোমিটার বেগে উপকূলে আঘাত হানে। ১৫ ফুট-জলোচ্ছ্বাস ঘটে। বরগুনা, পটুয়াখালী ও বাগেরহাটে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে যায়। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে দু'দফা বিপর্যয় ঘটে। ৩৬ ঘণ্টার পরে রাজধানীতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। উপকূলে অনেকে ঘরবাড়ি ও মালপত্রের মায়ায় আশ্রয়কেন্দ্রে

যায়নি। অনেকে বিপদ সংকেতকে আমলই দেয়নি। সুন্দরবনের বহু বাঘ, হরিণ ও অন্যান্য প্রাণীসহ গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস '৭০ সালে ৫ লাখ, '৮৫ সালে ১১ হাজার, '৯১ সালে এক লাখ ৩৮ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। বিপদ সংকেত শুনে বহু মানুষ ছুটে গিয়েছিল আশ্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু সবার ঠাঁই হয়নি। এরপর তারা পাগলের মতো ছুটোছুটি করেছে সামান্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কেউ কেউ গাছে চড়ে বসেছে। কিন্তু নিজেকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি অনেকেই, খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে জলোচ্ছ্বাসে।

উপকূলীয় এলাকার অর্ধকোটি মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নেই। '৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর 'মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার স্টাডি প্রকল্প' দুই বছর ধরে বহু পর্যবেক্ষণের পর উপকূলের ৪৭টি উপজেলায় মোট চার হাজার আশ্রয়কেন্দ্র থাকা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করেছিল। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো এমনভাবে নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল, যেন প্রতিটি কেন্দ্রে কমপক্ষে এক হাজার ৭০০ মানুষ আশ্রয় নিতে পারে। অথচ এ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে মাত্র ২ হাজার আশ্রয়কেন্দ্র, যার মধ্যে ২০০ আশ্রয়কেন্দ্র মানুষের আশ্রয় নেওয়ার উপযোগী নয়। তদুপরি অনেক আশ্রয়কেন্দ্রে ১ হাজার মানুষও আশ্রয় নিতে পারে না।

আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করতে হবে লোকবসতির কাছাকাছি দূরত্বে, এক কিলোমিটারের মধ্যে, যাতে প্রয়োজনের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মানুষকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে না হয়। বেশি দূরত্বের কারণে অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চায়নি। আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনাগ্রহের আরেকটি প্রধান কারণ ছিল গবাদি পশু ছেড়ে যাওয়া। কোনো দরিদ্র পরিবারের কাছে একটি গরু বা মহিষ নিজের জীবনের মতোই মূল্যবান। তাই উপকূলীয় এলাকায় গরু-মহিষের জন্য উঁচু মাটির ঢিবি নির্মাণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মতোই জরুরি।

সিডরের ক্ষতি এমন এক সময় হয়, যখন নানা কারণে অর্থনীতি বিপাকে ছিল। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি তো আছেই, তার ওপর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি, খাদ্য ও সারসহ অন্যান্য পণ্যের দাম যেমন বেড়েছে; তেমনি দেশের প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাকের দাম বাড়েনি বরং কমেছে। জ্বালানি তেলে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। সারেই ভর্তুকি দিতে হয় ৫০ কোটি ডলার। বিনিয়োগ কমে যায়।

অর্থনীতির ওপর সার্বিক যে চাপ পড়েছে এবং মানুষের গড়পড়তা ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু কমেছে তা কীভাবে সব শ্রেণীর মধ্যে অভাব-অনটন ভাগাভাগি করে নেয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অগণিত ঘর-বাড়ি ভেঙে গেছে, পাকা ভবন এবং রাস্তা প্লাবিত হয়েছে। হাজার হাজার একর জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। সরকারি হিসেবে ২ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর জানা গেলেও এ সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারত, আরও অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। সেই তুলনায়

সিডরের আঘাতে খুব কম সংখ্যক মানুষই মারা গেলেন। কিন্তু কেন এত কম ক্ষয়ক্ষতি?

বাংলাদেশ এখন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আগের থেকে বেশি দক্ষ। গত কয়েক দশকে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং ঝড় মোকাবেলায় করণীয় ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সিডর আঘাত হানার আগের দিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় সম্ভাব্য বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে প্রায় ৩২ লাখ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনে, সে সঙ্গে ত্রাণ এবং উদ্ধার সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে ঝড় কেটে গেলে সরকার দ্রুত ৪ হাজার মেট্রিক টন চাল, হাজার হাজার তাবু বিতরণ করে। প্রায় ৭০০ মেডিক্যাল টিম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার কর্মতৎপরতা আগের চেয়ে কার্যকর হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের আগে সরকারের কার্যক্রম সমালোচিত হয়নি, বরং তা প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর সরকারের কার্যক্রম বিশেষ করে দ্রুত সাহায্য পৌঁছাতে তাদের ব্যর্থতা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

ঝড় আঘাত হানার আগে তিনদিন ধরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও খবর প্রকাশ, মসজিদের মাইকে ঘোষণা প্রচার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্তত ১ কোটি লোককে সতর্ক করা হয়েছিল। যদিও এসব অঞ্চলের লোকজনের বেশিরভাগ অশিক্ষিত বলে সরকারের এ কৌশল খুব কার্যকর হয়নি।

অনেকে বলেন, সিডর আঘাত হানার সময় বঙ্গোপসাগরে স্রোতের টান ভাটির দিকে থাকায় মৃতের সংখ্যা খুব বেশি হয়নি। এ সময় জোয়ার থাকলে জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের মাত্রা এর চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর হতো। বরাবরের মতো জীবন ও সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে সুন্দরবন ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি সরবরাহ দেওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার উপদ্রুত মানুষের এ মুহূর্তে কী প্রয়োজন। ঝড়ের প্রায় এক সপ্তাহ পরও বর্তমানে লাখ লাখ লোক আশ্রয়হীন। তাদের কাছে খাদ্য, খাবার, পানি কিছুই নেই। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা তুলনামূলক কম। বহু ধান ক্ষেত ধ্বংস হয়ে গেছে।

কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক ঘটনা হলো কৃষকরা কিছু শস্য রক্ষা করতে পেরেছে। অনেক গরিব কৃষকের হাতে কিছুই নেই এবং তাদের ভবিষ্যৎ হতাশজনক। দেশটির ধনী ও গরিবদের মধ্যে বৈষম্য আরো প্রকট হয়েছে।

সেরা প্রতিরোধ হলো শিক্ষা। গরিব কৃষকরা ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে জেনে তাদের গবাদিপশুগুলো না ফেলে এসে সেগুলো নিয়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেন।

স্মরণাতীত কাল থেকেই বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত করে আসছে। কিছু আবহাওয়াবিদ বলে থাকেন বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘূর্ণিঝড় এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। তবে এ যুক্তি এখনো প্রমাণিত নয়, যদিও এ ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই বিতর্কের মাত্রা বাড়বে।

গট মাচ টাইম ফর দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড-এ ড. এরহার্ড এপলার বলেন, পূর্ব-পাকিস্তান, বঙ্গ, বাংলাদেশ—এ অঞ্চলটির নাম উচ্চারণ করতেই ইউরোপীয়দের চোখে যে চিত্র ভেসে ওঠে তা হলো বিভীষিকা। কেন বিভীষিকা তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন,

সেখানে বন্যার পানি নেমে যাওয়া কাদার মধ্যে পড়ে রয়েছে শিশুর মৃতদেহ, ঢাকার রাস্তায় গুলিতে নিহত রিকশাচালকের লাশ পড়ে আছে অবহেলায়, কলেরায় মরছে মানুষ, আরও কত নিষ্ঠুরতা! সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও একাত্তরের গণহত্যার প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গবেষণায় লেখেন : ঘূর্ণিঝড়ে মরেছে এক লাখ, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে তিন লাখ, স্বাধীনতা যুদ্ধে জবাই হয়েছে ৫ লাখ।

শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয়। বাংলাদেশের বিপর্যয়ের রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। অদূরদর্শী গলাবাজির রাজনীতি ও বক্তৃতাসর্বস্ব নেতৃত্ব, কঠোর জাতীয়তাবাদ ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে প্রথাগত ধারণা এ দেশটির মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

আমাদের এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, তা জানা কথা। হরবছর দু'তিনবার বন্যা হবে। ছোটবড় ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস হবে বার কয়েক। কথা নেই বার্তা নেই মিনিট খানেকের টর্নেডোতে বিশ-পঞ্চাশটি গ্রাম চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, বাড়িঘর উড়ে যাবে। আর এর মধ্যেই আমাদের সাহসের সঙ্গে দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হবে।

সরকারের কাজ সরকার করছে। মার্কিন নৌবাহিনীর সৈনিকেরাও তাদের কাজ করছে। বিদেশ থেকে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে উড়োজাহাজ আসছে। জনগণও কেউ কেউ সাধ্যমতো এগিয়ে গেছেন ত্রাণ নিয়ে এনজিওগুলো নীরব। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো খাতায় হিসাব মিলিয়ে দেখছে, তাদের খাতক কতজন ভেসে গেছে। ভাবছে, গেল তো গেল, আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে গেল। খাতকদের যারা বেঁচে আছে, তাদের গলায় গামছা দিয়ে সুদসহ আদায়ের আয়োজন চলছে।

নারী

রাষ্ট্র পরিচালনার অনুচ্ছেদে মূলনীতির অধ্যায়ের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয়েছে যে সমাজের দুস্থ মানুষের পাশাপাশি বিধবাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। ১৭(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কর্তৃক পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দেবে এবং মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সব নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৮নং অনুচ্ছেদ—অনুযায়ী রাষ্ট্র, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বা শর্তের সম্মুখীন হতে হবে না এবং যেকোনো অনগ্রসর এলাকার নারী বা শিশু অথবা নাগরিকদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। ২৯নং অনুচ্ছেদ—অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ব্যাপারে সব নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে এবং কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের কর্মে নিয়োগ বা কর্ম লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না অথবা তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

সরকার কর্তৃক সমর্থিত জাতিসংঘের বৈষম্য বিলুপ্তি সম্পর্কিত কনভেনশনকে (UNCEDAW) পরিবারের আওতায় সমানাধিকারের বিধানগুলোর ক্ষেত্রে শর্তাধীন করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের নাগরিকত্ব আইন এ ধরনের বৈষম্যের একটি উদাহরণ, যা নারীদের জন্য পুরুষের মতো আইনগত সমানাধিকার ভোগ সংকুচিত করেছে। কিছু ফৌজদারি আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীনতার অভাব রয়েছে।

সংবিধান শিল্পখাতে বিদ্যমান শ্রম-আইনগুলো বৈষম্যহীন ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করার নিশ্চয়তা দেয়। বাস্তবে এসব আইন থেকে নারী-শ্রমিকেরা খুব কমই নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। অবিবাহিত নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক নিয়োগ এবং নারী-শ্রমিকদের অবেক্ষাধীন মেয়াদের পরিসর আইনগত মেয়াদের চেয়ে অতিরিক্ত রাখায় অনেক নারী-শ্রমিক তাদের বৈধ বা আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারী-শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও তাদের অধিকারগুলো আইন দ্বারা সুরক্ষিত নয়।

মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহ হলো দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। মেয়েকে বাল্যাবস্থায় পিতা-মাতা বিয়ে দিলে মেয়েটি সাবালিকা হওয়ার পর সে তা

অনুমোদন বা বাতিল করতে পারে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) নারী-পুরুষের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে নারীদের জন্য ১৮ ও পুরুষের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করে। আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও, এ ধরনের বিয়ে অবৈধ ঘোষণার কোনো বিধান নেই। ইসলাম সীমিত আকারে বহুবিবাহ অনুমোদন করে। একজন ব্যক্তি বিশেষ শর্তাধীনে একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখতে পারে। স্ত্রীদের মর্যাদানুযায়ী ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীর থাকতে হবে। স্বামী সব স্ত্রীকে সমান ভালোবাসা ও স্নেহ দেবে এবং সবার প্রতি সমদর্শী হবে। এ ধরনের নির্দেশনাবলি কার্যকর করার পদ্ধতির অভাবে স্ত্রীরা সাধারণত স্বামীর অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

১৯৬১ সালের পারিবারিক অধ্যাদেশ সালিস পরিষদ ও স্ত্রী/স্ত্রীদের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত বর্তমান বিবাহ বিদ্যমান থাকায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো বিবাহের চুক্তি নিষিদ্ধ করে। আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তি হিসেবে রয়েছে তাৎক্ষণিক পুরো দেনমোহর বা মোহরানা পরিশোধ। স্ত্রীর চাহিদানুযায়ী তলবি মোহরানা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ এবং স্থগিত মোহরানা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় পরিশোধ করতে হয়। আইন-লঙ্ঘনের জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুইই। কিন্তু এ অধ্যাদেশে পরবর্তী বিবাহ অবৈধ ঘোষণার কোনো বিধান নেই।

মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়: ক. আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে; খ. ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ অনুযায়ী স্ত্রীর অনুরোধে আদালতের ডিক্রি অনুসারে; গ. কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের অধ্যাদেশে সাক্ষীদের সম্মুখে বিবাহ বিচ্ছেদের অভিপ্রায় প্রকাশের ও প্রত্যাহারাতীত তালাক সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া সংশোধিত হয়। তালাক তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে না। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি ও বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হওয়ার ৯০ দিনের ব্যবধান থাকতে হবে।

মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক কাবিন রেজিস্ট্রির সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করলে কেবল মুসলিম নারী ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পায়। মুসলিম আইন অনুসারে মৃত স্বামীর সগোত্রীয় উত্তরাধিকারী থাকলে স্ত্রী সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে এক-অষ্টমাংশ পেয়ে থাকে আর সে-রকম উত্তরাধিকারী না থাকলে পায় মৃত স্বামীর সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ।

একমাত্র কন্যা মৃত পিতা বা মাতার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পুত্র ছাড়া একাধিক কন্যা থাকলে কন্যারা যৌথভাবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী। যদি সেখানে কোনো পুত্র (বা পুত্ররা) থাকে, তাহলে কন্যা অথবা প্রত্যেক কন্যার অংশ হবে পুত্র বা পুত্রদের অংশের অর্ধেকের সমান।

মা সাত বছর বয়স পর্যন্ত পুত্রসন্তানদের ও কন্যাসন্তান সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তাদের যত্ন ও অভিভাবকত্বের অধিকারী। মুসলিম আইন অনুসারে মা কখনো সন্তানদের অভিভাবকত্বের অধিকারী নয়। এটা পিতার ওপর এবং তারপর তার পিতা ও ভাইদের ওপর ন্যস্ত থাকে।

১৮৯০ সালের প্রতিপাল্য ও অভিভাবকত্ব আইনে পিতা-মাতার অধিকারের চেয়ে সন্তানদের কল্যাণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। একজন মায়ের কাছে নির্ধারিত বয়সের পরেও সন্তানরা থাকতে পারে, যদি আদালত সন্তোষজনকভাবে মনে করেন যে সন্তানরা পিতার কাছে যথেষ্ট যত্ন পাবে না। মা আদালতে সন্তানদের অভিভাবকত্ব দাবি করে আবেদন করতে পারে। পিতা বিশেষ পরিস্থিতিতে সন্তানের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে; কিন্তু মায়ের সেই অধিকার নেই, এমনকি সন্তানের অভিভাবকত্ব পেলেও মা আদালতের পূর্বানুমতি ছাড়া তা পারে না। একজন মুসলমান মা আর্থিকভাবে সচ্ছল পুত্রের কাছ থেকে নিজ ভরণপোষণ লাভের অধিকারী।

প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, গ্রামের অধিকাংশ বিবাহ রেজিস্ট্রি করা হয় না। আবার বাল্যবিবাহ নিরোধের আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ১৮ বছরের অনেক কম বয়সী মেয়েদেরও বিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে জন্মনিবন্ধীকরণ চর্চার অভাবে এ আইনটি বাস্তবায়ন যথেষ্ট কঠিন। ধর্মীয় বিধি অনুসারে মোহরানার ব্যবস্থা থাকলেও খুব কম ক্ষেত্রেই তা পরিশোধ করা হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্বের মতো ব্যক্তিগত বিষয় হিন্দু ব্যক্তি আইন ১৯৪৭ থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে। হিন্দু ধর্মমতে বিবাহ চুক্তি নয়, বরং একটি অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় বিধান। একজন হিন্দু পিতার প্রধান কর্তব্য হলো কন্যার বিবাহ। হিন্দু ধর্মের বিবাহে মেয়ের সম্মতি নিষ্প্রয়োজন, বিবাহ বিচ্ছেদযোগ্য নয় এবং বহুবিবাহ অনুমোদিত। পিতা যেখানে সর্বদাই সন্তানদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী, সেখানে মাতা অভিভাবক হতে পারলেও তার অধিকার পিতার চেয়ে কম। সব কন্যাসন্তান উত্তরাধিকার বিষয়ে সমানাধিকারী নয়। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবিবাহিত ও বিবাহিত সপুত্রক কন্যারা উত্তরাধিকারী হতে পারে। সন্তান ধারণের ক্ষমতার বয়স অতিক্রান্ত এমন বিবাহিত কন্যা বা পুত্রহীনা বিধবা কন্যারা উত্তরাধিকারী হতে পারে না। হিন্দু আইনে দত্তক অনুমোদিত, তবে শুধু ছেলেরাই দত্তক হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন একটি বড় সমস্যা। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই নারী নির্যাতন সবচেয়ে বেশি। শতকরা ১৪ ভাগ মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে নারীর প্রতি সহিংসতার মাধ্যমে। এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে অহরহ। নারী নির্যাতনের প্রধান ক্ষেত্র— ১. লিঙ্গ নির্যাতন, ২. ধর্ষণ, ৩. জখম ও হত্যা, ৪. মেয়েশিশু/ভ্রূণ হত্যা, ৫. ফতোয়া, ৬. যৌতুক, বিয়ে বা তালাকের কারণে জখম ও হত্যা, ৭. ব্যভিচার, ৮. পতিতাবৃত্তি ও ৯. নারী পাচার। এখন যৌতুকপ্রথা চালু রয়েছে। যৌতুক পরিশোধ না করায় প্রায়ই অনেক মহিলার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে নারীরা পুরুষের আজ্ঞাধীন। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও অন্যান্য উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা সংগঠনগুলোর দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে সরকার নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে বেশ কিছু ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন— ১. লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন, ২. মহিলা সহায়তা কর্মসূচি প্রকল্পের আইনগত সহায়তা, ৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল থেকে আইনগত

সহযোগিতা, ৪. নির্যাতিত নারী ও শিশু আবাসন ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে নির্যাতিত নারী ও শিশুকে আশ্রয়, চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দান, ৫. নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাকরি বিনিয়োগ তথ্যকেন্দ্র, কম্পিউটার অপারেটিং কোর্স, শর্টহ্যান্ড, টাইপ রাইটিং ও বিভিন্ন কোর্স প্রদান; যা নারীদের চাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ব্রিটিশ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) প্রথম দিকে আইনগতভাবেই উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে মহিলাদের প্রবেশের সুযোগ ছিল না। চিকিৎসা শিক্ষা এবং ডাক ও তার বিভাগের পদগুলোতে তাদের নিয়োগ করা হতো। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে অবস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে গৃহীত নিয়োগবিধি হিসাব ও নিরীক্ষণ সার্ভিস, সামরিক হিসাব সার্ভিস, আয়কর সার্ভিস, ডাক বিভাগীয় সার্ভিসসহ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের চাকরিতে মহিলাদের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক কোনো সার্ভিস, যেমন–সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) এবং পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) ইত্যাদিতে যোগদানের অযোগ্য বিবেচিত হতো।

১৯৭২ সালে মহিলাদের জন্য প্রথম যথাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছিল—তবে তা কিছুটা পরিবর্তন করে কার্যকর হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। আদেশটিতে সব শ্রেণীর শূন্য পদে মৌলিক যোগ্যতাপূরণসাপেক্ষে মহিলাদের জন্য শতকরা ২০ ভাগ পদ সংরক্ষণের জন্য বিধি সংযোজিত হয়। বর্তমানে মেধাভিত্তিক নিয়োগের অতিরিক্ত গেজেটেড পদগুলোর ১০ শতাংশ এবং নন-গেজেটেড পদগুলোর ১৫ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এবং তা সব সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদের শতকরা ৬০ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখারও একটি বিধান রয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের সাধারণভাবে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা, তৃতীয় শ্রেণীর নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে মহিলাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব দেখা গেলেও প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে তা দেখা যায় না। অতি সীমিতসংখ্যক নারী নিয়োজিত আছে সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ স্তরে।

মহিলা অধিদপ্তর বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় এবং ১৩৬টি থানায় শাখা খুলেছে। জাতীয় নারী সংস্থা ২৩৬টি থানায় শাখা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে। সরকার কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, বস্তিবাসী নারীদের সহযোগিতা, কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন, স্বতন্ত্র মহিলা বাস সার্ভিস চালু, সরকারি চাকরিতে নারী কোটা সংরক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, শহর ও গ্রামীণ নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও নারীসমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশে নারীশ্রমশক্তির পরিমাণ প্রায় ২৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ১০ হাজার জন নিয়োজিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পেশায়। প্রায় ৭৯ শতাংশ নারী কাজ করে

কৃষি খাতে (মৎস্য ও বনায়নসহ), ৯ দশমিক ৯ শতাংশ নারী কাজ করে ম্যানুফ্যাকচারিং ও পরিবহন খাতে, ২ দশমিক ২ শতাংশ নারী বিপণন শ্রমিক ও ০ দশমিক ৬ শতাংশ নিয়োজিত করনিক পর্যায়ের কাজে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৩৪ শতাংশ হচ্ছে নারী। শহরকেন্দ্রিক শ্রমনির্ভর শিল্প, বিশেষত পোশাকশিল্পের ৮০ শতাংশ কাজ তারা করে।

শিক্ষার অভাবে এবং চলাফেরায় সামাজিক বাধানিষেধের ফলে অধিকাংশ নারীই নিজেদের ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। অন্য সব যোগ্যতা থাকলেও নারীরা প্রায়ই ব্যবসায়িক উদ্যোগে ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ পায় না বা পুঁজির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। নারী উদ্যোক্তারা যদি অপেক্ষাকৃত বড় কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করতে চান, তাহলে তাঁদের পুরুষের সঙ্গে যুক্তভাবে তা করতে হয়। পুরুষেরা নারী উদ্যোক্তাদের গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চায় না। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণেও নারী উদ্যোক্তারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা বা দরকষাকষিতে যেতে আগ্রহী হন না।

বাণিজ্যিক ও সেবা খাতে নারীদের গৃহীত উদ্যোগের সংখ্যা বাড়ছে। বড় বড় শহরে এখন নারীদের মালিকানায় পরিচালিত অনেক বুটিক, বিউটি পারলার, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি দেখা যায়। নারী স্থপতি ও প্রকৌশলীদের অনেকেই এখন নিজেরাই কনসালটিং ব্যবসা শুরু করছেন। মনোহারি দোকান, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, কোল্ড স্টোরেজ সেবা, ভ্রমণ ও বিজ্ঞাপনী সংস্থার মতো নানা ধরনের ব্যবসা নারীরা চালাচ্ছেন। অনেক নারী উদ্যোক্তা বিদ্যালয়, বিশেষত ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়, টিউটোরিয়াল স্থাপন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে নারীরা হস্তশিল্প ব্যবসাকে প্রাধান্য দেয় বেশি। তাঁদের শহরে কর্মজীবী হিসেবে নারীরা যুক্ত আছে বিপণিকেন্দ্র, অভ্যর্থনা ডেস্ক, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, শিক্ষকতা ও স্বাস্থ্য বিভাগ, শিল্পকলা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোতে।

ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারে সামর্থ্য সৃষ্টিতে সহায়তা জোগানোর উদ্দেশ্যে সরকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরি করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসরণে অনেক এনজিও এখন নারী উদ্যোক্তাদের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে, যদিও তাদের সহযোগিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। নারী উদ্যোক্তারা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় বাজারগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য দুধ, ডিম, হাঁস-মুরগি, হস্তশিল্পজাত পণ্য, তৈরি খাদ্য, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাজার গড়ে উঠছে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে নারীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিকাশ লাভ করছে।

প্রথম সাময়িকী পাক্ষিক *বঙ্গমহিলা* মোক্ষমদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত ১৮৭০ সালের ১৪ই এপ্রিল। ১৮৭৫ সালের জুলাইয়ে প্রথম মাসিক সাময়িকী *অনাথিনী* মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহিলা কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন *বঙ্গবাসিনী* প্রকাশিত হয়। বেগম সুফিয়া খাতুন কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম মাসিক ম্যাগাজিন *অন্বেষা* সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। বিভাবতী সেন কর্তৃক সম্পাদিত *পাপিয়া* নামক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। বেগম শামসুন্নাহার ও মোহাম্মদ হাবিবুল্লা সম্পাদিত

বুলবুল-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৬ সাল থেকে এটি মাসিক ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুলাই প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন *বেগম* প্রকাশিত হয়। নূরজহান বেগম ও সুফিয়া বেগম এটি সম্পাদনা করেন। প্রকাশনার দ্বাদশ সংখ্যা থেকে নূরজাহান বেগম এককভাবে এর সম্পাদনা করেন।

পূর্ব বাংলার প্রথম নারী সাময়িকী *বঙ্গনারী* ১৯২৩ সালে চিন্ময়ী দেবীর সম্পাদনায় ময়মনসিং থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে উর্মিলা সিনহা কর্তৃক সংম্পাদিত *ত্রিপুরা হিতৈষী* প্রকাশিত হয় কুমিল্লা থেকে। ১৯২৭ সালে বিভাবতী সেন কর্তৃক সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *পাপিয়া* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালে এটি মাসিক ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত হয়।

লীলাবতী নাগ সম্পাদিত সচিত্র মাসিক *জয়শ্রী* ১৯৩১ সালের এপ্রিলে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারি প্রধান সম্পাদক কলমবাসিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত পাক্ষিক *আশ্রমী* প্রকাশিত হয় রংপুর থেকে। ১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজুর সম্পাদনায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রথম মহিলাবিষয়ক সাপ্তাহিক *সুলতানা* প্রকাশিত হয়। মাহফুজা খাতুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে *নওবাহার* প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। কুমারী জ্যোৎস্না রানী দত্তের মাসিক সাময়িকী *মানসী* ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় পাবনা থেকে।

সাংবাদিকতায় খ্যাতিমানদের মধ্যে লায়লা সামাদ, নূরজাহান বেগম, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী, মাহফুজা খাতুন, হাসিনা আশরাফ, সেলিনা হোসাইন, বেবী মওদুদ ও তাহমিনা সাঈদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে অনেক শিক্ষিত মহিলা পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিচ্ছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেডিও এবং টেলিভিশনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার সংবাদপত্রের তুলনায় বেশি।

নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসে মুসলিম দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে, ভারত ও পাকিস্তানেরও ওপরে। বাংলাদেশে ৬৩% স্বামী স্ত্রীকে পেটায়। মামলা করতে রাজি মাত্র ২৭% নারী।

রাজনীতিতে নারী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের অগ্রগতি হয়েছে চারটি পৃথক স্তরে: ১. নেতৃত্বের পর্যায়, ২. কোটা পদ্ধতি, ৩. নির্বাচনী রাজনীতি এবং ৪. নারী আন্দোলন।

পাকিস্তানের গণপরিষদে মাত্র দু'জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৫ সালের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজ কমিটির কাছে আইনসভায় ১০ ভাগ মহিলা কোটা সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়। কিন্তু সেখানে মাত্র তিন ভাগ কোটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও পরিধি অনেকটা বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের দ্বৈত ভোটের অধিকার তথা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রদান এবং সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় ভোটাধিকারের

সুযোগ দেওয়া হয়। পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে তিনজন মহিলা নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত করে। ১৯৭৯ সালে নারী দশকের প্রভাবে এ আসনসংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে পুনরায় ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ২০০১ সালে শেষ হওয়ার পর সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বর্ধিত করা হয়নি। চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০০৪ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা ৪৫ করা হয় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য। নতুন বিধান অনুসারে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

১৯৪৬ সালে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। সেখানে নারীদের মনোনয়নের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথমবারের মতো নারীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করে। তখন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকে সম্পত্তির মালিকানা, খাজনা প্রদান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ভোটদানের যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। স্বাধীনতার পর এ দেশের ইতিহাসে প্রথম স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা লাভ করে। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৭৩ সালে একজন, ১৯৯৩ সালে ২৪জন এবং ১৯৯৭ সালে ২০জন। ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশে মহিলা সদস্য মনোনয়নের বাধ্যতামূলক বিধান রাখা হয়। অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন দানের ক্ষমতা অর্পিত হয় উপজেলা পরিষদের ওপর এবং উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দানের এখতিয়ার থাকে সরকারের। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে এক সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১০০ মহিলা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বর্তমানে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপারসন রয়েছেন ২০জন। ১৬ই জানুয়ারি ২০০৩ পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নারায়ণগঞ্জের ডা. সেলিনা হায়াত আইভি।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মহিলাদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়। সর্বমোট ২০জন মহিলা সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পাঁচটি আসনে নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৪৭জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত হন মাত্র আটজন। ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাসহ সাতজন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হন। বর্তমানে নির্বাচনী রাজনীতির প্রধান ধারায় নারীদের অংশগ্রহণের হার ১ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১৯৭৩ সালের ০ দশমিক ৩ শতাংশের তুলনায় তা এক বড় অগ্রগতি। দুটি বড় দলের নেতৃত্বে মহিলা থাকা সত্ত্বেও দেশের নির্বাচনী রাজনীতির মূলধারায় নারীদের ভূমিকা এখনো নগণ্য।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৩জন প্রেসিডিয়াম সদস্যের মধ্যে তিনজন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৬৫জনের মধ্যে তিনজন হচ্ছেন নারী। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে মাত্র একজন এবং ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১১জন নারী আছেন। জামায়াতে ইসলামীর মজলিশ-ই-শুরা এবং মজলিশ-ই-আমেলাতে কোনো নারী নেই।

সন্ত্রাস, ধর্ষণ, যৌতুক ও ফতোয়ার কারণে মৃত্যু, এসিড নিক্ষেপ এবং এ ধরনের যেসব কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজে নারীরা অসহায়, ক্ষমতাহীন ও অরক্ষিত অবস্থায় নিপতিততার বিরুদ্ধে নারী সংগঠনগুলো শহর ও গ্রামে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। ১৯৯৫ সালে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি নারী সংগঠনগুলোই গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তারামন বিবি বীর প্রতীক, কাঁকন বিবি, রহিমা বেগমদের মতো অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করে ও আথিত্য প্রদান এবং তথ্য সরবরাহ করেও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অগণিত মহিলা।

পাকিস্তানিসেনা কর্তৃক ধর্ষিত প্রায় দুই লাখ নারীকে তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতিতে সরকারিভাবে বীরাঙ্গনা উপাধি দেওয়া হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তাঁদের অধিকাংশই বীরাঙ্গনা উপাধি ধারণ করেননি। ধর্ষিত মহিলাদের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুদের অধিকাংশ ধর্ষিত মাতা বিদেশিদের হাতে তুলে দেন দত্তক শিশু হিসেবে।

বর্তমানে নারীর অবস্থান আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। তার স্বেচ্ছার, তার বেছে নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মত দেওয়ার ও গ্রহণ করার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, নব আলোকপ্রাপ্তি, বিবেকের তাড়না, শিক্ষা এবং নারীবাদী আন্দোলন—এসবের প্রভাব এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১লা জানুয়ারি ২০০৩ চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ১৮৩তম বিশেষ কোর্সের এবং ৪৭ তম লংকোর্সের জেন্টলম্যান ক্যাডেটদের কমিশনের সময় দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ১২০জন পুরুষ ক্যাডেটের পাশাপাশি ২০জন মহিলা ক্যাডেট সাফল্যের সঙ্গে কমিশন পান।

চাকরিতে নারীর পারিশ্রমিক, বেতন ও সুবিধাদির ব্যাপারে বৈষম্য দেখা যায় প্রায় সর্বত্র। অনুন্নত দেশে সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশেও সমসুযোগের কমিশনের তদারকি ও আইনে অধিকতর কার্যকর বিধিব্যবস্থা ও আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও নারী এখনো বৈষম্যের শিকার, যেমন শিকার যৌননিপীড়নের।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় নারীর একাধিক গর্ভধারণের তেমন প্রয়োজন নারী নিজেও দেখে না। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছার যে সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে নিজের অবস্থান নির্বাচনে নারীদের পক্ষে বড় সহায়ক হয়েছে। আবার, ইলেকট্রনিকসের ব্যবহারে দৈনন্দিন কর্মে নারীর স্বাধীনতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তার কর্মনৈপুণ্য উৎকর্ষ লাভ করেছে। সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণে নারীর ভূমিকা আগের চেয়ে আজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০শে মার্চ ১৯৯১ সাল থেকে দেড় দশকেরও অধিক কাল ধরে দেশে নারী সরকারপ্রধানের শাসন চলে। বাংলাদেশে পুরুষকণ্ঠে একাধিকবার খেদোক্তি

শোনা গেছে, 'নারী নেতৃত্বের জন্যই দেশের ওপর গজব পড়েছে, তাই আমাদের এত দুর্দশা!'

মাঝে দুই দফায় নির্বাচনের প্রাক্কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করেছে। মহিলা সরকারপ্রধানের আমলে মহিলাদের নানাভাবে কিছুটা ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহ দান এবং এসএসসি পর্যন্ত বিনাবেতনে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিধবা ও বৃদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে যেসব শুভ পরিবর্তন ঘটেছে, তার বেশ কিছু কৃতিত্ব নারীর। দেশের পশ্চাৎপদতা ও ধার্মিকতার কারণে এ ব্যাপারে যাঁরা নৈরাশ্য পোষণ করতেন, তাঁদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল হয়েছে ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। নারীরা প্রাসঙ্গিক নতুন তথ্যাদি বেশ সহজেই গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটা সমতা এসেছে।

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনের ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশে যে আলোচিত হয়, তাও দেশের নারীদের বদৌলতে। দেশের অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে কৃষি খাত ছাড়া বেশির ভাগ খাতেই পুরুষের চেয়ে নারীদের অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি খাতেও ঘরে থেকে কৃষকেরা গৃহিণীদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহায়তা পায়, তাকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের এখনো ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের ন্যায্য পাওনা পায় না। এ ব্যাপারে উন্নত দেশেও সমসুযোগের কমিশনারদের সামনেও বহু লিঙ্গবৈষম্যের মামলা রয়েছে। নারীর আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। তবে বড় ধীরগতিতে। শিশুর পরিচয়ে মায়ের নাম উল্লেখ থাকছে। দেশের প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখনো অতি সামান্য।

নারী ও পুরুষের মধ্যে অবয়বগত পার্থক্য ও বিশিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে মানবসত্তার সাদৃশ্য রয়েছে, তার প্রতি মর্যাদা দেওয়ার প্রসঙ্গেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এবং নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসানের দাবি উঠেছে। পুরুষ মানুষের মধ্যে যেমন নারী মানুষের মধ্যেও তেমনি অশেষ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব। নারী-পুরুষের ভূমিকায় চিরাচরিত যে চিত্রকল্প ছিল, তার পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষকে আজ শিশুপালন ও সংসার দেখাশোনায় দীক্ষা নিতে হচ্ছে। আজ নারী অধিকারের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি আমরা লক্ষ করি, তার পেছনে পুরুষ মিত্রপক্ষেরও অবদান রয়েছে। পুরুষ নারীর শত্রুপক্ষ নয়।

জাতিসংঘ নারী দশক (১৯৭৫-৮৫) তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে, যা ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আয়োজিত সম্মেলনে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৯ সালে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত কনভেনশন (সিইএফডি), মেক্সিকো (১৯৭৫), নাইরোবি (১৯৮৫) ও বেইজিংয়ে (১৯৯৫) অনুষ্ঠিত তিনটি বিশ্ব সম্মেলন বাংলাদেশে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নারীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আশির দশকের শেষ দিকে প্রায় ২০টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ সুদূরপ্রসারী ১৭ দফা দাবিনামা উপস্থাপন করে। এসব দাবির

মধ্যে ছিল সমঅধিকার, সিইডিএডব্লিউ কনভেনশনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, অভিন্ন দেওয়ানি আইন, সরকারি চাকরিতে কোটা বৃদ্ধি, গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকদের জন্য পুরুষের সমান পারিশ্রমিক, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ মাতৃত্ব ছুটির মতো আইএলও (ILO) কনভেনশনে নির্ধারিত বৈধ অধিকারের বাস্তবায়ন, ভূমিহীন ও শহরের নিঃস্ব নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গৃহপরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ।

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে। প্রধান দায়িত্ব মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

আজ সাংবিধানিক পদে বহু নারী অধিষ্ঠিত। সরকারপ্রধান, বিরোধী দলের নেত্রী, সুপ্রিম কোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সচিবালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে নারী আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ অর্জন করেছে।

মহিলাদের ওপর যেভাবে এসিড নিক্ষেপ করা হয়, তা দেশের জন্য এক বড় কলঙ্ক। পুলিশের এক হিসাবে দেখা যায়, দেশে প্রতিদিন ১০জন মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে। পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে আজ বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো নানাভাবে সীমাবদ্ধ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য এখনো বিসদৃশ্যভাবে বিদ্যমান।

অতীতে যেকোনো সমাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলাদের একটা ভূমিকা ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলার ভূমিকার ওপর বিশেষভাবে যে গুরুত্ব অর্পণ করা হচ্ছে তার কারণ, অনুন্নয়ন থেকে উন্নয়নে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপারে নারীর সক্রিয় ও অগ্রণী অংশগ্রহণ আজ একেবারে অপরিহার্য।

যে সমাজে জনসংখ্যা ও শিশু মৃত্যুর হার বেশি, শিক্ষার হার কম, জীবনে প্রত্যাশা কম এবং সম্পদের বন্টন নেই বললেই চলে, সেখানে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। এসব কারণ বা উপসর্গ দূরীকরণের ক্ষেত্রে নারীর একটা অনুঘটক ভূমিকা রয়েছে। শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর হার কমাতে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে নারী জাগরণের ফলে উভয় ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কৃষিকর্ম, উদ্যান পালন, বস্ত্রায়ন ইত্যাদি সাংসারিক অর্থকরী কর্মে নারীদের চিরাচরিত ভূমিকা গত ২০০ বছরে বেশ বদলে গেছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আজ নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তা ১০০ বছর আগে অচিন্তনীয় ছিল। বিবাহিত মহিলার বাইরে চাকরি নেওয়াটা আজ শুধু গ্রহণযোগ্য নয়, অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত জীবনের মান ও আকর্ষণীয় ভোগ্যপণের চাহিদা মেটাতে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীকেও কাজ করতে হচ্ছে। স্বীয় অর্জনের ফলে পরিবারে স্ত্রীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অসুখী দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবন গড়ে তোলারও সুযোগ পাচ্ছে স্বয়ম্ভর মহিলারা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শরিকানায় সুফল লাভের ফলে মহিলারা শিক্ষায় ও জ্ঞানভিত্তিক পেশায় অধিকতর অংশগ্রহণ করছে।

তৈরি পোশাকশিল্পে আজ প্রায় ১৩ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৯০ শতাংশই মহিলা। এই শিল্প থেকে যে আয় হয় তা মোট রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশ। আজ নারীর উপার্জনে বহু পরিবার স্বচ্ছল হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসারের আয়ের এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত আসছে তৈরি পোশাকশিল্পের উপার্জনে।

নারীবিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের নিরীক্ষা ও গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেনস্ স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। নারীশিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষার হার শুধু নারীর ক্ষেত্রে নয়, পরিবারের শিশুদের শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো করছে। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বোঝায় এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে পশ্চাদপদতার অবসান ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভাবী পরিকল্পনা।

অতীতে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং সমতার অভাব নিয়ে তেমন গুরুতর প্রশ্ন ওঠেনি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ছিল প্রাণকেন্দ্র, সম্পত্তি ও সিদ্ধান্তের অধিকারী। আমাদের দেশে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব কিছু কিছু আদিবাসীর মধ্যে এখনো বিদ্যমান। গারো পুরুষ কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না—এমন রায় দিয়েছেন আমাদের উচ্চ আদালত। সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মাতৃতান্ত্রিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মানব সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতার যে বিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা বর্তমানকালে এক মানবতান্ত্রিকতায় উপনীত হয়েছে। এই মানবতাবাদী সমাজে নারী-পুরুষের সমতার দাবিতে কর্মের শ্রেণী বিভাগ দিনে দিনে দূরীভূত হচ্ছে।

৮ই মার্চ ২০০৮—এ যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয় সেখানে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, নারীদের জন্য সংসদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ ভোটের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই নীতির বিরুদ্ধে বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২৭শে মার্চ ২০০৮ ওই মসজিদের ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি মুহাম্মদকে সভাপতি করে সরকার ২০ সদস্যের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি নারীনীতির পাঁচটি অনুচ্ছেদ বিলোপ, বারোটি সংশোধন ও দুটি অনুচ্ছেদের সংশোধন সুপারিশ করেন। সম অধিকারের পরিবর্তে ন্যায্য অধিকার প্রতিস্থাপিত হতে হবে। ওই কমিটিতে কোনো নারী সদস্য ছিলেন না বিধায় নারীপক্ষ ওই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করে। ১৮ই এপ্রিল ২০০৮ দেশের প্রত্যেকটি মসজিদে ১৮৮ ইমাম সাহেব সুপারিশের পক্ষে মন্তব্য করেন। সরকারের কথা, কোরান সুন্নার পরিপন্থী কোনো আইন হবে না। ২২শে এপ্রিল ২০০৮ 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' শীর্ষক এক আলোচনায় প্রথমবারের মতো আলেমদের একাংশ বলেন,' কোরান বিরোধী কোনো ধারা নারী নীতিতে নেই।' মওলানা জিয়াউল হাসান বলেন, নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অর্ধেকের কথা বলা হলেও তার অধিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোরানে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান জগতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে যখন নারী পুরুষের মতো সমান দক্ষতায় তার কর্তব্যকর্ম সমাধা করতে পারছে তখন কোন মুখে পুরুষ তার এক কাঠি অতিরিক্ত কর্তৃত্বের কথা দাবি করবে?

অর্থনীতি

বাংলাদেশকে নিয়ে দেশে-বিদেশে বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে গবেষণাযজ্ঞ চলছে, তা কখনোসখনো আমাদের বিভ্রমের সৃষ্টি করে। পরিসংখ্যান, রেখাচিত্র ও নানা সারণির মধ্যে আমরা ধান্ধায় পড়ি। গণনযন্ত্রের সাহায্যে দেশের যে ভবিষ্যৎ গণনা হয়, তার সঠিকতা সম্পর্কে কেউ নিশ্চয়তা দান করবে না। সেই ভবিষ্যৎ গণনার ওপর নির্ভর করে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেউ আমাদের হিসাব বা ক্ষতিপূরণ দেবে না। এ ব্যাপারে অতীতের ইতিহাস বড় দ্ব্যর্থবোধক, আশাব্যঞ্জক নয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো যে হারে আগে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছিল দাতাগোষ্ঠীদের তদারকিতে সে হার অনেক নিচে নেমে যায়। ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০০১ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল বারকাত বলেন, 'গত তিন দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ঋণ-অনুদান হিসেবে আনুমানিক এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য এসেছে। এর ৭৫ ভাগ নানাভাবে লুট হয়েছে। সেই ৭৫ ভাগের ২৫ ভাগ বিদেশি কনসালট্যান্সির নামে, ৩০ ভাগ আমলা, রাজনীতিবিদ কমিশন এজেন্ট, স্থানীয় পরামর্শক ও ঠিকাদার এবং ২০ ভাগ গ্রাম ও শহরের উচ্চবিত্তদের সাহায্যে ব্যয়িত হয়েছে।'

১৩ই আগস্ট ২০০৩ বিআইআইএসের রজতজয়ন্তী বক্তৃতায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জোসেফ ই স্টিগলিজ বলেন, 'বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, অথচ এরাই ঝুঁকি মোকাবিলায় সবচেয়ে কম প্রস্তুত। কারণ, তাদের কথা শোনার কেউ নেই। বরং আইএমএফ এদের ঝুঁকিকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে ভুল পরামর্শ চাপিয়ে দিয়ে সংকটকে তীব্র করে তোলে। বিশ্বায়ন অর্থনীতিতে গতিশীল করে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারে, তবে তা আইএমএফের পরামর্শ বা নীতিমালার মধ্যে নয়।' যেসব দেশ নিজের মানুষ ও মাটি এবং জলবায়ুকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে নিজেরা তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে, তাদের উন্নয়নের হার তুলনামূলকভাবে ভালো।

বাংলাদেশের এ অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ সম্পর্কে নানা ধরনের তত্ত্ব পেশ করা হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে বাংলাদেশের মানুষ নতুনকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে। সে নতুন বীজ, সেচ বা ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিই হোক বা কর্মক্ষেত্রে অধিকতর নারীর অংশগ্রহণই হোক। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা, তারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিকতর সম্পৃক্ততা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ঋণগ্রহীতা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে নারীদের অবস্থান এবং তৈরি পোশাকশিল্পে নারীশ্রমিকদের অধিকতর অংশগ্রহণ দেশের অর্থনৈতিক আবহাওয়া বদলে দিয়েছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানিলন্ডারিং বা টাকা ধোলাইবিরোধী আইন দেশে ও বিদেশে কার্যকর হওয়ার পর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে হুণ্ডি প্রবণতা কমেছে।

বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০০-২০০১ সালে দেখা যায়, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য অনেক কমে গেছে। পাকিস্তানের তথাকথিত উন্নয়নের দশকে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল, ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ তা সম্পূর্ণ দূর করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্তরের দশকে তিন শতাংশ, আশির দশকে চার শতাংশ এবং নব্বইয়ের দশকে পাঁচ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে দেশে এক শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যবিমোচনে দেশের এই যে অগ্রগতি, এটা সম্ভব হয়েছে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সংস্কারের বদৌলতে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটকথা, প্রায় আড়াই দশক ধরে জাতীয় আয় বছরে শতকরা চার থেকে পাঁচ ভাগ হারে বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার বেড়েছে শতকরা দেড় ভাগ থেকে সাড়ে তিন ভাগ। তবে এ প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার তুলনায় যথেষ্ট নয় এবং দেশের প্রত্যাশার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। অর্জনযোগ্য সর্বাধিক উন্নয়নের হারের অনেক নিচে আমাদের প্রকৃত উন্নয়নের হার। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের স্বল্পতা, রাজস্ব আদায়ের স্বল্পতা এবং দুর্বল অবকাঠামো হচ্ছে অর্থনৈতিক অসাফল্যের মূল্য কারণ। তৈরি পোশাকনির্ভর রপ্তানি আয় প্রধানত সংরক্ষিত বাজারে বিক্রি হয়। দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও পরিবেশদূষণ এখনো ব্যাপক।

একসময় বলা হতো দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা অর্ধেক হ্রাস করতে হলে কমপক্ষে প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশ অর্জন করতে হবে। ২০০৭ সালে প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ অর্জন করার পর এখন বলা হচ্ছে, সে হার সাড়ে সাত শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাব। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা অর্ধেক নামিয়ে ২৬ দশমিক পাঁচ শতাংশ করতে হলে কৃষি খাতে চার শতাংশ এবং অকৃষি খাতে সাত শতাংশ হারে উৎপাদন বাড়াতে হবে। ২০০৭ সালে কৃষি উৎপাদনের হার ছিল তিন দশমিক ১৮ শতাংশ। ৮০ শতাংশ দরিদ্রের মধ্যে ৫৩ শতাংশই গ্রামের মানুষ, যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। কৃষি ও গ্রাম – এই দুই খাতে চরম অবহেলা ও কম বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

২০০৭ সালের আগস্টে বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান ভারতের পরে। ১৯৯১ সালে যেখানে ৫৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল এবং তা ২০০০ সালে ৪৯ শতাংশে নেমে আসে এবং সে হার ২০০০-২০০৫ সালে আরও কমে ৪০ শতাংশে স্থির হয়ে আছে।

খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশে বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার যে অভিযোগ রয়েছে, তা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা হচ্ছে।

বিশ্বের প্রথম পাঁচ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। রপ্তানি আয়ের হিস্যা হিসেবে বার্ষিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বাংলাদেশে সব উন্নয়নশীল দেশের গড়

হারের ২০ দশমিক এক শতাংশ, অর্ধেকের চেয়ে কম। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। বাংলাদেশের দেউলিয়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক সচেতনতা বেড়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতি হচ্ছে। দেশে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিনির্ভরতা অতি সামান্য হলেও হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ পরিবারের উপার্জনকারীদের ৫২ শতাংশ আজ অকৃষি কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৮৭-৮৮ সালে সে হার ছিল ৩৭ শতাংশ। কৃষিভিত্তিক বৃত্তি ১৬ শতাংশ কমেছে। কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা অর্ধেক কমেছে। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যান্ত্রিক চাষ, যান্ত্রিক সেচ, রাস্তাঘাট, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক ও পেশাগত চলমানতা নতুন চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থানে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। ওর স্যালাইন সামান্য জিনিস, কিন্তু জনস্বাস্থ্যে তার ব্যাপক সুফল ঘটেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের যে সমালোচনাই হোক না, তাকে অবজ্ঞা করা যাবে না। বাংলাদেশে যাতায়াতের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। নেত্রকোনার হাওর অঞ্চলে ডুবোসড়ক নির্মিত হয়েছে, যার ওপর দিয়ে বর্ষাকালে নৌযান চলবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সাধারণ যানবাহন চলবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মধ্যমে দেশে নানা ধরনের নতুন শস্য, মৎস্য ও অর্থকরী কৃষির উৎপাদন হচ্ছে। পঞ্চগড়ের আশপাশে যে নতুন চায়ের বাগান হচ্ছে, তা দেশের অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে বলে সবাই আশা করে।

১৯৭৩-৭৪ সালে যখন প্রথম দারিদ্র্যের ওপর জরিপ করা হয়, তখন দেশের শতকরা ৭০জন মানুষকে দু'বেলা পেট পুরে খেতে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হতো। ১৯৯১-৯২ সালে এমন দুস্থ মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫৮ দশমিক আট এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪৯ দশমিক আটে দাঁড়ায়। জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ জরিপে আমাদের দেশের দারিদ্র্যরেখা ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অগ্রগতি অর্থনীতিবিদদের কিছুটা তাক লাগিয়েছে। বিশেষ করে যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বা পাকিস্তানে এমনটি দেখা যায় না। ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশের দারিদ্র্যরেখায় অবস্থান যদিও মোটেই সুখকর নয়, তবু দারিদ্র্যে ক্রমশ হ্রাসের পরিসংখ্যান অত্যন্ত আশাপ্রদ ও সুখকর। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশের ওপরে। অনেক দেশের তুলনায় এটাকে সুখবরই বলতে হবে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রবৃদ্ধির সব সুফল দেশের এক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী একচেটিয়া ভোগ করছে।

১৯৯১-৯২ সালে যেখানে সর্বাধিক পাঁচ শতাংশ ধনী পরিবারের জাতীয় আয়ের অংশ ছিল ১৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ, ২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৬৬ শতাংশে। বর্তমানে সেই হার যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সন্দেহ করার যথার্থ কারণ নেই। এ ধরনের আয়ের বৈষম্য পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রে রয়েছে। বৈষম্য কেবল দারিদ্র্যই সৃষ্টি করে না, এটা দেশের অস্থিতিশীলতাও বৃদ্ধি করে।

ধন বণ্টনের অসমতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি এরশাদের আমলে এক শতাংশ লোক ২৭ ভাগ সম্পদের মালিক ছিল। ২০০৭ সালে এক শতাংশ লোক

৪০ ভাগ সম্পদের মালিক। দুর্নীতি ও বৈষম্য যুগপৎ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবৃদ্ধির বদৌলতে উন্নয়নের গতি চুইয়ে চুইয়ে নিম্নবর্গের দিকে যাবে বলে যে আশা করা হয়েছিল বাস্তবে তেমন দেখা যাচ্ছে না। দেশের সাধারণ মানুষের পোশাক-আশাক, কেনাবেচা ও হাবভাব দেখে মনে হয় দুস্থ মানুষের গায়ে একটু মাংস লেগেছে। সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়, তা থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে চোরাচালান এবং অবৈধ পাচার-ব্যবসার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে টাকা-পয়সার বিনিময় বেড়েছে। গ্রামে টিনের বাড়ি এবং শহরে বহুতলবিশিষ্ট ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দারিদ্র্যের একটি বড় কারণ মূল্যস্ফীতি। কেননা মূল্যস্ফীতিই দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটি বড় উৎস। এতে দরিদ্র লোকজন ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সরকারি হিসাবে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল প্রায় সাত দশমিক সাত শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে তা ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অধ্যাপক আবুল বারকাতের মতে, দেশের অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ঝুড়ি দিয়ে বিচার করলে তা ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে।

খাদ্য-নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান চরম খারাপ অবস্থার খানিকটা ওপরে, কিন্তু গড় মানের নিচে। এ ছাড়া শিক্ষা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিঙ্গবৈষম্য দূর ও পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ রয়েছে গড় মানের নিচে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাত ও শিক্ষায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান গড় মানের ওপরে। তবে নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্যবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে চরম খারাপ অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ।

পৃথিবীর স্বল্প আয়ের দেশগুলো খাদ্যের গড় মাথাপিছু আয় এক হাজার ৫৭৫ ডলারের কম এমন ৬৯টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্যপ্রার্থীর তালিকায় রয়েছে।

২০০৫ সালের আগে পরপর দু'বার মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্টসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েও দুর্নীতির আধিক্যের কারণে চূড়ান্ত নির্বাচনে বাংলাদেশ বাদ পড়ে যায়। যে ৬৯টি দেশের সঙ্গে সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা করে, সেসব দেশ থেকেই গণতান্ত্রিক শাসন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জনকল্যাণে সরকারের ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ১৬টি মানের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয় তার মধ্যে আছে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয়, স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয়, নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি, বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহি, আইনের শাসন, দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তির হার, রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নের হার, সরকারের কার্যকারিতা, ক্রেডিট রেটিং এবং ব্যবসা শুরু করতে কত দিন সময় লাগে। এসব মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচারে এমসিসি বিশ্ব ব্যাংক, ফ্রিডম হাউস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং মনোনয়নপ্রাপ্ত দেশের জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হবে। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের ২০০৬-০৭ সালের দ্য গ্লোবাল কমপিটিটিভ রিপোর্টে বাংলাদেশের বাধা-বিপত্তি আলোচনা করেও জোর দিয়ে বলা হয় যে, দেশে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বর্তমান। ১২৫টি দেশের মধ্যে

ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে বাংলাদেশকে ৯৯তম স্থানে রেখে বলা হয়েছে যে দুর্নীতি, অপ্রতুল অবকাঠামো, অদক্ষ প্রশাসন, অর্থনীতিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ধারাবাহিকতার অভাব, স্বল্প ঋণ প্রবাহ, অপরাধ প্রবণতা, দক্ষ মানবসম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, জটিল কর প্রশাসন এবং অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জন কেবল সময়ের ব্যাপার।

সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশীয় প্রেক্ষাপট, সংবিধান ও সম্ভাবনার আলোকে বাংলাদেশের জন্য একটি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করবে, তার সামর্থ্য ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটবে এবং যেখানে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সন্ত্রাস দমন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ হবে উন্নয়নের মূলমন্ত্র। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করতে ২০০৭ সালে জাতিসংঘ রয়েল টাইগারকে তাদের এমডিজি প্রকল্পের ম্যাসকট বাঘটির নাম রাখা হয়েছে বাঘা। বিশ্ব ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) 'ডুয়িং বিজনেস ইন ২০০৬' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে একটি তুলনামূলক চিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম বলে উল্লিখিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত রয়েছে সবচেয়ে পেছনে ১১৬তম।

২০০৪ সালের তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে বাংলাদেশে আট ধরনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ভারত ও পাকিস্তানে এ সংখ্যা ১১। বাংলাদেশে সব প্রক্রিয়া শেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে লাগে ৩৫ দিন, ভারতে ৭১ দিন। ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য কম সময়ে শুরু করা গেলেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই এর জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে হয়। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে লাইসেন্স পেতে ১৮৫ দিন লাগে, আর সবচেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয় ভারতে, ২৭০ দিন। আর এ জন্য বাংলাদেশে খরচ হয় মাথাপিছু আয়ের ২৯১ শতাংশ, ভারতে ৬৭৮ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ পাকিস্তানে এক হাজার ১৭০ শতাংশ। বাংলাদেশে শ্রম নিয়োগে কোনো অর্থ না লাগলেও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করতে দিতে হয় ৪৭ সপ্তাহের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ।

ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার একটি বড় উপাদান জমি। বাংলাদেশে জমি নিবন্ধনে প্রয়োজন হয় ৩৬৩ দিন এবং খরচ হয় মোট জমির মূল্যের ১১ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাই সর্বোচ্চ। পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করতেও বাংলাদেশে অনেক সময় লাগে। যেমন– আমদানি করতে বাংলাদেশে লাগে ৫৭ দিন, রপ্তানিতে ৩৬ দিন। আমদানি করতে ৩৮টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়, আর রপ্তানিতে ১৫টি।

১৯৮৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক ভেবেছিল ২০০০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা হবে ১৫ দশমিক সাত কোটি, বাস্তবে তা হয়েছে ১২ দশমিক নয় কোটি। সুখবর হলো, শুধু জনসংখ্যার হারই হ্রাস পায়নি, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে অনুন্নয়নের সবচেয়ে বড় সূচক হচ্ছে বেকারত্ব। পৃথিবীর ১৪৩টি দেশে যে জনসংখ্যা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি বেকার রয়েছে বাংলাদেশে।

বিশ্ববাজারের পক্ষে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ যেভাবে ওকালতি করে, সেভাবে কৃষিপণ্যের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর ভর্তুকি প্রদানের বিরুদ্ধে কথা বলে না। আবার আমাদের দেশের যেসব শিল্পক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা আছে বা যেসব জায়গায় সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেখানে যথেষ্ট সাহায্য দিয়ে সেগুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠীর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এশিয়ায় যে স্বল্পসংখ্যক দেশ উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করেছে, তাদের অর্থনীতিক নীতিমালা বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর আশ্রয়ে লালিত হয়নি; বরং দেশের জল-মাটি থেকে তারা পুষ্টি আহরণ করেছে। আমরা বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য যেভাবে হন্যে হই তা বড়ই অসম্মাজনক। বৈদেশিক বিনিয়োগ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের বিকল্প হতে পারে না। বড়জোর তা সম্পূরক বা সহায়ক হতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে বাণিজ্য উদারীকরণ করে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে যে দাবি করা হয়, তা সঠিক নয়। তাদের পরামর্শ সঠিক হলে এত দিনে আমরা কৃষি থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি শিল্পনির্ভর হয়ে যেতাম। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের ভর্তুকি কমানোর পরামর্শ মেনে নিলে কৃষিক্ষেত্রে আমরা বড় বিপদে পড়তাম। ১৯৯৬-২০০১ সালে কৃষিক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ায় আমরা যে সুফল পাই, তা ২০০১-০৬ সালে আমরা কৃষিকে অবহেলার জন্য ধরে রাখতে পারিনি।

২০০১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ইউএনডিপি মানব উন্নয়নের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্থান ১৩৯তম। বাংলাদেশ এখন একটি মাঝারি মানব উন্নয়ন দেশ। বাংলাদেশের গড় আয়ু ৬০ বছর পাঁচ মাস। বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪০ দশমিক ছয় শতাংশ। স্কুল-কলেজে ভর্তির হার বেড়েছে ৫৪ শতাংশ। 'লিঙ্গ' প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। সফল টিকাদান কর্মসূচি সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাফল্য এনেছে। অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ জল পান ও পুষ্টির ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নতি ঘটেছে। দেশে ১৯৯২ সালে জন্মের হার ছিল ছয় দশমিক চার শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে তিন দশমিক শূন্য তিন শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল তিন শতাংশ। ২০০১ সালে তা কমে এক দশমিক ৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের জনমত সংঘবদ্ধ হয়েছে। সালিসের মাধ্যমে নারী নির্যাতন আর তেমন সহজ নয়।

লন্ডনের *দ্য ইকনমিস্ট*-এর ইনটেলিজেন্স ইউনিট ২০০৪ সালের অক্টোবরে এক সমীক্ষায় বিশ্বের ১৩০টি শহরের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসেবে ঢাকাকে চিহ্নিত করে। ২০০৭-০৮ সালের ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্থান ১৪০তম। গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ বছর এক মাসে। বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭ দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং স্কুল-জলেজে ভর্তির হার ৫৬ শতাংশ।

বাংলাদেশে এমডিজির অগ্রগতির একটি বড় বাধা হচ্ছে, বড় ধরনের সামাজিক বৈষম্য। যেমন, ধনী ও হতদরিদ্রের মধ্যে নবজাত শিশু মৃত্যুর হারে বৈষম্য ৬৮ শতাংশ, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হারে এ বৈষম্য ৯৩ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এর হার ৪৬ শতাংশ ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৬ শতাংশ,

শিশুপুষ্টিতে ধনী ও হতদরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ১০৪ শতাংশ এবং মাতৃপুষ্টির ক্ষেত্রে এ বৈষম্য ৮৯ শতাংশ। এ ধরনের বৈষম্যের মধ্যে থেকে সহস্রাব্দের লক্ষ্য পূরণ করা কি সম্ভব হবে? আর এ বৈষম্য দূর করতে না পারলে বাংলাদেশে অন্তত চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ গরিবই থেকে যাবে। বৈষম্যের কারণে ষড়রিপু তাড়িত সাধারণ ছাপোষা মানুষ যে কোনো সময় ক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। সমাজে যে নৃশংসতা ও অধৈর্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার অন্যতম কারণ বৈষম্যপ্রসূত বঞ্চনাবোধ। অসহায় নারীর প্রতি নানা অত্যাচারের কথা তো আমরা শুনে আসছি। এসিড ছোড়ার পৈশাচিকতা তো আমরা আগে দেখিনি! গৃহে নারী নির্যাতন এবং দেশ-বিদেশে নারী ও শিশু পাচারে বাংলাদেশের লোক যে এত দক্ষতা অর্জন করছে, সে কি শুধু গরিব হওয়ার জন্যই? (দেশের মানুষ তো আগেও গরিব ছিল!) না, ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্যজনিত বিরাট পার্থক্যও এর জন্য দায়ী!

বিশ্বের ৭৫ শতাংশ পাট উৎপন্ন হতো বাংলাদেশে। উৎকৃষ্ট মানের পাটের পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুটমিল গড়ে উঠেছিল। পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে আমদানি-রপ্তানি আয়ের ৯০ শতাংশ অর্থাৎ শত শত কোটি টাকা দেশে আসত। বিশ্বের পাটজাত পণ্যের বাজারের ৮৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত বাংলাদেশ। সরকারের মালিকানায় ছিল ৭৮টি পাটকল। এখন সরকার বা বিজেএমসির অধীন মিল আছে মাত্র ১৮টি। ভারত এখন বাংলাদেশের অবস্থানে। সেখানে খাদ্যশস্য শত ভাগ এবং চিনির বস্তা ৯০ শতাংশ পাটের তৈরি বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে দেশে নতুন পাটকলও নির্মিত হচ্ছে। জাতীয়করণের সময় নিরীক্ষণ না করেই সরকার বিশাল ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েছিল। তখন তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার, এখন কমে হয়েছে আট হাজার। স্বাধীনতার সময় আড়াই লাখ পাটকল শ্রমিক-কর্মচারী ছিল। স্থায়ী ও বদলি মিলিয়ে বর্তমানে কর্মরত রয়েছে ৪৫ হাজার। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পাটকলগুলোয় লোকসান হয় ৪২১ কোটি টাকা। পাট মন্ত্রণালয়ের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ওই টাকার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা শ্রমিক আন্দোলনের জন্য, পাট কিনতে দেরিতে বরাদ্দ পাওয়ায় ১৪০ কোটি এবং বিদ্যুৎবিভ্রাটসহ অন্যান্য কারণে ১৩০ কোটি লোকসান হয়। পাটজাত দ্রব্য ঠিকমতো বাজারজাত করতে ব্যর্থতা। বিভিন্ন সময়ে অদক্ষ আমলাদের সংস্থা পরিচালনা ও মিল ব্যবস্থাপনায় একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতার দুর্নীতি, সময়মতো পাট কিনতে না পারা এবং বিলিং সংকটসহ অন্যান্য কারণে পাটশিল্প ডুবে গেছে।

পাটকলগুলো বেসরকারি খাতে দেওয়া হলেও দু'একটি ছাড়া সবগুলোই নিভুনিভু। বেসরকারি ৫৬টি পাটকলে তাঁত রয়েছে ১১ হাজার ৭০০টি। খুলনা অঞ্চলে বিজেএমসির আটটি পাটকলের একটিও লাভজনক নয়। চট্টগ্রামে সরকার নিয়ন্ত্রিত সাতটির মধ্যে দুটি পাটকল বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যক্তিমালিকানায় আটটির সব কটি পাটকল বন্ধ।

পাট ছিল পাকিস্তানের দুই অর্থনীতির পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অস্ত্র। আমাদের বলা হয়েছিল, পাট রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা আমাদের কাজে আসে না। স্বাধীনতার পর উৎপাদন হতো প্রায় এক কোটি বেল পাট; এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ থেকে ৫০ লাখ

১৩—

বেল। যে দেশে বিশ্বের ৭০ শতাংশ পাট উৎপাদন হতো, যে দেশের আবহাওয়া পাট চাষের অনুকূল এবং চাষিরাও বিশেষভাবে দক্ষ, সেখানে পাটশিল্পের করুণ দশার জন্য কতখানি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত দায়ী তা নির্ণয় করা কঠিন। চীন ও ভারত বাংলাদেশ থেকে কম দামে পাট কিনে আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি দরে বিক্রি করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একে দোষাবহ বলা যায় না।

দুর্নীতিরোধে আমাদের অক্ষমতা আজ সর্বজনবিদিত। ১৪৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে পরপর চারবার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চিহ্নিত হয়েছে। সরকার বদলের পর পরই বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা রুজু হয় এবং সরকারি দলের রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অব্যবহিত আগের সরকার কর্তৃক রুজুকৃত মামলা প্রত্যাহার করা হয়। তদন্ত কর্তৃপক্ষ ও আদালতের যে সময়ের অপচয় হয় তা আমরা খেয়াল করি না। দুর্নীতি মামলা রুজু ও প্রত্যাহারের খেলায় দুর্নীতি কমে না; বরং বৃদ্ধিই পায়। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের বিরদ্ধে যত অভিযোগ দায়ের করা হয়, তার মধ্যে দুটি মামলা চূড়ান্তভাবে শেষ হয় এবং দোষী ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করেন। প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের দলে টানার জন্য তাঁর জামিন দেওয়া-নেওয়া নিয়ে যে প্রহসনের সৃষ্টি হয়, তাতে আদালতের সুনাম ক্ষুণ্ণই হয়। প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজদের মামলার শুনানি বিলম্বিত হয় সরকারের আইন পরামর্শকদের অনুপস্থিতিতেই। দুর্নীতিরোধে নিরপেক্ষতা ও যথার্থ তদারকির জন্য নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র দুর্নীতি দমন কমিশন কবে দায়িত্ব পালন শুরু করবে তা এখনো অনিশ্চিত।

'স্বার্থের সংঘাত'-এর নীতির মধ্যে যে নৈতিকতার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সম্যক ধারণা নেই, দুর্ভাবনাও নেই। বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সময় সরকারকে যাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁদের কেউ কেউ অবসর নেওয়ার পর অম্লানবদনে সেই বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো বিব্রতবোধ নেই। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা হেতু যে ক্ষতি হচ্ছে তা আমাদের বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হবে। কিন্তু শিক্ষিত বিভীষণদের ষড়যন্ত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা সময়মতো প্রতিহত করতে না পারায় তো আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হব। এটি দুঃখজনক যে, সংসদ বর্জনের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিগুলো নিয়ে সংসদে কোনোই আলোচনা হচ্ছে না। যেসব তথ্য দেশের জনগণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেসব তথ্য অনিয়মিতভাবে কনসালটেন্সির মাধ্যমে অতি সহজেই পাচার হচ্ছে।

১৯৪৭ সালের পর আমরা নানা ধরনের খনিজদ্রব্য আবিষ্কার এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয়ের স্বপ্ন দেখে এসেছি। সে ক্ষেত্রে একটি পূরণ হয়েছে। ১৯৬২ সালের ২৩শে আগস্ট তিতাস গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল সেই গ্যাস তোলা শুরু হয়। বিদেশি স্বার্থান্বেষী পরামর্শকেরা বলেন, বাংলাদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে এবং যেহেতু আমাদের যথেষ্ট প্রকৌশল জ্ঞান নেই, গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশে গ্যাস রপ্তানি করা উচিত। দেশি বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের ২০টি

গ্যাসক্ষেত্রে মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ ছিল ১৩ দশমিক ৭৯১ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট। ব্যবহার করার উত্তোলনযোগ্য গ্যাস রয়েছে নয় দশমিক ৮৩০ টিএসএফ। আগামী ৫০ বছরের জন্য ৪২ থেকে ৫৪ টিএসএফ গ্যাস মজুদ থাকা দরকার। নির্বাচিত সরকারের কেউ না কেউ বিজ্ঞের মতো বলেছে, মাটির নিচে ধন রেখে লাভ কী? বেগুনগাছ কেটে মূলা চাষের পরামর্শ দিয়েছেন। ২০০৬ সালের ২৭শে মে 'টাটার বিনিয়োগ প্রস্তাব: বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ' গোলটেবিলে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে প্রস্তাবিত দামে গ্যাস দিলে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে দেড় লক্ষ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সূচক এক সেমিনারে ২০০১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কানাডার অধ্যাপক ড. জন রিচার্ডস বলেন, 'গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।'

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিজ বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি করার ধারণাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার কথা বলেন। সরকার যদি এখন রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ১৫ থেকে ২০ বছর পর আবার গ্যাস আমদানি করতে হবে এবং রপ্তানি ও আমদানি কাজে দু'বার গ্যাস সঞ্চালনে অযথা ব্যয়ভার বহন করতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের অপ্রতিরোধ্য বিরোধিতায় এখন পর্যন্ত গ্যাস রপ্তানির কথা সাহস করে কেউ বলছে না। এ দেশে রেজিম চেঞ্জ বা তখ্‌ত উল্টানোর অশুভ পাঁয়তারার কি চেষ্টা হবে? অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে, কিন্তু দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিতে কোনো ষড়যন্ত্র বরদাশত করবে না।

সব শেষে বাংলাদেশে কর পরিশোধে প্রয়োজন হয় ৬৪০ ঘণ্টা এবং পাকিস্তানে ৫৬০ ঘণ্টা। আর বাংলাদেশে মোট মুনাফার ৫০ দশমিক চার শতাংশই কর হিসেবে দিতে হয়, পাকিস্তানে দিতে হয় ৫৭ শতাংশ।

যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত সারা ও ভৈরব ব্রিজসহ সেতু ও কালভার্ট মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়। গত কয়েক দশকে দেশ বহু রাস্তা ও ব্রিজ তৈরি হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চালাতে জ্বালানি তেলের যে ব্যয় হয়, তার সঙ্গে দাতা রাষ্ট্রগুলোর লাভজনক সম্পর্ক রয়েছে। নৌপথের উন্নয়নের জন্য সরকার বা দাতাগোষ্ঠী তেমন উৎসাহ দেখায়নি। ২০০৭ সালের মার্চের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর ১৮ হাজার কিলোমিটার নৌপথ বিলুপ্ত হয়ে এখন রয়েছে মাত্র ছয় হাজার কিলোমিটার। ২৩০টি নদীর মধ্যে ১৭৫টির অবস্থা শোচনীয়।

চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিপজ্জনক বন্দর বলা হয়। তাছাড়া আমদানি ও রপ্তানিকারকদের অভিযোগ চট্টগ্রাম বন্দরে ৩৭টি পয়েন্টে মোট ৭৮৩ টাকা ঘুষ-বকশিশ দিয়ে অন্তত ৪২টি ফরম পূরণ করতে হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ সেটা অবশ্য অস্বীকার করে। একজন জাপানি পর্যবেক্ষক বলেন, 'বাংলাদেশে জাপানি মাল খালাস করতে ৩২টি স্বাক্ষর ও সাত দিন সময় লাগে।'

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে চাঁদাবাজি ও তোলা উঠানো এক নিত্যকার ব্যাপার। ২০০৫ সালের ২রা মে নৌপথে পুলিশের চাঁদাবাজি শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে *প্রথম আলো* উল্লেখ করে, স্বরূপকাঠি থেকে কাঠবোঝাই নৌকা সাভার পৌঁছানো পর্যন্ত ২৩টি পয়েন্টে মোট ছয় হাজার ১০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়।

২০০৪ সালের *টাইম* ম্যাগাজিনের (এশিয়া সংস্করণ) ১২ই এপ্রিল সংখ্যায় স্টেট অব ডিসগ্রেস শিরোনামে যে প্রতিবেদন বের করা হয়েছিল সেখানে সহিংসতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক আবর্তে দিশেহারা বাংলাদেশকে এশিয়ার সবচেয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। সরকার থেকে বলা হয়েছিল, প্রতিবেদনটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত। কারণ, বাংলাদেশ মোটেই 'অকার্যকর' বা 'ব্যর্থ' রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় পড়ে না।

২০০৪ সালের মে-ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সাময়িকী *ফরেন পলিসি* এবং একটি গবেষণা কেন্দ্র ফান্ড ফর পিস যৌথভাবে ব্যর্থ রাষ্ট্রের একটা তালিকা তৈরি করেছে। জনসংখ্যার চাপ, উদ্বাস্তু ও বাস্তুচ্যুতি, প্রতিহিংসাজনিত গোষ্ঠীগত দুর্দশা, দীর্ঘস্থায়ী দেশত্যাগ, অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষীয়মান অর্থনীতি, রাষ্ট্রের দুর্বৃত্তায়ন বা আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, অবনতিশীল সরকারি সেবা খাত, ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণীর উত্থান এবং বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ–এ ১২টি সূচকের ভিত্তিতে ওই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি সূচকের মান ধরা হয়েছে ১০। সবচেয়ে যার নম্বর বেশি তার অবস্থা খারাপ। সবচেয়ে যার নম্বর কম তার অবস্থা ভালো। সবচেয়ে বেশি নম্বর ১০৬ পেয়েছে আইভরি কোস্ট এবং বাংলাদেশ পেয়েছে ৯৪ দশমিক সাত। দুই দেশের মধ্যে তফাত মাত্র ১৯ নম্বর। তালিকায় ১৭তম স্থানে নির্ণীত বাংলাদেশের মোট মান ৯৪ দশমিক সাত – রাষ্ট্রের দুর্বৃত্তায়ন বা আইনবহির্ভূত কাণ্ড নয় দশমিক পাঁচ, অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় দশমিক শূন্য, স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণীর উত্থান আট দশমিক সাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন আট দশমিক পাঁচ, জনসংখ্যার চাপ আট দশমিক চার, দীর্ঘস্থায়ী দেশত্যাগ ছয় দশমিক শূন্য এবং বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ছয় দশমিক শূন্য। পৃথিবীর ৬০টি দেশের মধ্যে প্রথম ১০টি পুরোপুরি বা বহুলাংশে ব্যর্থ। পরের ১০টি নানাভাবে দুর্বল হলেও এখন ঠিক ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। এর পরের ১০টি দেশের অবস্থা আরেকটু ভালো। বাংলাদেশ আছে ১৭ নম্বরে।

গত এক দশকে দেশে এক দশমিক আট শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমেছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবস্থান ভালো। সুশাসনের অভাব সত্ত্বেও গড়ে পাঁচ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। কৃষক ও শ্রমিকের নিরলস প্রচেষ্টায় যে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি আমরা অর্জন করেছি, তার একটা সুফল পড়তে পারত দেশের প্রশাসনে। প্রশাসন যেভাবে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বীয়কর্মে আত্মতুষ্ট, তাতে অনুমান করা কঠিন যে অদূর ভবিষ্যতে দেশ অস্থিরতা কাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে স্বীয় বলে বলীয়ান হয়ে দণ্ডায়মান হবে।

২০০৪ সালে অর্থনীতিতে যে দু'জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের একজন অধ্যাপক রবার্ট এফ এঙ্গেল এ আশা ব্যক্ত করেছেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ তার দরিদ্র অবস্থা ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানের জগতে যে গবেষণাযজ্ঞ চলেছে সেখান থেকে দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য কিছু আশার কথা শোনার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপে আলো জ্বালিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছে।

রাজধানী এখন নানা ধরনের দুর্নীতির আখড়া। হাজার খানেক বাস চলে অবৈধভাবে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এক সূত্র অনুযায়ী ঢাকা মহানগরে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ লাইসেন্সবিহীন রিকশা ছিল। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই সে সংখ্যা বেড়েছে। বুড়িগঙ্গা বা তুরাগ নদীতীরে এবং পথের পাশে অবৈধ স্থাপনার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের পরামর্শদাতা বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান ডিআইএফডি যৌথভাবে আমাদের জন্য রাষ্ট্র সহায়তা কৌশল (সিএএস) তৈরি করছে এবং আমাদের অর্থমন্ত্রীকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈরি করতে অনুরোধ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোকে যে সুপারিশ-উপদেশ বর্ষণ করে, তার জন্য তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। ভুল উপদেশের জন্য তাদের কোনো হিসাবদিহিও করতে হয় না। দরিদ্র দেশের আত্মরক্ষার জন্য আজ বড় প্রয়োজন ধনী রাষ্ট্রের সঙ্গে সঠিক আচরণ কৌশল তৈরি করা।

ধুরন্ধর কৌটিল্য বহু বছর আগে বলেছিলেন, জলে মাছ জল পান করে কি না যেমন বলা কঠিন, তেমনি নিশ্চিত হওয়া কঠিন সরকারি কর্মকর্তা উৎকোচ গ্রহণ করেন কি না। এক অর্থমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খালি হয়ে যাবে। প্রশাসনের জন্য তো এটা উৎসাহব্যঞ্জক বা সহায়ক বক্তব্য নয়। আমাদের দেশে এক অসাধারণ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার অকার্যকরতার দিকে লক্ষ করে দাতাগোষ্ঠী নিজেদের হাত কামড়ায়। দুর্নীতি কমিশনের স্বভাব পেলে ওমবুডজমান বা মানবাধিকার কমিশন করে কোনো ফল হবে না। ১৪ কোটি মানুষকে শাসন করার জন্য আমাদের যে লোকের বড় অভাব!

দেশের চলমানতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মবৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত অপ্রচলিত বা অপর্যাপ্ত বহু দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশ যখন ভাসমান ভেজালে সয়লাব তখন বিদেশে আমাদের জীবনরক্ষাকারী ও রোগনিরাময়কারী ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক শ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।

ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অব ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (UNCTAD) ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯৮-২০০১ বাংলাদেশের অবস্থান ১১০, ১৯৯৯-২০০১ সালে ছিল ১২৫ কিন্তু ২০০৩ সালে ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিচে নেমে ১২৫ হয়। প্রকৃত জিডিপি, মাথাপিছু জিডিপি, সামগ্রিক প্রতিবেদন, টেলিফোন, মোবাইল, বাণিজ্যিক শক্তির ব্যবহার, গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয়, তৃতীয় স্তরে ছাত্রের সংখ্যা, দেশের ঝুঁকি, প্রাকৃতিক সম্পদের রপ্তানি, সেবা খাতে রপ্তানি, ইলেকট্রনিক্স ও অটোমোবাইল আমদানি, অন্তর্মুখী বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ইত্যাদি সূত্র বিবেচনা করে বাংলাদেশের স্থান নির্ণয় করা হয়।

দেশে ১৯৯২ সালে শিশুজন্মের হার ছিল ৬.৪ ভাগ। ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে ৩.০৩ ভাগে। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩ শতাংশ। ২০০১ সালে তা কমে ১.৪৮ ভাগে।

ওয়ার্ড ইকনমিক ফোরামের ২০০৬-০৭ সালের দ্য গ্লোবাল কমপিটিটিভ রিপোর্টে বাংলাদেশের বাধাবিপত্তি আলোচনা করেও জোর দিয়ে বলা হয় যে দেশে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বর্তমান। ১২৫টি দেশের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে

বাংলাদেশকে ৯৯তম স্থানে রেখে বলা হয়েছে যে দুর্নীতি, অপ্রতুল অবকাঠামো, অদক্ষ প্রশাসন, অর্থনীতিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ধারাবাহিকতার অভাব, স্বল্প ঋণ প্রবাহ, অপরাধ প্রবণতা, দক্ষ মানব সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা, জটিল কর প্রশাসন এবং অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জন কেবল সময়ের ব্যাপার।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিজনেস মনিটর ইন্টারন্যাশনাল তাদের নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৬ সালের পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে মহাসম্ভাবনা কিন্তু মহাপ্রতিকূলতা বলে উল্লেখ করেছে। ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির আধার হয়, বাংলাদেশে তার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কারণে বাজার সম্প্রসারণের জন্য এক বড় সুযোগ রয়েছে। এবং বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ভারতের মাথাপিছু জিডিপির দুই-তৃতীয়াংশ হলেও দেশটির একটি খুদে ভারত হতে কোনো বাধা নেই। দুই বৃহত্তম দেশ চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। বহু অর্থনীতিবিদের ধারণা, বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির শামিল হবে। বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশে বিনিয়োগের যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাতে সেই ইঙ্গিত রয়েছে। তবে বাংলাদেশকে তার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত, রাজনীতিক সংঘাতমুক্ত, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের যথার্থ ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি ও অপচয় কমিয়ে, রাজস্ব আয় বাড়িয়ে এবং বাজেট ঘাটতি কমিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্যের গভীরতা ও উৎপাদনের সংকুচিত ভিত্তির ফলে আমাদের পরিস্থিতি উদ্বেগমুক্ত নয়।

দেশে মাথাপিছু দৈনন্দিন আয় মাত্র ৮৯ টাকা। ২০০৭ সালে আমরা ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এই হার গত ২৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এশিয়ায় আগামীকালের সাফল্যের দেশ বাংলাদেশ – এই বলে যুক্তরাষ্ট্রের সিটিগ্রুপ, জেপি মর্গান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি এবং মেরিল লিঞ্চ কোম্পানি বাজি ধরেছে। কয়লা, গ্যাস ও চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী। আমাদের লোকের অভাব। প্রশাসনে মাত্র ২০ ভাগ লোকের ওপর ভরসা করা যায়। বিদেশি ব্যবসায়ীরা কীভাবে আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে তা নির্ণয় বা প্রতিহত করার আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সততা নেই। দুঃখজনক হলেও এ ব্যাপারে জনরোষই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তা দিয়ে দেশের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটবে না, বরং বিঘ্নিতই হবে।

দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও সস্তা শ্রমে মুনাফার জন্য বিদেশিরা যে বিনিয়োগ করছে তাতে বিশেষ কোনো কারিগরি বিদ্যা হস্তান্তরিত হচ্ছে না। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি হলে দেশে উন্নতি হবে না, যদি কাঠামোগত প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই না হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতির লোক মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করতে আসে – ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ থেকে শিখ-মাড়ওয়ারি, আর্মেনিয়ান ইত্যাদি। ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিশ্চিত প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতিময় প্রশাসনের জন্য ভেতর থেকে তা ভেঙেই পড়েছিল।

১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তানে স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের আগে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১৯৬

কোম্পানির প্রতিদিন ২০ হাজার শেয়ার লেনদেন হতো। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও অন্যান্য নানা কারণে স্টক এক্সচেঞ্জের সব কার্যক্রম ১৯৭৫ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। ১৯৭৬ সালে নয়টি কোম্পানি নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ নতুন করে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় এক্সচেঞ্জ অনুমোদন লাভ করে। ২০০০ সালে ঢাকা এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত ২২১টি কোম্পানির মধ্যে ১২০টি গড়ে ২১ দশমিক ৩৮ ডিভিডেন্ট অনুমোদন করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বকালের রেকর্ড, ঢাকার শেয়ারবাজারে ২০০৭ সালের ২১শে জানুয়ারি এক দিনে ১৩৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়। ২০০৭ সালের ৮ই নভেম্বর ঢাকার শেয়ারবাজারের সূচক ৫৪ দশমিক ৩৪ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন রেকর্ড হয় ২৯০৪ দশমিক ১৪।

বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সামরিক শাসনের মতো রাজনৈতিক দুর্যোগ বা অপদার্থ নির্বাচিত সরকারের নৈরাজ্যের মতো দুর্ভোগ কাটিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একাধিকবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে মারি ও মড়ক, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সামাজিক অস্থিরতা ছিল নিত্যকার, সে দেশের চেহারা উল্লেখযোগ্যভাবে পাল্টে গেছে। স্বাধীনতার ৩৬ বছরের উল্লেখযোগ্যকাল আমাদের দেশ ছিল রাহুগ্রস্ত। পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণে বেশ কিছু মূল্যবান সময় ব্যয়িত হয়েছে। এই হতদরিদ্র দুঃখী মানুষের মধ্যে এমন একটা গতিময়তা এবং প্রাণবন্ততা রয়েছে, যা এ দেশকে শুধু রক্ষা করছে না, কখনোবা তাদের মুখে হাসিও ফোটাচ্ছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের একটি ইন্ডিপেনডেন্ট থিংকট্যাংক *ড্রিমস* এক জরিপ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের দেশ। লন্ডন *সানডে টাইমস*-এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। বছর দুয়েক পর সুপার মডেল ক্লডিয়া শিফার বাংলাদেশ সফর করতে এসে বলেন, 'বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের বস্তির মানুষের মুখে যে সুখের আভা দেখা যায়, অনেক শত কোটিপতির চেহারায়ও তা থাকে না।' দুর্যোগ কাটিয়ে দারিদ্র্য ও দুরবস্থাকে সহনীয় করার একটা প্রযুক্তি আমরা যে অর্জন করেছি, তা বলতেই হবে।

বাংলাদেশ যদি সমৃদ্ধি লাভ করতে চায় তবে সন্ত্রাসের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে, অন্যদের অবিচার ও নিপীড়ন থেকে যতদূর সম্ভব সমাজের প্রতিটি সদস্যকে রক্ষা করতে হবে এবং যথাযথ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে সহায়তা, চুক্তির দায়দায়িত্ব পালন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং লেনদেনের খরচ কমানোর জন্য দুর্নীতিকে ন্যূনতম স্তরে সীমিত করার লক্ষ্যে দেশে ফলপ্রদ ও যথার্থ আইন থাকতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ যদি স্বাধীনসত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে চায়, যার পূর্বাভাস সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিধৃত রয়েছে, তবে তাকে আরো সতর্ক হতে হবে এবং প্রয়োজনে বাজারকে নিয়মিত করতে, মুক্ত-বাণিজ্যের আতিশয্যকে নিবৃত্ত করে শ্রমিক ও ভোক্তার অধিকার এবং সকলের জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কার্যকর আইন প্রণয়ন করতে হবে। কারণ, আমাদের জন্য কেবল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উদারীকরণ যথেষ্ট নয়, অসুবিধাগ্রস্ত এবং অনগ্রসর মানুষের জন্য আমাদের অবশ্যই সামাজিক সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

জ্বালানি সম্পদ

পৃথিবীর জ্বালানি সম্পদ দু'ভাগে ভাগ করা হয় : অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি। অনবায়নযোগ্য জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানিও বলে পরিচিত যেমন, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের পর তা একেবারে ফুরিয়ে যায় না, একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেখান থেকে আবার শক্তি পাওয়া যায়। গাছপালা বা বিভিন্ন প্রাণি থেকে পাওয়া শক্তিকে বায়োমাস বলে। বাংলাদেশে বায়োমাস জ্বালানির তিনটি প্রধান উৎস কৃষিজাত পণ্যের অবশিষ্টাংশ (প্রাণির বিষ্ঠা) এবং গাছপালা। কৃষিজাত জ্বালানি হচ্ছে খড়, তুষ, পাটকাঠি। মোট জ্বালানি চাহিদার ৫০ ভাগ আসে এসব থেকেই। গোবর ১৯ ভাগ জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে। আর জ্বালানি কাঠ থেকে আসে ৬ ভাগ। বায়োমাস, সৌরশক্তি, জলপ্রবাহ, বায়ু, তরঙ্গ ইত্যাদি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি তৈরি হয়। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নিকট ভবিষ্যৎ খুব ভালো নয়। ২০০৩ সালে সৌরশক্তি থেকে দেশে মাত্র প্রায় ০.৩৩ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের জ্বালানির বায়োমাস জ্বালানি (গাছ ও প্রাণিদের থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি) ব্যাপকসংখ্যক গ্রামীণ জনসাধারণের প্রধান জ্বালানি এবং দেশের ৬০ ভাগ ব্যবহৃত জ্বালানির উৎস এসব জ্বালানি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার্য নয় এবং মান তেমন উন্নত নয়।

বর্তমান বিশ্বে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি বা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। এই জ্বালানির পরিমাণ সীমিত। ভবিষ্যতে সহজলভ্য হবে না। পৃথিবী তখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির যুগে প্রবেশ করবে।

সর্বাপেক্ষা নবায়নযোগ্য পদ্ধতি সরাসরিভাবে সৌরশক্তি অথবা আবহাওয়াচক্রের মাধ্যম, যেমন তরঙ্গশক্তি, জলবিদ্যুৎশক্তি বা বাতাসের শক্তির ওপর নির্ভরশীল। জোয়ার-ভাটার শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাঁদের মহাকর্ষ বলকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশে গতানুগতিক সম্পদ ৫০ বছরের মতো দীর্ঘ সময়ের জন্য তাৎপর্যময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহে অপর্যাপ্ত বলেই প্রতীয়মান হবে। অতএব, দেশে সহজলভ্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এসব থেকে শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন খুবই জরুরি। নবায়নযোগ্য উৎসগুলোর অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করা যায় যেমন যান্ত্রিক, তাপসংক্রান্ত এবং বৈদ্যুতিক।

বাংলাদেশের মতো দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কারণ দেশটি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের কিছু পাহাড়ি এলাকা এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু উচ্চভূমি ছাড়া মূলত নিম্ন ও সমতলভূমির। দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি হলো কর্ণফুলী নদীর ওপর নির্মিত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যার ৭টি ইউনিটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট (৫০ মেগাওয়াটের ৩টি এবং অপর ৪টির প্রত্যেকটির ক্ষমতা ২০ মেগাওয়াট)।

১৯৮০ সালের দশকে পরিচালিত কিছুসংখ্যক প্রকল্পের সম্পাদনযোগ্যতা সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১০ থেকে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রায়তন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা রয়েছে ১৫টি নদী বা ছড়ার। বঙ্গোপসাগর থেকে তরঙ্গশক্তি কাজে লাগানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

মূলত দুই পদ্ধতিতে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। সূর্যের আলো ফটোভোল্টাইক সেল বা সৌর সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। সৌরশক্তি ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট জলাধারে লবণাক্ত পানি উত্তপ্ত করে পানি বাষ্প আকারে পাইপের মাধ্যমে পরিবাহিত করে জ্বালানি উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে ১৯৮১ সালে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সরকারি প্রতিষ্ঠান পিডিবি। বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু করে গ্রামীণ শক্তি ১৯৯৬ সালে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সাল থেকে ঋণের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করে। ২০০৪ সালের এক হিসাব অনুসারে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ০.৮ মেগাওয়াট।

গ্রামাঞ্চলে সৌরবিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এর স্থাপনা খরচ বেশি হওয়ায় এ ব্যবস্থা খুব বেশি প্রসারিত হচ্ছে না।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান (২০°৩৪-২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ) এক্ষেত্রে অনুকূলে, প্রচুর বৃষ্টিপাতের তিন মাস জুন থেকে আগস্ট ব্যতীত বছরের অধিকাংশ সময়জুড়ে বিদ্যমান প্রচুর সূর্যালোককে কাজে লাগানো সম্ভব। সৌরশক্তি প্রাপ্যতার পরিমাণ উচ্চপর্যায়ের। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের বেশিরভাগ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ডিজেল ব্যবহার করে। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৮% মানুষ জাতীয় গ্রিড লাইনের সংযোগের আওতায় এসেছে।

১৯৯৮ সালে দেশজুড়ে পৃথকভাবে বাস্তবায়িত বিভিন্ন ফটোভোল্টাইক প্রকল্পের সর্বমোট উচ্চক্ষমতা ছিল ১৫০ কডচক-এর মতো (উচ্চ সূর্যালোকের উচ্চমাত্রার সময়ে কিলোওয়াট)। এ পদ্ধতি প্রধানত গ্রিড লাইন থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলো এবং চা বাগানগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোয় এবং কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিদ্যুৎ চাহিদা পরিপূরণে যেমন, বাড়িতে আলোর ব্যবস্থা, পানি উত্তোলন, সতর্ক সংকেত ও যোগাযোগে এবং জরুরি ওষুধ বা টিকা সংরক্ষণ ইত্যাদিতে উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দেশে বর্তমানে কিছুসংখ্যক দেশীয় সংস্থা ছোট ও মাঝারি সৌরশক্তি প্রণালির জন্য ফটোভোল্টাইক সৌর প্যানেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরি করছে।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে সাধারণ এবং সরলতম উপাদান হলো হাইড্রোজেন। জ্ঞাত জ্বালানির মধ্যে হাইড্রোজেনে প্রতি এককে সর্বাপেক্ষা উচ্চশক্তি সঞ্চিত রয়েছে প্রতি পাউন্ডে ৫২.০০০ বিটিইউ বা প্রতি গ্রামে ১২০.৭ কিলোজুল। দেশের একমাত্র হাইড্রোজেন শক্তি স্থাপনাটি চট্টগ্রামে অবস্থিত যা ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের একটি সহায়ক ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। এই ইউনিট প্রাকৃতিক গ্যাসের বাষ্পীভবন থেকে ৯৯.৯% বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। হাইড্রোজেন ইস্টার্ন রিফাইনারির মূল উৎপাদন কর্মকাণ্ডে একটি আনুষঙ্গিক উৎপাদিত দ্রব্য। হাইড্রোজেনের উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প এবং তা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে প্রবাহিত বাতাসের বার্ষিক গড় গতিবেগ মাত্র ২ থেকে ৩ নট, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী নয়। উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র 'বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপনা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বায়ুপ্রবাহ, মিনি-মাইক্রো জল, তরঙ্গ বা জোয়ার-ভাটা ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় ফটোভোল্টাইক উৎপাদন, অধিক সম্ভাবনাময় এবং টেকসই।

প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মিরসরাইয়ের মুহুরি এলাকায় ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২০০৮ সালের ১৫ই মার্চ থেকে কুতুবদিয়া উপজেলায় ৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে আরেকটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে।

২০০০ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা ছিল ১৯৭ কিলোগ্রাম তেলের সমপরিমাণ। প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা এবং পানিসম্পদ ইত্যাদি মূলত শহরাঞ্চলে ব্যবহার হয়। মোট জ্বালানি চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ আসে এসব বাণিজ্যিক জ্বালানি থেকে। মূলত গ্রামাঞ্চলে অবাণিজ্যিক জ্বালানির উৎস পাটকাঠি, শুকনো পাতা, তুষ, গোবর, জ্বালানি কাঠ এসব মোট জ্বালানি চাহিদার ৬০ ভাগ পূরণ করে।

বাণিজ্যিক জ্বালানির ভেতর মোট চাহিদার ৭০ ভাগ আসে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, পেট্রোলিয়াম তেল থেকে ২৫ ভাগ, কয়লা থেকে ৪ ভাগ এবং জলবিদ্যুৎ থেকে পাওয়া যায় ১ ভাগ।

পাইপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাসের সংযোগ রয়েছে বাংলাদেশে মাত্র ৫ ভাগ পরিবারে। দেশের ২৫ শতাংশ লোকের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। মাত্র ৪ থেকে ৫ ভাগ গ্রামীণ পরিবার রান্না বা আলো জ্বালাতে কেরোসিন ব্যবহার করে। অন্যদিকে ৯০ ভাগ পরিবার রান্নার কাজে অবাণিজ্যিক বায়োমাস জ্বালানির ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৪টি গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছে, এর মধ্যে দুটি উপকূল অঞ্চলে। ২২টি গ্যাসফিল্ডে মজুদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬.৬ টিসিএফ (ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট)। ১৯৮২ সালে দেশের ৬২ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছিল, ২০০৩ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২১ বিলিয়ন কিউবিক ফুট। ২০০৬ সালের প্রথমদিকে আবিষ্কৃত দুটি গ্যাসফিল্ডের পরিমাণ অনুমান করা হয় ০.২ থেকে ০.৫ টিসিএফ হতে পারে।

১৯৮৫ সালে ৩৫ ভাগ বাণিজ্যিক জ্বালানির চাহিদা পূরণ হতো গ্যাস থেকে। ২০০১ সালে সেই বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার ৭০ ভাগ পূরণ হয় গ্যাস থেকে। বর্তমানে দেশের মোট ৯০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর দেশের ৬টি সার কারখানা থেকে বর্তমানে ২ মিলিয়ন টন সার উৎপাদিত হয় প্রতি বছর।

২০০৩ অর্থবছরে দেশে ৩.৫ মিলিয়ন টন তেল আমদানি করা হয়, যার মূল্য ছিল ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এই সময়ে ৯.৫ মিলিয়ন টন সমপরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। যদি আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস না থাকত তবে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে যে পরিমাণ তেল আমদানি করতে হতো তার মূল্য দাঁড়াত ৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা।

প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের প্রতি বছর ৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ বাঁচিয়ে দেয়।

ভারত ও মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে জ্বালানি গ্যাস আবিষ্কার করেছে। সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের একটি সারসংক্ষেপ হলেই আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সাগরে অনুসন্ধান কাজ শুরু হবে। ১৯৭৪ সালে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখন কয়েকটি ব্লক বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারাও দেওয়া হয়। তারা অনুসন্ধানও শুরু করে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর ওই কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ ত্যাগ করে। এরপর বিভিন্ন সময়ে সাগরে অনুসন্ধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; কিন্তু সে উদ্যোগ কোনোটাই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সাগরে অনুসন্ধান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও অর্থের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাগরে অনুসন্ধান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। এখানে একটি কূপ খনন করতে স্থানভেদে ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। কূপ খননের পর গ্যাস বা তেল পাওয়া না গেলে পুরো বিনিয়োগই ভেস্তে যাবে। স্থলভাগে একটি কূপ খনন করতে ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়।

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসের যে মজুদ আছে তা দিয়ে সর্বোচ্চ ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলতে পারে। পেট্রোবাংলা সরকারকে বলেছে, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা তাদের জন্য কঠিন হবে। গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পেট্রোবাংলা সরকারের সহযোগিতা চেয়ে আসছে। গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি কয়লা তোলার বিষয়েও তারা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। ভবিষ্যতে জ্বালানির নিশ্চয়তা না থাকলে দেশি-বিদেশি কোনো বিনিয়োগকারীই এখানে বিনিয়োগ করতে আসবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য আলাদা একটি মডেল পিএসসির (উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি) নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৯১-১৯৯৬ কার্যক্রম চালানোর জন্য নতুন করে সারাদেশের স্থলভাগকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়। ১৯৯৩ সালে বিদেশি কোম্পানির কাছে ব্লক ইজারা দেওয়া শুরু হয়। পরবর্তী সরকারও স্থলভাগের ব্লক বরাদ্দ দেয়। স্থলভাগের মোট ২৩টি ব্লকের মধ্যে ১০টি ব্লক বরাদ্দ দেওয়া হয়। আদালত দেশের স্থলভাগের কোনো ব্লক নতুন করে কোনো বিদেশি কোম্পানির কাছে বরাদ্দের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন মতে, উপকূল থেকে গভীর সমুদ্রে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একটি দেশের সীমানা। কিন্তু বাংলাদেশ এটি নিয়ে কোনো জরিপ কাজ করেনি। সীমানা নির্ধারণ বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে।

দেশের একমাত্র তেলক্ষেত্র সিলেটের হরিপুরে আশির দশকের শেষদিকে আবিষ্কৃত হয়। সাত বছর ০.৫৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলনের পর ১৯৯৪ সালে হরিপুর থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে দেশে তেল উৎপাদিত হচ্ছে না। মোট জ্বালানি চাহিদার ২৫ ভাগ আসে আমদানি করা তেল থেকে। ১৯৭৩ সালে আমদানিকৃত তেলের পরিমাণ ছিল ১ মিলিয়ন টন। এর মূল্য ছিল ২৫ মিলিয়ন ডলার।

তেলের আমদানি প্রতি বছর বাড়ছে। ২০০৩ সালে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের ৩.৫ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করা হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলমগ্ন পরিবেশে উদ্ভিদ দীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়ে থাকার ফলে উৎপন্ন কালো অথবা গাঢ় বাদামি বর্ণের খনিজ পদার্থ কয়লার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে। রাসায়নিক শিল্পেও এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গন্ডোয়ানা কয়লার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে অনুসন্ধানকার্য ছিল অবহেলিত। ১৯৫৯ সালে স্টানভাক কোম্পানি বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করার সময় স্টানভাক বগুড়া জেলার কুচমাতে কূপ খনন করতে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৩৮১ মিটার গভীরতায় গন্ডোয়ানা কয়লার সন্ধান লাভ করে। বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থীয় জরিপ ও খননকার্যের ফলে ১,০৫০ মিলিয়ন টন মজুদ জামালগঞ্জ-পাহাড়পুর কয়লাখনি এবং প্রচুর পরিমাণে ইয়োসিন চুনাপাথরের মজুদ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়াতে, ১৯৮৯ সালে রংপুর জেলার খালাসপীর নামক স্থানে এবং ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরের দীঘিপাড়াতে পার্মিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।

যুক্তরাজ্যের ওয়ারডেল আর্মস্ট্রং (Wardell Armstrong) ১৯৯০ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লার কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইকার্য পরিচালনা করে। কয়লা উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশ সরকার চীনা কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৯৭ সালে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে ভূপৃষ্ঠের ১৫০ মিটার গভীরে গন্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়। ১৯৬০-৬২ সালে বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্ত বরাবর সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট-বাগলিবাজার এলাকায় ভূপৃষ্ঠের নিচে ৪৫ মিটার থেকে ৯৭ মিটার গভীরতায় টারশিয়ারি কয়লাক্ষেত্রের দুটি স্তর আবিষ্কার করা হয়। এই কয়লা লিগনোবিটুমিনাস জাতীয়।

কয়লাস্তর মিথেনকে দেশের, বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পুরু কয়লাস্তর সমৃদ্ধ প্রধান কয়লাক্ষেত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব কয়লাক্ষেত্র মিথেন গ্যাস সমৃদ্ধ। জামালগঞ্জ, খালাসপীর ও বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের সম্ভাব্য গ্যাস সঞ্চয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। জামালগঞ্জে অবস্থিত একটি কয়লাস্তরই ০.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট পরিমাণ সিবিএম গ্যাস ধারণ করে।

২০০১ সাল পর্যন্ত দেশে উচ্চমানের বিটুমিনাস কয়লাসমৃদ্ধ ৬টি খনি আবিষ্কৃত হয়। রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে এসব খনিতে ২ হাজার মিলিয়ন টন কয়লা মজুদ আছে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ার কয়লাখনি থেকে উত্তোলন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশের প্রায় সব কয়লা ভারত থেকে আমদানি করা হতো। ভারতের মেঘালয় থেকে আমদানি করা কয়লা উচ্চ সালফারযুক্ত (২ থেকে ৫ ভাগ) এবং পরিবেশের জন্য এটা বেশ ক্ষতিকর। অন্যদিকে বাংলাদেশে বড়পুকুরিয়ায় যে কয়লা পাওয়া গেছে সেখানে সালফারের পরিমাণ ১ ভাগেরও কম।

বাংলাদেশে মূলত ইটভাটাতেই কয়লা ব্যবহার হয়। সরকারি হিসাবে ১৯৯৫-২০০০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক কয়লা ব্যবহার হয় ০.৬ থেকে ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

দেশের প্রথম কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। ভূ-গর্ভস্থ কয়লাখনির উৎপাদিত কয়লার বেশিরভাগ খনির পার্শ্ববর্তী ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্র হলো জামালগঞ্জ (জয়পুরহাট) (১৯৬২)। এরপর বড়পুকুরিয়া (১৯৮৫), খালাসপীর (১৯৮৯), দীঘিপাড়া (১৯৯৫) এবং ফুলবাড়ী (১৯৯৮)।

৮ই জানুয়ারি ২০০৮ সরকারের কাছে প্রদত্ত চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, কোনো বিদেশি সংস্থা এককভাবে কয়লা তুলতে পারবে না। তবে সরকারের সঙ্গে নির্বাচিত দেশি বা বিদেশি কোম্পানি যৌথভাবে কয়লা উত্তোলন করতে পারবে। পাশাপাশি কয়লার মালিকানা থাকবে সরকারের। প্রস্তাবিত খসড়া কয়লানীতিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি রয়্যালটির বিষয়টি ঠিক করেনি। নীতিমালায় রফতানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। কুকিং কোল দেশে ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত থাকলে রফতানির সুপারিশ করা রয়েছে। এছাড়া সরকার চাইলেই রয়্যালটি নির্ধারণে একটি কমিটি গঠন করতে পারবে। কোল বাংলা নামের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ রয়েছে নীতিমালায়।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৩০০ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে বেশি গভীরতাসম্পন্ন সিলেটের জামালগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে মজুদের পরিমাণ ১ হাজার ৫৩ মিলিয়ন টন। জামালগঞ্জের কয়লা ক্ষেত্রের উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। বড়পুকুরিয়ায় ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়েছে। কয়লা মজুদে অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অভিঘাত ও আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত কারণে এ দেশের কয়লাখনির উন্নয়ন কার্যক্রম অধিকতর জটিল। জ্বালানি নিরাপত্তা দীর্ঘমেয়াদি করতে হলে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খাতে কয়লার ব্যবহার বাড়িয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর চাপ কমাতে হবে। বর্তমানে কয়লা খাতে বিনিয়োগ করতে চায় ভারতীয় কোম্পানি টাটা, এশিয়া এনার্জি, হোসাফ কনসোর্টিয়াম।

জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত আমাদের কাজ তেমন ভালো হয়নি। নোবেল বিজয়ী যোসেফ স্টিগলিজ যখন বললেন, বাংলাদেশের গ্যাস রফতানি করা উচিত নয়, কারণ দু'দিন বাদে তাকে গ্যাস আমদানি করতে হতে পারে, তখন এক শক্তিধর দেশের ফোঁপরদালাল বললেন, তিনি গ্যাসের কী জানেন। দাতাগোষ্ঠীরা যেভাবে আমাদের ফুঁসলাচ্ছিল এবং হাত মোচড়াচ্ছিল, তখন যদি দেশের জনগণ এক বিরল ঐকমত্যে গ্যাস রফতানির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াত তাহলে কোনো একটা বড় অঘটন ঘটে যেতে পারত। গ্যাস-কয়লার ব্যাপারে সরকার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, ব্যবহার ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশি পরামর্শক এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের সন্তান-সন্ততি যেন কম-বেশি সমান যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে সে জন্য অনতিবিলম্বে একটি পঞ্চবার্ষিকী ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্বয়ম্ভর হব, ততক্ষণ আমরা কোনো গ্যাস বা কয়লাক্ষেত্র ইজারা দেব কিনা ভাবা উচিৎ।

শিক্ষা

অতীতে বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষার একটা নাম ছিল। বাংলাদেশের পণ্ডিতরা উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্থান পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের কায়স্থ-করণিকরা বিভিন্ন রাজসভায় নানা কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। সরকারি ও বেসরকারি দলিলপত্র এবং মিশনারিদের প্রতিবেদন থেকে তথ্যাদি আহরণ করে ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০) বলেন, বাংলাদেশে ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষা তখন ছিল ধর্মপ্রথা ও স্মৃতিভিত্তিক। কালক্রমে অর্থানুকূল্যের অভাবে এবং ইংরেজি স্কুলের দাপট ও প্রাধান্যে মক্তব-মাদ্রাসা টোল পাঠশালার দারুণ দুর্দশা ঘটে। ১৯১০ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) সরকারি সাহায্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কর আরোপের প্রস্তাব করেন। ওই প্রস্তাব গৃহীত হলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানরা উপকৃত হবে – এ আশঙ্কায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য নেতারা ঘোর আপত্তি জানান।

মধ্যযুগে ন্যায়নীতি, হিতোপদেশ বা শিক্ষার ভার বহন করতেন ধর্মগুরুরা। আমাদের দেশেও ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার ছিল সাক্ষাৎ চলাচল। রাজা ধর্মবোধে, নিজের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে এবং প্রজানুরঞ্জনে মহাবিহার বা মাদ্রাসার প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করতেন। ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনের সুবিধার্থে ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেকলে বললেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করা যেন সেটি রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু প্রকৃতি, আদর্শ, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে পুরোপুরি ইংরেজ। এরপর উড ডেসপ্যাচ (১৮৫৪), হান্টার রিপোর্ট (১৮৮২), লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার (১৯০২-৪), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) এবং সার্জেন্ট কমিটি (১৯৪৪) ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু পদক্ষেপের সুপারিশ করেন। সেসব প্রতিবেদনে সর্বজনীন শিক্ষার কথা আসেনি। একটি ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে সেটা কেউ আশাও করেনি।

ইতোমধ্যে শিক্ষার জগতে নানা চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। এখনো সব দেশে রাষ্ট্র শিক্ষার ভার বহন করে না। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (১৯৪৮) ছাব্বিশ ধারায় বলা হয়েছে, ক. অন্তত পক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সব জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব, উন্নয়ন ও শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে। গ. যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেওয়া হবে তা আগে থেকে বেছে নেওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে।

এই ঘোষণার নিরিখে প্রণীত বিভিন্ন সংবিধানেও শিক্ষা সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর শরিফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশনের সুপারিশ সরকার বাস্তবায়ন করার সুযোগ পায়নি।

শিক্ষিত আমলা ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। সাম্রাজ্যবাদের পুরোধারা শিক্ষিতই ছিল। শিক্ষা ছাড়া শাসন করা যায় না, শোষণ করাও যায় না। মোগল সাম্রাজ্য বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শিক্ষিত শাসকের অভাব ছিল না। কর প্রদানের জন্য প্রজার শিক্ষার প্রয়োজন নেই, রাজার আমলার আছে। আমাদের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষা সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে : 'ক. রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' এই দিক-নির্দেশনার জন্য আমরা সংবিধান-প্রণয়নকারীদের কাছে কৃতজ্ঞ।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষা ভাবনা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির সারাংশে বর্ণিত হয়েছে : 'শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। দেশের সব শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। তদুপরি শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় মূলনীতি চতুষ্টয়ের সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় নীতিমালা চতুষ্টয়ের যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায় : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব নৈতিক মূল্যবোধ সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা, প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা।'

কমিশন প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের বাংলা প্রাথমিক চলতি ভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশ করে এবং দেশে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থান কী রূপ হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। শিক্ষায় অর্থায়নের ব্যাপারে বলা হয়, 'শিক্ষার জন্য যে ধরনের রাজস্ব সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক তা এ রকম লোকের দ্বারা প্রণীত হওয়া উচিত যারা শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ও এ ব্যাপারে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সেইসঙ্গে রাজস্ব কর ধার্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী। এ ধরনের পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা থাকা উচিত। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের অর্থসংস্থানের জন্য প্রচলিত কয়েক প্রকারের কর বৃদ্ধি, নতুন কর আরোপ, ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে শিক্ষার জন্য

অর্থ পাওয়া যেতে পারে। সে ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এ কমিটি শিক্ষা প্রশাসক, কর নির্ধারণ বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে জনসম্পদের পূর্বানুমান অপরিহার্য। তাই জনসম্পদ সম্পর্কে জরিপ, বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, সেসব তথ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি জনশক্তি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।'

এরপর আমরা একাধিক শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠন করি। কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে না পারলেও প্রায় প্রতিটি সরকার-পরিবর্তনের পর নতুন কমিটি বা কমিশন গঠিত হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের সভাপতিত্বে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সৃষ্টি এবং শ্রেণী-চেতনার বিকাশ ঘটানো, শিক্ষা-সঞ্চয়পত্র প্রবর্তন এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে শিক্ষার ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশে উন্নীত করার যেসব সুপারিশ করা হয় তার কোনোটিই পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮৩ সালে সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত ড. আবদুল মাজেদ খান শিক্ষা কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ও ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা, মাধ্যমিক শিক্ষা আরো দুই বছর বৃদ্ধিসহ মাদ্রাসা শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা এবং তার বিস্তারের জন্য সুপারিশ করেন। ছাত্রদের ব্যাপক বিরোধিতায় সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যায়নি। ১৯৮৭ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন নামে গঠিত ড. মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক তথা সার্বিক শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশ করে। যখন সরকার ড. মনিরুজ্জামান মিঞা কমিশনের সুপারিশ নিজের মতো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে তখন দেশে প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও বাণিজ্যের খাতিরে বিজ্ঞানের স্থান সংকোচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এমনই সংহত হয় যে, সেই প্রচেষ্টা সরকার এক বছরের জন্য স্থগিত করতে বাধ্য হয়।

একমুখী শিক্ষায় যা সদগুণই আছে সে সম্পর্কে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন উঠেছিল, বিশেষ করে বিজ্ঞানের পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ব্যাপারে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বৈদেশিক নির্ভরতাহেতু উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্যদাতাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত, নিয়ন্ত্রিতও। পরনির্ভরতায় সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে কোনো নীতি প্রণয়ন করা হয়ে ওঠেনি। মানব উন্নয়ন সূচকে একটি দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। শিশুমৃত্যুর হার, গড় আয়ু এবং সাক্ষরতার হার দিয়ে একটি দেশের উন্নয়নের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, যে দেশে সাক্ষরতার হার বেশি সেখানে শিশুমৃত্যুর হার কম এবং গড় আয়ু অপেক্ষাকৃত বেশি। জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—এক কথায় সার্বিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যে উন্নয়ন পরিমাপ করা যায় তা অর্জনে সাক্ষরতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে সাক্ষরতা যে ভূমিকা রাখে, তা উন্নয়নকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক প্রচারিত একবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষার বিশ্ব ঘোষণায় প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উন্নয়নের

জন্য শিক্ষা বিকাশ, অর্জন ও বিতরণের ক্ষেত্রে যোগাযোগ-প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তন আনবে। নতুন প্রযুক্তি পাঠক্রম, পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি নবায়নের সুযোগ করে দেবে এবং তাতে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। শিক্ষার নবায়নের মূল ভিত্তি হবে অংশীদারিত্ব, সাধারণ স্বার্থ, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও বিশ্বাসযোগ্যতা।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও বৈষম্য সৃষ্টির সমালোচনা করে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বলেছেন, প্রায় ৮ কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর এবং প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার যে উন্নয়ন হয়েছে তা মাত্র ১০ লাখ ক্ষমতাবানের। তার মতে, গত ৩৪ বছরে যেখানে সাধারণ প্রাথমিক স্কুল বেড়েছে দ্বিগুণ, সেখানে দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে আটগুণ। প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি দ্বিগুণ বাড়লেও দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে তেরগুণ। মধ্যবিত্তের সরকারি বিদ্যালয়ে মাথাপিছু খরচ ৩ হাজার টাকা, কিন্তু মাদ্রাসায় খরচ হচ্ছে ৫ হাজার টাকা। অসহায়, অসম্পন্ন মুসলমান শিশু-কিশোররা মাদ্রাসায় যে অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ পায়, সেটার জোগান দেওয়ার উদ্যোগ বা ক্ষমতা কি সরকারের আছে? কালের হাওয়ায় কেমন অবস্থা বদলায় তার একটা উদাহরণ আমি দেই। ১৮২৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি যখন কলকাতায় গোলদিঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় তখন কেবল ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীর জন্য ১২ বছরের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮২৬ সালে একটি বৈদ্যক শ্রেণী খুলে কেবল বৈদ্য সন্তানদের জন্য কলেজের দরজা সামান্য খুলে দেওয়া হলো। ১৮৫১ সালে কায়স্থদের জন্য ভর্তির সুযোগ করা হয়। ১৮৫৭ সালে মাসিক বেতন চালুর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-নির্বিশেষে সব ভদ্রসন্তানের জন্য কলেজের দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

খবরের কাগজে দেখলাম, পশ্চিমবঙ্গে অমুসলমান ছাত্ররাও নানাবিধ সুবিধা বিবেচনা করে মক্তব-মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে। এক সম্প্রদায়ভিত্তিক বিদ্যালয় ও এক বিষয়কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়কে কি বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য বলা যায়? শিক্ষাঙ্গনে তো সবার প্রবেশের অধিকার থাকবে।

সম্প্রতি শিক্ষায় বৈশ্যপ্রভাব ও বাণিজ্যানুরক্তি দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঁচতারা হোটেলে শিক্ষাঙ্গনের ভর্তি-মেলা চলছে। তৈরি পোশাকের মেলার সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিল। ছাত্রাকর্ষণের জন্য তৈরি পোশাকের কারখানার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা ধরনের সব উদ্ভট্টি বিদেশি নাম। দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারের সঙ্গে একটা যাতায়াতের সম্পর্ক নিশ্চয় রয়েছে। জীবিত সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন সন্তানের নাম থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান নামের সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে পণ্য করে বিদ্যার বিপণন-বাণিজ্য চালাচ্ছে। কোম্পানির নাম নিয়ে কোম্পানির নিবন্ধক প্রশ্ন করতে পারেন, করেননি। আমাদের দেশে ক্ষমতা বদলের পর প্রায়ই একটা শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষার বিষয়েও আমাদের মতদ্বৈধের কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায় স্বরাজ্য লাভ করেও সংখ্যালঘিষ্ঠের রক্ষণশীল প্রবণতা অতিক্রম করতে পারেনি। ১৯৫৯ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে

সরকার একাধিক শিক্ষা প্রণালি কখনো মঞ্জুর করেন না।' আমাদের দেশে এখন তিন ধরনের শিক্ষা চলছে – ধর্মপ্রধান, ইংরেজিপ্রধান ও সাধারণ।

১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ ইত্যাদি বছরে দেশের সংস্কৃতি, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে ছাত্রদের অবদানকে স্মরণীয়, স্বর্ণময় ও গৌরবজনক বলে প্রায় সব পক্ষই উল্লেখ করে থাকে। আবার অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে প্রশাসন থেকে ছাত্রদের বলা হয়, 'বাবারা, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন লেখাপড়া নিয়ে বসো।' এসব কথা শুনে কোন ছাত্র নিজেকে নিবৃত্ত করবে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররা, যারা ভোটাধিকার পেয়েই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে? অযথা নিন্দিত হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে যথার্থভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, ছাত্রদের বাক্‌স্বাধীনতা ও সমিতি করার অধিকার বন্ধ করলে তা মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করবে এবং এ ব্যাপারে যে কোনো প্রচেষ্টা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য এক বড় প্ররোচনা হয়ে দাঁড়াবে। যেসব ছাত্র ভোটাধিকার অর্জন করেছে তাদের রাজনীতির সঙ্গ রোধ করা কঠিন। দেশের রাজনীতিকরা যতদিন তাদের বাহন হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার করবেন এবং অ-ছাত্র কলাকৌশলে তাদের অভ্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখবেন ততদিন শিক্ষার আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকরভাবে দুষ্ট হয়ে থাকবে। সমাজের কোনো পরিবর্তন বা উন্নয়ন আসবে না, বিপ্লব তো নয়ই। শিক্ষা বিষয়টি যে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো চেতনা-ভাবনা নেই। আমাদের দেশের উন্নয়ন বেশিরভাগ শ্রমনির্ভর, নিবিড় শ্রমনির্ভর। জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন সামান্যই। তা বাড়াতে হলে শিক্ষায় উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

'বদমাশ' শব্দকে অধিকতর গুণান্বিত করার জন্য আজকাল মাস্তান ও ক্যাডার শব্দ দুটো ব্যবহার হচ্ছে। আজকালকার মাস্তানদের আগে কাপ্তেন বলা হতো। ফারসি শব্দ মস্তান মানে নেশাগ্রস্ত। সৃষ্টিকর্তার প্রেমে যাঁরা মশগুল তাঁদেরও সুফি তরিকায় মস্তান বলা হয়। ফরাসি শব্দ কার্ডার'র অর্থ পরিকাঠামো বা কোনো বাহিনীর বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণদানে সবিশেষ সিদ্ধহস্ত কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নিবেদিতপ্রাণ সার্বক্ষণিক সদস্যদের একসময় ক্যাডার বলা হতো। এখন অপ-উদ্দেশ্য সাধন অর্জনে যারা অস্ত্র চালনায় পারঙ্গম তারাই ক্যাডার নামে অভিহিত। ছাত্র নামধারী ক্যাডারদের হাতে মোবাইল ফোন থাকে। তাদের অর্থ বা অস্ত্রের অভাব হয় না। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী বড় রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ক্যাডাররা বেশি প্রতিপত্তিশীল। অপরাধজগতের সর্ববিধ বদমাইশির সঙ্গে তারা জড়িত। তাদের সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিভাগও সমীহ করে চলে। রাজনীতিকরা তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং আশকারা দিয়ে থাকে।

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হলদখল ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রত্ব বা ছাত্ররাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এসব কর্মকাণ্ড অপরাধজগতের বিষয়। প্রচলিত অপরাধ আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে এসব দমন করা যাবে না এমন নয়। এসব ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ ও শাস্তি প্রদান সুফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। যেখানে রাজনীতির কারণে সতীর্থকে খুন করার পরও প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ছাত্রকে সরকারের উচ্চমহল থেকে ক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়, সেখানে পৃথিবীর তাবৎ অপকর্মের ঢাল হিসেবে ছাত্ররা রাজনীতি করতে যে

উৎসাহিত বোধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী! চাঁদাবাজি, ছিনতাই, হোটেলে ফাউ খাওয়া, ফাউ থাকা, সতীর্থকে আঘাত বা খুন করা, শিক্ষকের ওপর হামলা করা, পরীক্ষার হলে অবাধ পরীক্ষা-ডাকাতির সুবিধা নেওয়া, দুই পরীক্ষার মাঝে ঢালাও অবকাশের দাবি – এসব কোনো আইন সমর্থন করে না। প্রচলিত আইনে এ ধরনের কর্মের জন্য যথেষ্ট শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও চিহ্নিত না করে, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য যে খয়রাতি পরামর্শ ঢালাওভাবে দেওয়া হয় তার পেছনে কোনো সদ্বিবেচনা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায় না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কর্মকর্তারা নিজেদের অপারগতার জন্য যখন সাধারণ আইনে অপরাধ দমন করতে পারেন না, তখন তারা বিশেষ করে কড়া আইনের জন্য ওকালতি করেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিফল হয়ে কেবল বিশেষ আইন পাস করে যে কোনো সার্থকতা অর্জন করা যায় না, তার একাধিক নজির আমাদের দেশেই রয়েছে। জননিরাপত্তা আইন দিয়ে বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একটা উপবিপ্লব ঘটানোর জন্য ২২টি ছাত্র সংগঠন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ গঠন করে। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রঐক্যে ফাটল দেখা যায়। খেলাপি ব্যক্তিরা দুর্বৃত্তদের তালিকা থেকে তাদের নাম খারিজ করার জন্য ছাত্রনেতাদের নানা উপঢৌকন দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে। প্রায় সবাই সেই পরীক্ষিত পন্থায় পার পেয়ে যায়। নেতৃস্থানীয় কিছু ছাত্র রাতারাতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। যেখানে আইন অপারগ, সেখানে দুর্বৃত্তদের সামাজিকভাব বয়কটের খেলো কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা এবং নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন বিশ্বব্যাপী নন্দিত হলেও আমরা দেখছি জিডিপির তুলনায় শিক্ষা খাতে ব্যয় পর্যাপ্ত নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার হতাশাব্যঞ্জক, ৫৬ শতাংশ। জিএনপির মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে শিক্ষায়। প্রাথমিক শিক্ষায় এই ব্যয় মাত্র ৩৯ শতাংশ। গ্রাম ও নগরে বৈষম্য এত বেশি যে, গ্রামের মানুষ চলতি ব্যয়ের মাত্র ৪ দশমিক ৩ শতাংশ সুবিধা ভোগ করে। আমাদের শিক্ষার পরিকল্পনা এক জটিলতম সমস্যা। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও আমরা পশ্চিমি আদলে গঠন করার চেষ্টা করছি। অর্থানুকূল্যের অকিঞ্চিৎকরতা বা সম্যক উপলব্ধির অভাব, সে যে কোনো কারণেই হোক, আমরা উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় প্রাক্-শৈশব বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি কোনো মনোযোগ দিই না। আমাদের উচ্চশিক্ষা উর্ধ্বমূল অবাঙ্শাখ হবে যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রোথিত না হয়। গত ২০০ বছর ধরে প্রাক্-শৈশব শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত দেশে যেসব নিরীক্ষা-পরীক্ষা চলেছে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে যে আলোকপাত করা হয় তা আমরা খেয়ালে রাখিনি।

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-৮৫ দশককে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা দেয়। নারীরা উন্নয়নের চালিকাশক্তি ও হিতগ্রাহী – এ বিষয়টি মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে প্রথম বিবেচিত হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব-

নারী সম্মেলনে নারীর শিক্ষার সুযোগের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে অন্যতম মূল অঙ্গীকার ছিল – নারী-পুরুষকে শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। ১৯৯৫ সালে মার্চে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে ওই অঙ্গীকারের আলোকে আরো বলা হয়, প্রত্যেক নারী-পুরুষ-শিশুর শিক্ষা, তথ্য ও উন্নয়ন প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত কর্মপরিকল্পনায় নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। সম্প্রতি উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় নাগরিকতা শিক্ষার প্রশ্ন বিবেচিত হচ্ছে। এই শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। পরিবারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বলা হচ্ছে, সরকারের পক্ষে যেমন জবাবদিহি, স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত ও জনকল্যাণমুখী হওয়া প্রয়োজন, তেমনি নাগরিককে নির্বাচনযোগ্য লোককে নির্বাচন, নিয়মিত কর প্রদান, সেবা খাতের বিল পরিশোধ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট হতে হবে। ১১ই জানুয়ারি ২০০২ সালের সংবাদপত্রের শিরোনামে চার কলাম খবর ছিল : 'ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনে বহিষ্কার ৩০০০। বিভিন্ন কেন্দ্রে বোমাবাজি, ভাংচুর। অবাধ নকলের সুযোগ দিতে ছাত্রদল নেতাদের চাপ। গ্রেফতার অর্ধশতাধিক।' তেমন ব্যতিক্রমধর্মী নয় এমন সংবাদও পরীক্ষার সময় সংবাদপত্রে স্থান পায়, যেমন–শিক্ষক-পরিদর্শক বহিষ্কার, পরীক্ষা হলে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ছুরিকাহত, পরীক্ষার হলে সেনা নিয়োগের প্রস্তাব, কারফিউ জারি করেও নকল ঠেকানো গেল না, নকল করতে দেখামাত্র গুলি করার ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব ইত্যাদি ইত্যাদি। শিক্ষাঙ্গনে এক ধরনের সিস্টেমলস বা পদ্ধতিগত ক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু অর্থ ও সময়ের ব্যাপক অপচয় নয়, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে একটা বড় আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। ছাত্র, ছাত্রের পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সরকারসহ সবার জন্য এ এক মর্মদাহী ব্যাপার।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির সংখ্যা ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষায় চাহিদামাফিক জোগান দিতে পারে না। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাদের সবার জায়গা কলেজেও হয় না। এ অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে নয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭৩ হাজার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে ছাত্র রয়েছে ৬,১৫,৪৯২ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র রয়েছে ১,০৭,৪৪৬জন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন হয় ১৯৯২ সালে। আইন প্রয়োগের ব্যাপারে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন গড়িমসি, ঘাপলা ও অনিয়ম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও তার অভাব দেখা যায় না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাঠামো না থাকলেও দেশে বিদ্যমান ত্রিশটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ সারাদেশে প্রায় ২২ হাজার ছাত্রের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এখানে নামমাত্র আইনের প্রয়োজন মেটাতে বা মুখরক্ষার্থে অতি সামান্য কিন্তু বিত্তহীন মেধাবী ছাত্রদের

লেখাপড়ার সুবিধা রয়েছে। এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নানা ধরনের আইনে অব্যাহতি আদায়ের প্রয়াসী হয় এবং প্রভাব খাটিয়ে তারা আশকারাও পেয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষা এখন সারা দুনিয়ায় এক বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা-সাময়িকীতে বিবিএ-এমবিএ পড়ার জন্য আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন শোভা পাচ্ছে। বোধহয় কৃষি-কৃষ্টির কারণে আমাদের মধ্যে বাজার, ব্যবসায়ী ও বৈশ্যবৃত্তির প্রতি একটা অনুরাগের অভাব ছিল। এখন বৈশ্যবৃত্তিতে আমরা কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছি। টাকা ছাড়া কিছুই হয় না, আর টাকা থাকলে কাঠের পাখিও হাঁ করে। বাংলা ভাষায় অর্থ-ধন-দারিদ্র্য সম্পর্কে যত বচন-প্রবচন রয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় কৃষিনির্ভর বাঙালি অর্থের তাৎপর্য বোঝে না তা নয়। সরকার-অনুমোদিত বেসরকারি কলেজগুলো নিম্নমানের মুনাফাখোরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সরকারের কোনো নজরদারি করার ক্ষমতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও ক্ষমতা দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। সরকার-বদলের পরপরই ক্রীড়াঙ্গন থেকে শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্র প্রায় প্রতিটি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনা হয়।

স্বাধীনতার পর ২০০০ সালের আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কেউই তাদের নিয়মিত মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। ২৯শে আগস্ট ২০০১ শিক্ষামন্ত্রী সংসদে বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ১০ ভাগ ছাত্রদের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় এবং বাকি ৯০ ভাগ ব্যয় হয় বেতন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে। ২৮শে জুন ২০০১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বার কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়। একজন শিক্ষকের পেছনে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কাজের স্বচ্ছতার ব্যাপারে কোনো জবাবদিহি নেই। কনসালটেন্সি করে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে দেওয়ার যে বিধি রয়েছে তা অধিকাংশ শিক্ষকই মানেন না।

সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করে শিক্ষকরাও রাজনীতি করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার তার প্রভাব বিস্তার করতে চাইতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য চরিত্র মেনেই তা করা উচিত। তেমনি শিক্ষক বা ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের যে অবস্থান তা মেনে নিয়েই তা করতে হবে। যে রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, গবেষণা বা শিক্ষাগত প্রশিক্ষণকে ব্যাহত করে বা করার প্রবণতা সৃষ্টি করে তা থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরত থাকতে হবে। যেসব কর্মকাণ্ড আইনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা দ্রুত ও দৃঢ় হস্তে দমন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইনি কাঠামো আছে তা প্রয়োগ করতে হবে। সেই কাঠামোয় আঘাত করে যদি কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও কর্তৃপক্ষ মহানুভবতার পরিচয় দেয়, তাহলে তো আত্মঘাতী রাজনীতিকে দুই বাহু বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আমার মনে হয়, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর বাড়তে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রয়োজন এখনই রয়েছে ঢাকায় আরো দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। শহর থেকে দূরে বাগানবাড়ি-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন করে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে নিরস্ত করার অভিপ্রায়ে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা সীমাহীন অপচয়ের কারখানা গড়ে ছিলেন। শহরের মাঝে যে কাঠামোগত সুবিধা পাওয়া যায় তা পরিত্যাগ করে তপোবন বানানোর আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না। আজকাল উচ্চ শিক্ষারত ছাত্রদের খণ্ডকালীন একটা রোজগারের সুযোগ করে দিতে হবে এবং তা শহরের আবহাওয়াতেই সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কী, জ্ঞানান্বেষণ, নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন, গবেষণা, না পেশা, প্রকৌশল, প্রশিক্ষণ – এ সম্পর্কে শেষ কথা কিছু নেই। একেক প্রতিষ্ঠান এবংবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়াস পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উপযোগবাদের প্রভাব ও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাণ্ডিত্য, দীপন-সন্দীপন বা নৈতিক ঔদার্যকে বাঁ-হাতি সালাম জানিয়ে অর্থনৈতিক অর্জনকে অধিকতর সমাদর করা হচ্ছে। পেশা, ব্যবসা বা বৃত্তি লক্ষ্য করে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হচ্ছে।

যেসব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আশা করা হয় তার বেশিরভাগই হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনের বা আইন-আদালতের এখতিয়ারের। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার মল্লভূমি বা বৈপ্লবিক অনুশীলনের আখড়া হিসেবে ব্যবহার করার যে প্রবণতা রাজনীতিকদের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান তার ফলেই আজ সেখানে বিদ্যাঘাতী শ্বাসরোধকর অবস্থা। তত্ত্বগতভাবে বিশ্বভুবনের কাজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত হতে পারে; কিন্তু সব সমস্যা পূরণ বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। সেই কাজ যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যাশী তাঁদের ওপর অর্পণ করা সমীচীন।

শিক্ষাঙ্গনকে জেলখানা বানানো যাবে না। এখানে সেনাছাউনির শৃঙ্খলারও প্রয়োজন নেই। দেশে প্রচলিত শৃঙ্খলাবিষয়ক যেসব আইন আছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট। যেসব ছাত্র-কর্মতৎপরতার জন্য আজ আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা উঠেছে তার সমর্থনে বিরক্তিভাব আছে, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পরাধীন যুগে দেশে সাধারণভাবে যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা বিরাজ করত তা আজ বিঘ্নিত। তখন রাজনীতিকদের মধ্যে যে সহিষ্ণুতা ও শীলধর্মের আচরণ লক্ষিত হতো তাও আজ অনুপস্থিত। উচ্চ শিক্ষাঙ্গন দেশকে পথ দেখায়। আবার তা দেশের বিদ্যমান আলোয় নিজের পথ দেখে। বয়ঃসন্ধিকাল বা বয়সের গুণে ক্রুদ্ধ তরুণদের উদ্দীপনা যে হিংস্র উন্মাদনার রূপ নিচ্ছে তা সদ্‌প্রভাবে ভিন্ন হতে পারত। আমাদের দেশে একসময় শিক্ষাঙ্গনে পুলিশের উপস্থিতি বড় অপছন্দ করা হতো। পরাধীন দেশের পুলিশের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করা হতো। আজ স্বাধীন দেশে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পুলিশের রীতিমতো ছোটখাটো ফাঁড়ি বিরাজ করছে। উপায় কী, যেখানে ছাত্রের হাতে ছাত্র খুন হওয়ার সংখ্যা নগণ্য নয়!

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

আজ পৃথিবীতে স্বাধীন রাষ্টের সংখ্যা ১৯৪টি। প্রত্যেক রাষ্ট্রের লিখিত বা অলিখিত সংবিধান রয়েছে। তার মধ্যে ধর্মপালনের নানাবিধ বিধানও রয়েছে। কোথাও একটি বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। আবার কোথাও রাষ্ট্রের নাম–ধামের পরিচয়-স্থানে একটি ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে চিহ্নিত। আবার কোথাও কোথাও ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকার মোটামুটি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়, যদিও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ও আনুষ্ঠানিকতায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কোথাও ধর্মান্তর শুধু নিষিদ্ধ নয়, শাস্তিযোগ্যও বটে। সর্বজনীন মানবাধিকারের ধর্মসম্বন্ধীয় বিধানগুলো সর্বত্র মান্য করা হয় না। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের কারণে দেশেদেশে পার্থক্য এবং যথেষ্ঠ মতবিরোধ রয়েছে। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বলতে হবে, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সকলের হোক না। রাষ্ট্র সকলের না হলে, যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারবে না তাদের আনুগত্যও রাষ্ট্র আশা করতে পারবে না।

কেবল একটিমাত্র ধর্মসম্প্রদায়কে ঘিরে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের স্বদেশ নির্মাণের যে দুটি প্রয়াস ঘটেছে তা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। পাকিস্তানে অমুসলমান বাস করে। ইসরায়েলে অ-ইহুদিরাও বাস করে। যেখানে মানুষের যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও একই রাষ্ট্রে বাস করার চেষ্টা করে। দেশত্যাগ করে ছিন্নমূল হয়ে মানুষ বাঁচতে চায় না। মানুষ প্রতিবেশীর সঙ্গে রফা করে নির্বিবাদে জীবনযাপন করতে চায়।

রাষ্ট্র সকলের—এই কথাটি যখন বলা হয়, তখন আইনের সমক্ষে সকলের সমান আশ্রয় পাওয়ার কথাই বলা হয়। কিন্তু আইনের আশ্রয় পাওয়া সহজ নয় এবং তা ব্যয়বহুলও বটে। সেক্ষেত্রে সমাজের আশ্রয় যদি পাওয়া যায় তবে তা হবে সহজ ও স্বস্তিকর। সমাজের কাছে যদি সকল ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্মপালনে আনুকূল্য পায় বা বিরোধিতা না পায় তবে তা আইনি আশ্রয়ের চেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হবে। আদালতে যাওয়ার আগে প্রতিবেশীদের কাছে যেতে হবে। পড়শিকে বড়শি না ভেবে *লাভ দাই নেইবার*— নিজের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। এই বাণীর পেছনে যে অন্তর্দৃষ্টি কাজ করেছে আমাদের তার প্রশংসা করতে হবে। আজ সারা পৃথিবীতে জাতিগত ও ধর্মগত শুদ্ধির নামে এমন হানাহানি হচ্ছে যে, মানুষ নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য এখন এক ধর্মাবলম্বীদের পাড়ায় বাস করতে চায়। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মানব সমাজে আমরা যে অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা লক্ষ করছি তা আমাদের বড় ভাবিয়ে তোলে।

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ এক দাওয়াত অভিযানে গোলাম আযম বলেন, "জামায়াত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। এটি ভারত থেকে আমদানিকৃত আদর্শ। প্রধানমন্ত্রী

এখনো ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, যা সংবিধানবিরোধী"। আসলে বাংলাদেশের পরে ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজিত হয়।

১৯৪১ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২৪ শতাংশ, ১৯৫১ সালে ২২.৪ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ১৮.৪৫ শতাংশ এবং ২০০০ সালে ১০.৫ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করলেও তাদের দুঃখ, এদেশে থাকলে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের কেউ পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেই তাদের সম্পত্তি শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি বলে সেই রাজনীতিকরা তা দখল করে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে অর্থনীতির দুই অধ্যাপক আবুল বারকাত ও সফিক উজ জামান এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, গত তিন দশকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০ লাখ লোক দেশ ছেড়েছে এবং জমি হারিয়েছে ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়ার্কে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের শেখ হাসিনা বলেন, "বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন। এক পা ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে রাখবেন না। বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করুন, অর্পিত আইন বাতিল করব না।" এই বক্তব্যের বিরদ্ধে ঐক্য পরিষদ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৩ই জুন ২০০২ সালে ভোরের কাগজে রাজেন ঠাকুর "এ দেশে সংখ্যালঘু নেই, তাই কোনো সমস্যা নেই" প্রবন্ধে লেখেন, '১৯৫৪ সালে ৭২জন হিন্দু জনপ্রতিনিধির স্থলে ২০০২ সালে তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেড় কোটি হিন্দু জনসংখ্যা ২০০২ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে কেন? এদের কি কোনো গ্রোথ নেই? সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তের কোটি হলো কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা দেড় কোটি থেকে গেল কোন কামাখ্যা গুণে!'

২০০২ সালের অক্টোবরে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্টে বলা হয়, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো লোকের ওপর হামলা-নির্যাতন হলে পুলিশ সদস্যরা তাদের সহায়তা দানে সক্রিয় হয় না।"

২৯শে জুন ২০০৪ এক সেমিনারে অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, '১৯৪৭ সালে দেশে সংখ্যালঘু ছিল মোট জনসংখ্যার ২৯.৭, ১৯৭১ সালে ২০, ১৯৭৪ সালে ১৪.৬ এবং ১৯৯১ সালে ১১.৭ শতাংশ। ৪৪ বছরে অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যালঘু দেশ ছেড়েছে।'

ভারতে হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের হিন্দু আইন এখনো বলবৎ। হিন্দু পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে। ছেলেমেয়েরা ভারতের মতো সমান নয়। এ বিষয়ে পুরুষ হিন্দুদের মধ্যে কোনো সংশোধনের তাড়া নেই। তাদের আশঙ্কা, ছেলেমেয়েরা সমান হিস্যা পেলে হিন্দু মেয়েরা মুসলমান বিয়ে করলে পৈতৃক অবিভক্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যে আপিল দায়ের করা হয় তার কেউ শুনানি করাননি।

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন তার জন্য অক্টোবর মাসে ১০জন ছাত্র-ছাত্রী অনশন ধর্মঘট করে অনাড়ম্বনর দুর্গাপূজার

সিদ্ধান্ত নেয় পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। ১২ই অক্টোবর নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বিবিসিকে বলেন, "সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ব্যাপারটা কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক, কিছুটা গুজব এবং কিছুটা সত্য।" ১৫ই অক্টোবর তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের খবর অতিরঞ্জিত। ওইদিন নরসিংদীতে কালীমন্দিরে ভাংচুর হয়। দু'দিন পর রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়াকে ডেকে সংখ্যালঘুদের ওপর হয়রানি বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ সালে দৈনিক মাতৃভূমির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মহালয়ার এক আলোচনা সভায় গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে জাতীয় মন্দির করা হবে। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা শোনা যায়নি।

১৯৯৯ সালের এপ্রিলে ছাতকের এক জনসভায় জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিউর রহমান নাকি বলেন, 'এখানে কোনো মালাউন নেই, এটা তৌহিদ জনতার মঞ্চ।' সেই বক্তব্যের জন্য হিন্দ-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাঁকে গ্রেফতারের দাবি জানায়। ৩১শে মার্চ ২০০০ সালে পল্টনের এক সমাবেশে চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করীম বলেন, "হিন্দুর নাম শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণ বন্ধ না হলে অবস্থান ধর্মঘট হবে।"

১৮ই মে ১৯৯৯ সালে বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের আবক্ষ ভাস্কর্যের ভিত্তি ভেঙে ফেলার উত্তেজনা দেখা দেয় ও কিছু ভাঙচুর হয়।

পাঞ্জাবের অমৃতসরের নিকটস্থ কাদিয়ান গ্রামের মির্জা গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সালে যে সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন তা কাদিয়ানি ও আহমদিয়া উভয় নামে পরিচিত। এ সম্প্রদায় ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘাঁটি গাড়ে। রক্ষণশীল মুসলমানরা এদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না। কিছু কিছু গোষ্ঠী, যেমন খতমে নবুয়ত চায় যে, এদের অমুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। কারণ এরা হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পূর্ণ রাসূল বললেও শেষ নবী বলেন না। বাংলাদেশের আহমদিয়ারা এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও তাদের কথা তেমন বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। মাঝে মধ্যে আহমদিয়াদের ওপর হামলা হয় এবং তাদের মসজিদকে উপাসনালয় বলতে বাধ্য করা হয়। ৮ই অক্টোবর ১৯৯৯ খুলনায় আহমদিয়া জামাতের মসজিদে খুতবার সময় বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত।

বাংলাদেশ আদিবাসীরা নিজেদের উপজাতি বলতে চায় না, কিন্তু বিএনপি ও জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের উপজাতি বলতে চেয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে মানবেন্দ্র নাথ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও তাঁদের স্বকীয় সংস্কৃতির স্বীকৃতির জন্য কিছু দাবি পেশ করেন। শেখ মুজিব তাঁদের বাঙালি হয়ে যেতে বলেন। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের কিছু বসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মানবেন্দ নারায়ণ লারমা। জনসংহতির সমস্ত শাখা শান্তিবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রীতি বা বেঁটে গ্রুপ চেয়েছিল সরকারের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে শান্তির

পরিবেশ সৃষ্টি করতে। অপরদিকে লারমা বা লম্বা গ্রুপ চেয়েছিল, দীর্ঘমেয়াদে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা বা যতদূর সম্ভব পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে। মানবেন্দ্র লারমা সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল ভেতরে ইজারা গ্রামে নিজ আস্তানায় প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সন্তু লারমা।

পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে এক সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। প্রায় বিশ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের পর ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর বিদেশ থেকে শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনর্বাসিত হয়। দেশের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। ব্যবসায়ীদের আর সশস্ত্র ব্যক্তিদের তোলা বা চাঁদা দিতে হয় না। জাতিগত বিরোধ কমে। বহিরাগত বাঙালি বসবাসকারীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সেই চুক্তির বিরোধিতা করলেও জোট সরকার গঠনের পর সেই চুক্তি বাতিল হয়নি। নাগরিক হিসেবে বাঙালি ও অবাঙালি সবার দেশের সর্বত্র যাওয়ার বা বাস করার অধিকার রয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই সরকার চুক্তির বাকি কাজ সম্পূর্ণ করেনি। আওয়ামী লীগের অজুহাত তারা যথেষ্ট সময় পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এক ভূমি কমিশন গঠন করা হলেও বিধি-নিয়মাদি প্রণয়ন না হওয়ায় ভূমি সংস্কারে তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

১৯৯২ সালের জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষার কারণে সংখ্যালঘুদের অধিকারের ঘোষণায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা বারবার এসেছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বিকাশে সহায়তাদানের কথা বলা হয়েছে। ওই ঘোষণায় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সংগঠন ও সমিতি রক্ষা করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার বিকাশ এবং সম্ভব হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে।

১৯৯৫ সালের আদিবাসীদের অধিকারের খসড়া ঘোষণায় আদিবাসীদের নিজেদের ভাষার পুনরুজ্জীবন, ব্যবহার, উন্নয়ন বা সম্প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়। সম্ভব হলে আদিবাসীরা তাদের ভাষায় তাদের স্বকীয় মিডিয়া মাধ্যম পরিচালনা করতে পারবে। এসব আদিবাসীর অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন ও সংবিধানে প্রতিফলিত হতে হবে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে, আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ২৯টি আদিবাসীর কথা উল্লেখ করা হয়। আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা যাই হোক, তাদের ভাষার সংখ্যা ৩০টির বেশি নয়। এমন অনেক ভাষা রয়েছে যেগুলো ছোট অনেক জাতির সাধারণ ভাষা। ওঁরাও, মাহালি, মালো, রাজোর সিং, গজু প্রভৃতি গোষ্ঠীর আদি ভাষা কুরুক হলেও বর্তমানে এদের প্রত্যেকেই শাদরি ভাষা বোঝে। এদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণমালা প্রচলিত আছে। খাসিয়া ও গারোদের ক্ষেত্রে রোমান হরফ এবং হাজং, কোচ ও ওঁরাওদের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহৃত হচ্ছে। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও অভিধান রয়েছে। মণিপুরিদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে সাঁওতালরা অলচিকি ও রোমান হরফ এবং বাংলাদেশে বাংলা হরফ ব্যবহার করে। শতকরা ৯৪ ভাগ আদিবাসীই বাড়িতে নিজ ভাষায় কথা বলে। মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না থাকায় প্রায় ৫০ শতাংশ আদিবাসী শিশু শিশুশ্রেণি শেষ করার

আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে যায়। একটা সুলক্ষণ দেখা যায়, আদিবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এ ব্যাপারে তারা যেসব অভাবের সম্মুখীন হয় তা পূরণের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

১৯৮৮ সালের ৩০শে মে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে কাজ করার জন্য একটি সংগঠন 'হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা দেওয়ার পর দেশের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। ইদানীং সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা ধারণা দানা বাঁধছে, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দেশে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত।

কয়েক বছর আগে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য 'ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশ' ১০টি উপায় সুপারিশ করে:

"বলনে, কথনে, সভায়, ভাষায় ও আচরণে সতর্ক থাকতে হবে; নিজেদের এলাকার জনগণের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে; আপনার এলাকার জনগণের, বিশেষ করে যুবসমাজের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে; বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পর্বে মাত্রাতিরিক্ত প্রচারণা ও জাঁকজমকতা পরিহার করতে হবে; ত্রাণ বা সেবামূলক কার্যক্রমকে সুসমাচার প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে; এলাকার সাধারণ জনগণের জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে; একই এলাকার বিভিন্ন মণ্ডলীর খ্রিস্টীয় নেতাদের একতাবদ্ধ হতে হবে; বৈরী পরিবেশে প্রয়োজনে সভা-সমাবেশকে ছোট করে আয়োজন করতে হবে; বিদেশি মিশনারি বা সমাজকর্মীকে মুখ্য ভূমিকা পালনে বিরত রাখতে হবে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য থেকে ক্ষান্ত থাকতে হবে।"

২১শে নভেম্বর ২০০৩ সালে এ সম্পর্কে 'বাংলাদেশ খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের' বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে আমি দুটো কথা বলেছিলাম : "সংখ্যালঘুদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাঁচি চিনতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকেও সংখ্যালঘুদের বেদনা বুঝতে হবে। সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য সহিষ্ণুতার কোনো বিকল্প নেই। নিজের ধর্মকর্ম পালনে এবং ধর্মপ্রচারে অপর ধর্মকে আঘাত দিয়ে কোনো কথা না বলাই ভালো।"

সংস্কৃতি

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নাকি কিছুই টেকে না, তা শুধু কৃষিকর্মের জন্য ভালো। জলবায়ুর বিরূপ প্রকোপে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য কর্ম হয় হারিয়ে গেছে, নয় জরাজীর্ণ এবং এক্ষণে সংরক্ষণেরও অযোগ্য। বিজ্ঞানের আশির্বাদে জলবায়ুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার জন্য তেমন উদ্যমহীনতার আর প্রয়োজন নেই।

একাত্তরের পর আমাদের যেসব অর্জন উল্লেখ করার মতো, তার মধ্যে আমাদের শিল্প-নাট্য-সাহিত্যের কথা বলতেই হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা অতিমাত্রায় সরকারমুখাপেক্ষী। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার জন্য স্বাধীন মনকে সরকারের কাছ থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া ভালো। আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তো পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত নয়, বরং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রায় বড় অসুখী জীবনযাপন করছে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের দৃষ্টিতে গত শতাব্দীর সেরা দশটি মননশীল বই – বদরুদ্দীন উমরের *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭); আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৯); আরজ আলী মাতুব্বরের *সত্যের সন্ধান* (১৯৭৩); মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের *যথাশব্দ* (১৯৭৪); আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৭৮-১৯৮৩); আহমদ ছফার *বাঙালী মুসলমানের মন* (১৯৭৯); আবদুল মান্নান সৈয়দের *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা* (১৯৮০); জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬); মঈদুল হাসানের *মূলধারা একাত্তর* (১৯৮৬); আবু জাফর শামসুদ্দিনের *আত্মস্মৃতি* (১৯৮৯-১৯৯০)। অন্যদিকে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বিবেচনায় গত শতাব্দীর সেরা দশটি সৃজনশীল বই – জসীমউদ্‌দীনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৪); আবুল মনসুর আহমদের *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৪); ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি* (১৯৪৪); সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লাল সালু* (১৯৪৮); অদ্বৈত মল্লবর্মনের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫১); সৈয়দ মুজতবা আলীর *দেশে বিদেশে* (১৯৪৯); শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২); মুনীর চৌধুরীর *কবর* (১৯৬৬); আল মাহমুদের *সোনালী কাবিন* (১৯৭৩); আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* (১৯৯৬)। (সূত্র: দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৪ই এপ্রিল ২০০০, নববর্ষ সংখ্যা)

২৭ শে জানুয়ারি ১৯৯৯ কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, 'ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা ভাষা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ।' ওই বইমেলায় কবি শামসুর রাহমান বলেন, 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, তবে আমরা স্বতন্ত্র।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভুল করে মুখ্যমন্ত্রী বলার কয়েকদিন পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, 'তিনি ভারতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। ঘোষিত কর্মসূচি সফল করে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সক্ষমতার আসনে বসান।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ধর্ম নানাভাবে বিভাজনের ভূমিকা পালন করে। দাউদ হায়দার, শামসুর রাহমান, তসলিমা নাসরিন ও হুমায়ুন আজাদকে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের বক্তব্যের জন্য। ৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৮ সালে তসলিমা নাসরিনের গ্রেপ্তার দাবিতে সচিবালয়ের সামনে ইসলামি ঐক্য জোটের কর্মীরা গাড়ি ভাঙচুর করে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'তসলিমা নাসরিন এবং তাঁকে যারা হুমকি দিচ্ছেন তাঁরা সবাই সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।'

১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ ইসলামপন্থিদের পক্ষে গোলাম আযম বলেন, 'যারা এ দেশের মুসলিম জাতিসত্তায় বিশ্বাস করে, দেশকে স্বাধীন রাখতে চায় এবং যারা ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের চেতনায় বিশ্বাসী তাদের সাহিত্যই এদেশে চলবে। যারা কলকাতার স্টাইলে সাহিত্য রচনা করে, তাদের দেশপ্রেম নেই; তাদের সাহিত্য এ দেশে চলবে না।'

চিত্র

জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের ছবির ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশে একটি নিষিদ্ধভাব ছিল। একেশ্বরবাদের উপাসনায় চিত্ররূপ অন্তরায় হতে পারে, বিশেষ করে চোখের চাহনি। আকবর বাদশাহ বলতেন, 'চিত্রশিল্পী তাঁর চিত্রকর্মে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না, সেই অপারগতাই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তাঁর এক তাৎপর্যময় উপাসনা।'

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৯৪৮ সালে দীন-দরিদ্র অবস্থায় ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু। সেই প্রতিষ্ঠান এমন ছয়জন শিক্ষাগুরু পেয়েছিল, যাঁদের একনিষ্ঠ কর্মে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে যায়। জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিকউদ্দিন আহমদ, খাজা শফিক আহমদ ও শফিকুল আমীনের তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু হয়। আমাদের শিল্পীরা পঞ্চাশের মন্বন্তর, মনপুরার জলোচ্ছ্বাস ও উড়িরচরের ধ্বংসস্তূপের শুধু ছবিই আঁকেননি, এস এম সুলতানের তুলিতে তো পেশিবহুল কৃষক-কিষানির চোখে স্বপ্নের মায়া খেলে যায়। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দ্যোতনার চিত্রও সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদী কণ্ঠে কামরুল হাসানের 'এই জানোয়ারদেরকে হত্যা করতে হবে' ধ্বনিত হয়েছে। আবার স্বৈরশাসনকে ধিক্কার দিয়ে তিনি এক সর্পিল ছবি এঁকে অন্তিম ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছেন – 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে'।

সংগীত

উচ্চাঙ্গ সংগীত বা মার্গ সংগীতের জন্য যে দরবারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন, তার অভাব ছিল বাংলাদেশে। বাংলাদেশের যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতে নাম করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই পশ্চিমে ভারতে গিয়ে বড় হয়েছেন। ১৯৪৭ সালের পরে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার যে উপমহাদেশীয় যোগসূত্র ছিল তা ছিন্ন হয়। চর্যাগীতি থেকে গীতগোবিন্দ পর্যন্ত বাংলা সংগীতের বিকাশ ঘটে সর্বভারতীয় প্রবন্ধ সংগীতের ওপর ভিত্তি করে। বাংলার পদাবলী, কীর্তন, টপ্পা ও ঠুমরির মধ্যে হিন্দুস্তানি সংগীতের প্রভাব থাকলেও সংগীত–

প্রধান নয় বরং তাকে কথাপ্রধান বলা যায়। বাংলা গানের উৎকর্ষ লক্ষিত হয় যখন আমরা শ্রেষ্ঠ সুর ও শ্রেষ্ঠ বাণীর সম্মিলন দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানের সনাতন পদ্ধতি ভেঙে নতুন গায়নরীতিতে ভাবগীতি, রাগপ্রধান গান, লঘুসংগীত প্রভৃতি রচনা করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের হাতে রাগপ্রধান গান এক অপরূপ বৈচিত্র্য ও সুষমা লাভ করে। পাকিস্তান আমলে আবদুল আহাদের (১৯১৮-১৯৯৪) সুরারোপে 'পূরব বাংলার শ্যামলিমার পঞ্চনদীর তীরে অরুনিমার' গানটি কওমি তারানা হিসেবে জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৫ সালের পরে আহাদ আকারমাত্রিক স্বরলিপির পরিবর্তে স্টাফ নোটেশান ব্যবহার শুরু করেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে লোকসংগীতের কিছু পার্থক্য রয়েছে। গানের ভঙ্গিও বিভিন্ন। মার্গ সংগীত বসে গাওয়া হয়। লোকসংগীত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গাওয়া হয়। বাংলার সংগীত উচ্চাঙ্গ সংগীতমুখী নয়, তা লোকসংগীতমুখী। রেডিও-টেলিভিশনের পরিবর্তে লালন সংগীত, মাইজভাণ্ডারি ইত্যাদি লোকসংগীত আজ শুধু আঞ্চলিক নয়, জাতীয় স্তরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বিদেশি পপ সংগীত যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেভাবে ইউরোপীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত আমাদের দেশে সমাদর পায়নি। কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দীর মতে গত শতাব্দীর সেরা দশটি আধুনিক গান – সেই চম্পা নদীর তীরে; পথে যেতে দেখি আমি তারে; আমি সাগরের নীল; তারা ভরা রাতে; জীবন সে তো পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দু; হারানো দিনের মতো হারিয়ে গেছো; অনেক বৃষ্টি ঝরে তুমি এলে; দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক; আমার এ দুটি চোখ; শুকপাখি রে। অন্যপক্ষে সুরকার আলাউদ্দিন আলীর বাছাইকৃত গত শতাব্দীর সেরা দশটি ছায়াছবির গান – এ কি সোনার আলোয় (মনের মতো বউ); গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে (স্বরলিপি); তোমারে লেগেছে এত যে ভালো (রাজধানীর বুকে); আমি যে আঁধারে বন্দিনী (সূর্যকন্যা); শুধু গান গেয়ে পরিচয় (অবুঝ মন); এত সুখ সইব কেমন করে (শুভদা); ওরে নীল দরিয়া (সারেং বউ); এই মন তোমাকে দিলাম (মানসী); এই দুনিয়া এখন তো আর (দুই পয়সার আলতা); আমার বুকের মধ্যেখানে (নয়নের আলো) (সূত্রঃ দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৪ই এপ্রিল ২০০০, নববর্ষ সংখ্যা)

নৃত্য

যতগুলো মঞ্চশিল্প আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হলো নৃত্য। কেননা নাচ করতে গেলে সংগীতশিল্পী, যন্ত্রসংগীতশিল্পী, অনেকেরই সহযোগিতা লাগে। আবার নাচের ক্ষেত্রে সাত-আট বছরের প্রশিক্ষণও নিতে হয়। কথক, মণিপুরি, ওড়িশি, ভরতনাট্যম ইত্যাদি নাচ আমরা বাইরে থেকে আমদানি করেছি। এটা অনস্বীকার্য যে, আশির দশকে ধ্রুপদী নৃত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে নাচের গুণগত পরিবর্তন হয়। নাচটা যে একটা পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণের বিষয় সেটা এই দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ দেশের নৃত্যশিল্পের জন্য জরুরি বিষয়গুলো হচ্ছে–নৃত্যকলা বিভাগ চালু করে উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; জাতীয় পাঠ্যক্রমে নৃত্যবিষয়ক সিলেবাস প্রণয়ন করা; এবং পরিবেশনামূলক শিল্পকর্মের জন্য একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা।

বাংলাভাষী অঞ্চলে উচ্চাঙ্গ নৃত্য অভিজাত শ্রেণীর কাছে তেমন পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। নবাব-জমিদারদের জলসাঘরে বাইজি নৃত্যের প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যের ক্ষেত্রে কিছু নতুন উন্মেষ ঘটান। উদয়শঙ্কর (১৯০০-১৯৭৭) তাঁর আলমোড়া নৃত্য প্রতিষ্ঠানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আমাদের দেশে পঞ্চাশের দশকে বুলবুল চৌধুরী (১৯১৯-১৯৫৪) ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক ও মণিপুরি নৃত্যের ঢঙে *চাঁদ সুলতানা*, *আনারকলি* ও *হাফিজের স্বপ্ন*–এ উচ্চাঙ্গ নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা এবং বীর ও করুণ রস প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। ঢাকায় বুলবুল একাডেমি ফাইন আর্টস তাঁর স্মৃতি বহন করছে। সমর ভট্টাচার্য কত্থক নৃত্যের চর্চা করেন। ওস্তাদ মঞ্জুর হোসেন খান ১৯৬৫ সালে ঢাকায় এসে লক্ষ্ণৌ ঘরানার কত্থক নৃত্যের প্রচলন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরি ও ওড়িসি নৃত্য অনুশীলিত হচ্ছে। কথাকলি নৃত্যের চর্চা অবশ্য নেই। মণিপুরি নৃত্যের দুই প্রধান ভাগ – তাণ্ডব ও লাস্য। সাধারণত তাণ্ডব নৃত্য ছেলেরা এবং লাস্য নৃত্য মেয়েরা পরিবেশন করে। বর্তমানে ভরতনাট্যমে সোমা মোমতাজ, শুক্লা সরকার, বেলায়েত হোসেন ও বেবি রোজারিও; কত্থকে সাজু আহমদ, মুনমুন আহমেদ, শিবলী মহম্মদ, কচি রহমান, লাভলী কোরেশী, বিপ্লব কর ও লিখন রায়; মণিপুরি নৃত্যে তামান্না রহমান ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওড়িসি নৃত্যে বেনজির ছালাম ও মিন বিল্লাহ নাম করেছেন। সাম্প্রতিককালে আদিবাসীদের লোকনৃত্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

থিয়েটার

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৫ কলকাতার ২৫ নম্বর ডোমটোলায় ভারততত্ত্ববিদ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) বেঙ্গল থিয়েটারের গোড়াপত্তন করেন। দুই দিন পরে এম *ডেলগে দ্য ডিসগাইজ*-এর বাংলা করে তিনি *সংবেদন* নাটক মঞ্চস্থ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শেক্সপিয়ারকে নিয়ে বাংলাভাষীরা এমন এক মহামাতনে মাতে ইংল্যান্ডের বাইরে যা তেমন দেখা যায় না। ১৮৫৮ সালে মাইকেল মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* বাংলা ভাষার প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। প্রতিবাদী নাটক হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* ও মীর মশাররফ হোসেনের *জমিদার দর্পণ*-এর নাম উল্লেখ করা দরকার। ১৯৪৭ সালের পরে বাংলাদেশের নামকরা নাটক নূরুল মোমেনের *নেমিসিস*, সাঈদ আহমদের *কালবেলা*, সৈয়দ ওয়ালিউল্লার *বহিপীর*, *তরঙ্গভঙ্গ*,*সুরঙ্গ*,*উজানে মৃত্যু* এবং মুনির চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর*, *কবর* ও *বিধি*। স্বাধীনতা উত্তরকালের উল্লেখযোগ্য নাটক সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারা জীবন*, আবদুল্লাহ আল-মামুনের *এখনও ক্রীতদাস*, মামনুর রশিদের *ওরা কদম আলী*, সেলিম আলদীনের *কেরামত মঙ্গল*, *চাকা*; মমতাজ উদ্দিন আহমদের *রাজা অনুস্বারের পালা*। নাট্যকার সাঈদ আহমেদের বিবেচনায় গত শতাব্দীর সেরা ১০টি নাটক – আসকার ইবনে শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা*, মুনীর চৌধুরীর *কবর*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *বহিপীর*, সাঈদ আহমেদের *কালবেলা*, আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র*, আবদুল্লাহ আল মামুনের *সুবচন নির্বাসনে*, সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, মামুনুর রশীদের *ওরা কদম আলী*, সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* ও মমতাজ উদদীন

আহমদের *সাত ঘাটের কানাকড়ি।* ১৯৯৯ সালে ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট ১৮৭৬ বাতিল করা হলে নাট্যকর্মীরা খুশি হন।

চলচ্চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম যে বায়োস্কোপ প্রতিষ্ঠান–দ্য রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি – গঠিত হয় তার প্রাণপুরুষ ছিলেন মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামের অধিবাসী হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭)। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র আর্কাইভে রয়েছে ঢাকায় নির্মিত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য নির্বাক চিত্র *সুকুমারী* (১৯২৭-২৮) ও প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক চিত্র *দ্য লাস্ট কিস* (১৯৩১)-এর স্থির চিত্র। প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৬৫) ও এফডিসির প্রথম ছবি *আসিয়া* (১৯৫৭-৬০)-এর প্রিন্ট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* অবলম্বনে এ জে কায়ছার নির্মিত *জাগো হুয়া সাবেরা* মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। ১৯৬৩-৬৬ সালে উর্দু ছবির দাপটে কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষার্থে লোককাহিনীর ওপর ভিত্তি করে একাধিক ছবি নির্মিত হয়। *রূপবান* বাণিজ্যিক সাফল্যের অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে।

সরকারি অনুদানে নির্মিত ও একাধিক পুরস্কারে ভূষিত মশিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর *সূর্য দীঘল বাড়ী* এক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। তানভীর মোকাম্মেলের *নদী ও নারী* (১৯৬৫), *হুলিয়া ও লাল সালু* (২০০২), জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০), *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১); মোরশেদুল ইসলামের *আগামী* ও *চাকা* (১৯৯৩), তারেক মাসুদ দম্পতির *আদমসুরত, মুক্তির গান, মুক্তির কথা, নারীর কথা* এবং *মাটির ময়না* (২০০২) – আমাদের চলচ্চিত্র জগতে সুস্থ চিত্রের প্রতি দর্শকদের আনুগত্য ধরে রাখতে পেরেছে, বিশেষ করে যেখানে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি সেন্সর বোর্ডের বুদ্ধিমান সদস্যরা যে রুচি ও মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তাতে অশ্লীল চিত্রগুলো সহজেই সদর দরজা দিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেসব চলচ্চিত্রে রুচি ও সংস্কৃতিবান মনের পরিচয় রয়েছে তাদের হয়রানির শেষ নেই। এফডিসির সমর্থন ছাড়াই বরং বিরোধিতা সত্ত্বেও *চাকা, লাল সালু, মাটির ময়নার* মতো ছবি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। আবার *আগামী, ধূসর যাত্রা, নদীর নাম মধুমতী, মুক্তির গান, কর্ণফুলীর কান্নার* মতো কিছু ছবি সেন্সর বোর্ডের অহেতুক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

স্থাপত্য

মাটি খুঁড়ে পুকুর বানিয়ে সেই খোঁড়া মাটি দিয়ে ভিত উঁচু করে আমরা বাড়ি বানাই। সেই *বাস্তুবিদ্যার* আদলে লুই কান আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন বানান। এটা তৈরি করতে তাজমহলের মতো ২১ বছর (১৯৬২-১৯৮৩) লেগেছিল। সেই ভবনে সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করা হয়।

আমাদের শহীদ মিনারের স্থপতি হামিদুর রহমান (১৯২৮-১৯৮৪) তাঁর মূল নকশার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'স্তম্ভগুলো যথাক্রমে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি তথা মা ও তার

শহীদ সন্তানদের প্রতীক অর্ধবৃত্তাকারে মা তার শহীদ সন্তানদের নিয়ে দণ্ডায়মান, মা অনন্তকাল ধরে সন্তানদের রক্ষা করেছেন, যারা তার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের বিসর্জন দিয়ে গেছেন আর সেই জন্য গৌরবান্বিত মা তার সন্তানদের দোয়া করছেন। সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় মা ঝুঁকে পড়েছেন একটু স্নেহে, আর চারটি সন্তানদের মধ্য দিয়ে তিনি তার সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন।'

১৪ই ডিসেম্বর ২০০৬ দৈনিক *সমকালকে* জাতীয় স্মৃতিসৌধের (১৯৮২) স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা চাপের মুখে প্রকৃতি থেকে কিছু একটা উঠে আসছে। সেই কনসেপ্ট থেকেই এটার জন্ম।' স্মৃতিসৌধের সাত জোড়া দেয়াল ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালের সাতটি ক্রমকালের প্রতীক। স্থপতি বলেন, '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে ৭-এর একটা মিল রেখেছি আমি। যেমন– '৫২র ভাষা-আন্দোলন, ৫ আর ২ মিলে ৭, বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, ১৬ই ডিসেম্বরের ১ আর ৬ মিলে ৭, ২৫শে মার্চের ২ আর ৫ মিলে ৭, আর সব শেষে ৭১-এর ৭ অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধ। বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ (১৯৭২)-এর স্থপতি মোস্তফা হাদী কুদ্দুস। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ (১৯৮৬)-এর স্থপতি ছিলেন তানভীর করীম।

নিতুন কুণ্ডু (১৯৩৫-২০০৬) একাধিক আকর্ষণীয় ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। তার মধ্যে ঢাকা সোনারগাঁও হোটেলের মোড়ে 'সার্ক ফোয়ারা', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাবাস বাংলাদেশ' এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের প্রবেশ মুখে 'সাম্পান' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

খেলাধুলা

খেলাধুলার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি উদ্যোগে ১৯৭২ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড। এই বোর্ডের আওতায় ২৯টি রেজিস্টার্ড ফেডারেশন রয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, ক্যারমের মতো জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত খেলার ফেডারেশন; তেমনি রয়েছে কুস্তি, ভারোত্তলন, স্কোয়াশ, বিলিয়ার্ড, স্নুকার প্রভৃতির মতো কম জনপ্রিয় খেলার ফেডারেশন।

দেশের স্পোর্টস ক্লাবগুলো খেলাধুলার উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে বিখ্যাত ক্লাবগুলো হচ্ছে : আবাহনী ক্রীড়াচক্র, আরামবাগ, অ্যাজাক্স, আজাদ স্পোর্টিং, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, দিলকুশা স্পোর্টিং, জিএমসিসি, কলাবাগান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রহমতগঞ্জ, সূর্যতরুণ, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ও ওয়ারী।

১৯৭২ সালে হাডুডু খেলাকে কাবাডি নামকরণ করে তাকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। পরের বছর বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় কাবাডি দলের সঙ্গে টেস্ট খেলে। ১৯৮০ সালে প্রথম এশীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত চ্যাম্পিয়ন ও বাংলাদেশ রানার্স আপ হয়। বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে প্রথমবারের মতো কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ রৌপ্য পদক লাভ করে। ১৯৯৯ সালে সরকার আন্তস্কুল প্রতিযোগিতায় কাবাডির অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক করেছে।

আমরা ফুটবল বলতে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল বা সকারকেই বুঝে থাকি। ১৮৯৩ সালে ঢাকা ও কলকাতায় ফুটবল খেলার উদ্দীপনা দেখা যায়। ওই বছর আইএফএ শিল্ডের খেলা শুরু হয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ফুটবল লিগ শুরু হয়। ১৯৮০ সালে শুরু হয় ফেডারেশন ফুটবল। দেশের ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ মোহামেডান স্পোর্টিং, আবাহনী ক্রীড়াচক্র, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স) ট্রফিতে অংশ নেয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের আইসিসি ট্রফিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়। বাংলাদেশ এখন আইসিসির পূর্ণ সদস্য।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য। ১৯৮০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ব্যতীত প্রতিটি অলিম্পিকে সদস্য ও প্রতিযোগী পাঠিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে ।

বাংলাদেশের জনসংযোগ মাধ্যম

সংবাদপত্র

আধুনিক সাংবাদিকতা সম্ভব হয়েছে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ও সাধারণ শিক্ষার প্রসারের ফলে। ১৪৫৬ সালে গুটেনবার্গ *বাইবেল* প্রকাশিত হওয়ার পর মুদ্রণ-যোগাযোগ একটা মিশন বা সদ্‌কর্ম হিসেবে মানবসমাজে আবির্ভূত হয়। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকগণ আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে এই মুদ্রণ-উদ্যোগে নিয়োজিত থাকেন।

যে মুদ্রণ পদ্ধতি গোড়ায় মিশন হিসেবে শুরু হয় তা কালক্রমে প্রফেশন বা পেশায় রূপান্তরিত হয় এবং সেই পেশা মহান পেশা হিসেবে আদৃত হয়। এখন সেই পেশা অনেক ক্ষেত্রে নিছক ব্যবসা ও বিনিয়োগের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক বিষম অন্তহীন প্রচারযুদ্ধে নিয়োজিত বর্তমানের মুদ্রণ-মাধ্যম খবর বা তথ্যাদির চেয়ে বিনোদনের ও ক্রীড়াজগতের তারকাদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। যেখানে মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে চাঞ্চল্যকর, লোমহর্ষক ও যৌন উত্তেজক সংবাদ পরিবেশনে দ্বিধাহীন তৎপরতা লক্ষ করা যায়। ব্যবসার জগতের দশদিক থেকে বিনিয়োগকারীরা ছুটে আসছেন। আমাদের দেশেও নব্যধনীরা যোগাযোগ মাধ্যমে বিনিয়োগ করছেন। যেখানে টাকা সেখানে তো ব্যবসায়ীরা যাবেই। এই প্রয়াস মন্দ নয় এবং নিন্দনীয়ও নয়। তবে কখনো সখনো রসবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন দেখা যায় কেবল টাকার জোরে সংবাদপত্রের মালিক – যাঁর লেখায়, প্রতিবেদন বা সম্পাদনায় কোনো দান-অবদান নেই–তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিদার সাজছেন। যোগাযোগ ব্যবসায়ীরা তাঁদের বিক্রিতব্য পণ্য বিক্রি করতে চাইবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে যেহেতু সাধারণ মানুষ যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভরসা করে মুখ চেয়ে থাকে এবং সমাজের অভিভাবক হিসেবে তাঁদের গণ্য করে, সেহেতু তাঁদেরকে এক ধরনের ট্রাস্টি বা ন্যায়পালের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বাংলায় সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম চেষ্টা ইংরেজদের হাতে। ১৭৮০ সালে প্রথম সংবাদপত্র *বেঙ্গল গেজেট* অথবা *ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাইজার।* অনুমান করা হয় ১৮৪৭ সালে *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ* প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটি পূর্ববাংলার প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র। উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে মোট ২৫২টি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪ সালে সংবাদপত্রের সংখ্যা নিদারুণভাবে সীমিত করা হয়। সম্পাদকদের সেলফ্‌সেন্সর বা আত্মদমনের জন্যও সমস্যার সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের গোড়ার একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রকাশনা বন্ধ করা হলে আমি একটি শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিকে আমার মন্তব্য চিঠির আকারে পাঠিয়েছিলাম। চিঠিটি ছাপানো হয়নি। সত্তরের দশকের

গোড়ার দিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশের জন্য যখন চল্লিশ হাজার মামলা রুজু করা হয় তখন একটি ইংরেজি চিঠিতে মন্তব্য করি যে, এমন করলে বিচার ব্যবস্থার প্রণালী সব বন্ধ হয়ে যাবে এবং সরকারকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না। দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিকে চিঠিটা ছাপানো হয়নি। ১৯৮১ সালে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বক্তব্য 'সৈনিকরা ব্যারাকে ফিরে যাবে' একটি বিদেশী সাপ্তাহিক, মার্কিন মুলুকের *নিউজ উইক*-এ কেবল প্রকাশিত হয়। ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে তখন সেনাবাহিনীপ্রধানের সেনানিবাস থেকে সেনানিবাসে দৌড়-ঝাঁপের কথা বেশ বড় করে ছাপায়। দেশের অসামরিক শাসন ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মতকে বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়।

সংবাদপত্র আজ এক বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্র। বিত্তবানদের এক আকর্ষণীয় মৃগয়ার বস্তু। সেইদিন কবে গেছে, যখন কায়ক্লেশে নিবেদিত সাংবাদিক অক্ষরডালা থেকে খুঁটেখুঁটে অক্ষর আহরণ করে মুদ্রণের কাজ গোছাতেন। আজকাল বোতাম টিপলে মুদ্রণের কাজ হয়। সেই বোতাম টিপতে অনেক টাকা লাগে। সেই অনেক টাকার লোক সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করে বলে অনুমিত হয়। কিন্তু সবটুকু সত্য নয়। কোনো সংবাদপত্রের মালিকের পক্ষে কেবল তাঁর স্বীয় স্বার্থের জন্য, তাঁর মুনাফার জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি যতই তাঁর নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করুন, তিনি যতই স্বীয় স্বার্থে আত্মদমন বা সেলফ্‌সেন্সর করুন এবং সাংবাদিকদের কলম বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করুন তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ সফল হওয়া অসম্ভব। তাঁকে সাংবাদিকদেরকে একটা ন্যূনতম স্বাধীনতা দিতেই হবে, তা না হলে সংবাদপত্র চলবে না। পাঠকেরা যেভাবে সংবাদপত্রের ওপর ভরসা করে সেই অনুপাতে যদি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতায় ও বিশ্বাসযোগ্যতায় কোনো সংবাদপত্র সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে সে সংবাদপত্র পাঠক পড়বে না। পাঠক না পড়লে সে সংবাদপত্র চলবে না।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে উল্লেখযোগ্য নাম *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিঞা, *বাংলাদেশ অবজারভার*-এর আবদুস সালাম, *দৈনিক সংবাদ*-এর জহুর চৌধুরী হোসেন ও সন্তোষ গুপ্ত।

১৯৭৩ সালের মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইন এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত করে। ১৯৭৫ সালে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় মালিনাকায় প্রকাশিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া অন্য সব সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। ১৯৭৫ সালের আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পর্যায়ক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইনে সংশোধন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেকখানি অবারিত করে। ১৯৯৮ সালের প্রেস ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মাত্র ১২ শতাংশ পাঠক প্রকাশিত খবর বিশ্বাসযোগ্য মনে করে এবং ৫৫ শতাংশ পাঠক মনে করে পত্রিকাগুলোর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে।

টেলিভিশন

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৪ বর্তমান রাজউক ভবন থেকে মাত্র ৩০০ ওয়াট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ঢাকা ও আশপাশে ১০ মাইল এলাকার জন্য প্রতিদিন তিন ঘণ্টার সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৭২ সালে টেলিভিশনকে জাতীয়করণ করা হয়। এখন ১২টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ৯৫ ভাগেরও বেশি এলাকায় টিভি সম্প্রচার হচ্ছে। ১৯৮০ সালে রঙিন অনুষ্ঠান শুরু হয়। এখন প্রতি ৬০জনের জন্য একটি টেলিভিশন আছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেল চালু করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি ওঠে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিশন গঠিত হয়। তার প্রধান সরকারি কর্মকর্তা আসফউদ্দৌলা ৩রা জুলাই, ২০০১ সালে বলেন, 'বেতার-টিভিকে যা দেওয়া হচ্ছে, তা স্বায়ত্তশাসন নয়, আয়ত্তশাসন।'

নির্বাচন

আমাদের দেশে কিংবদন্তিতে রয়েছে রাজা গোপাল ও সুলতান হোসেন শাহ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে দুটি স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করেন। প্রায় সব আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কোনো এক ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের মোকাদ্দম বা গ্রামপ্রধান, পাটোয়ারি বা করআদায়কারী নির্বাচন করত। গ্রাম মোকাদ্দমদের পরামর্শক্রমে পরগনা কাজি ও থানাদার নিযুক্ত হতেন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস গ্রামপঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিলোপ করলেন। উনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তা অনানুষ্ঠানিভাবে টিকে ছিল।

আমাদের ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের শেকড় খোঁজার কাজ চিত্তাকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। বাস্তবে অবশ্য আমরা এখন দেখছি, গণতন্ত্রের পুরো আদল, তার চোখ-কান-মুখ সব প্রতীচ্য থেকে আগত। আক্ষরিক অর্থে গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত গণতন্ত্র হচ্ছে 'demos'-এর 'kratos' অর্থাৎ জনগণের শাসন। গ্রিসে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ শাসন বোঝাত। যেসব নগররাষ্ট্রে এই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে সেসব রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কদাচিৎ ১০ হাজারের বেশি ছিল। নারী ও দাসের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নাগরিকরা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারত। আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ ও আইনের বিচারের ক্ষেত্রে এখতিয়ার বা ক্ষমতার কোনো ফারাক ছিল না। গ্রিক ঐতিহ্য অতিস্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। সোলন, লাইকারগাস ও পেরিক্লিসের গণতন্ত্রে আধুনিক গণতন্ত্রের কিছু কিছু রেশ দেখা যায়। গ্রিক দার্শনিক পণ্ডিতদের কাছে গণতন্ত্রের অবশ্য তেমন কোনো কদর ছিল না। সক্রেটিস গণতন্ত্র অপছন্দ করতেন, প্লেটো মূর্খের শাসন বলে গণতন্ত্র ঘৃণা করতেন এবং অ্যারিস্টটল একে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করতেন। জাতি-রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে ঐতিহ্যগত নির্বাচন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে। নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৮৬৮ সালে পৌর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে পাশ্চাত্য ধরনের পৌর কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। তখন শুধু পৌর করদাতাদের সদস্য নির্বাচিত করার অধিকার ছিল। ১৮৮৪ সালে প্রবর্তিত আইনবলে ঢাকাসহ গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাগুলো নির্বাচনী ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। একই আইনে আংশিক নির্বাচন ও আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে জেলা কমিটি ও স্থানীয় বোর্ডগুলো গঠিত হয়। পৌর ও গ্রাম এলাকায় এই সীমিত নির্বাচনী ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই গ্রামপর্যায়ে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের নতুন পর্বের সূচনা হয়।

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভায় নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। তখন থেকে সম্প্রদায় ও পেশার ভিত্তিতে নির্বাচন শুরু হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ভোটাধিকার

ও নির্বাচনী সংস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯২০ সাল থেকে অনিয়মিতভাবে হলেও পৃথক নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়, পৌরসভা ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ছাড়াই প্রার্থীরা ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়।

১৯৩৫ সাল অবধি পৌরসভা, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি ও বোর্ডে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ক্ষেত্রেই জমিদারদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এমনকি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেও তাদের প্রভাব বজায় ছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ২৫০ আসনের মধ্যে ৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী (মুসলিম ৪৩, হিন্দু ৩৯) জয়ী হন। দলীয়ভাবে মনোনীতদের মধ্যে কংগ্রেস ৫২, মুসলিম লীগ ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬ এবং বিভিন্ন উপদল অবশিষ্ট আসন লাভ করে। পরবর্তী দশকে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয়। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত করে। পরে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাফল্য ছিল ব্যতিক্রম।

নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং ১৯৫৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান প্রবর্তনে নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ ও জেলা বোর্ড নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে নবীন ও অনাবাসিক আইনজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করেন। ষাট ও সত্তরের দশকে পেশাদার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাচ্ছলতার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এবং পাঁচটি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট হয়। যুক্তফ্রন্টে ছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজামে ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল।

প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৪টি আসনের জন্য ১২৮৫জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৫টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২২৮টি আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন ৯৮৬ জন, সাধারণ হিন্দুদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসনের জন্য ১০১ জন প্রার্থী এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত ৩৬টি আসনের জন্য প্রার্থী ছিলেন ১৫১ জন। অমুসলিমদের আসনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাদের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং তফসিলি ফেডারেশনের প্রার্থী ছিলেন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৪৮,৫৬৮ জন। তাদের মধ্যে ৭৩,৪৪,২১৬ জন ভোটার (৩৭.১৯%) ভোট দেন।

এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৭টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন একজন আইনের ছাত্র খালেক

নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। যুক্তফ্রন্টের ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী দল ১৩ এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টি পায় ২টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস পায় ২৫টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘুদের যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় এটি ছিল সর্বশেষ নির্বাচন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় ছিল ২১ দফার একটি মেনিফেস্টো : বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, জমিদারি প্রথা বিলোপ, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, সমবায় পদ্ধতিতে চাষবাস, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা, কৃষির আধুনিকায়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, কালাকানুন রহিতকরণ, সমন্বিত বেতন কাঠামো প্রবর্তন, দুর্নীতি দমন, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথক্‌করণ, ভাষা শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে বাংলা ভাষা উন্নয়নের কেন্দ্রে রূপান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের আহ্বানে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হক একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগকে শরিক না করায় ফ্রন্টে একটি সংকট সৃষ্টি হয় এবং ফজলুল হক বাধ্য হয়ে ১৫ই মে তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করে আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুস সালাম খান এবং হাশিমুদ্দিনকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ওইদিন নারায়ণগঞ্জের আদমজী পাটকলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে প্রায় ১৫০০ শ্রমিক নিহত হয়। এর জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার অজুহাতে ৩০শে মে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে গভর্নরের শাসন চালু করা হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে আগস্ট আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তখন মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

আইয়ুব (১৯৫৮-১৯৬৯) বিরোধী আন্দোলন ও ছয় দফার আন্দোলন (১৯৬৬-১৯৭১), নির্বাচন–ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ না করায় পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং যে কোনো আইন বা সংবিধানের যে কোনো বিধানের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। বিরোধী সংসদ–সদস্যের সংখ্যা অতি নগণ্য থাকায় সরকারি দল সহজেই সংবিধানের চারটি সংশোধনী পাস করে। চতুর্থ সংশোধনীর বলে সংসদীয় প্রথা বিলোপ করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ফলে দেশে এক শূন্যতা বিরাজ করে। নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়। দারুণ এক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। হ্যাঁ-না বা ন্যাংটা নির্বাচন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইনসিদ্ধ ও বৈধকরণের এক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে প্রথমবারের মতো নির্বাচনের ইতিহাসে সন্ত্রাস যুক্ত হয় এক নতুন উপাদান হিসেবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সশস্ত্র ক্যাডার লালন করে। এদের কাজ হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ভোট সংগ্রহ, নির্বাচনকেন্দ্র দখল এবং প্রয়োজনে ব্যালটবাক্স ছিনতাই। অত্যন্ত তিক্ততার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করা হচ্ছে। অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন এখন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।

১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ জুন ও ২০০১ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচিত হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বলে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃস্থাপিত হয়। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকলেও সেই নির্বাচিত ষষ্ঠ সংসদ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে দেশে অচলাবস্থা দূর করে। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী গত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে দুটি নির্বাচনের তদারকি করেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ এবং রাষ্ট্রপতি সময়েসময়ে যেইরূপ নির্দেশ করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করিবেন।'

জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সব নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমাদের দেশে নির্বাচনের যে আইন কাঠামো রয়েছে তা কাজ চালানোর জন্য খারাপ নয়। সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা যথার্থভাবে পালন করলে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কঠিন হয় না। ১২৬ অনুচ্ছেদের কথাটা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পর্কে নির্বাহী বিভাগের অনবধানতা, অবহেলা বা ঔদাসীন্য নির্বাচন কমিশনকে পঙ্গু করে দেয় এবং একটা শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা তখন এক বড় ঝক্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনে কে জিতবে বা হারবে ভবিষ্যতের সে দুর্ভাবনা না করে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্তব্যচ্যুতিকে সাহস ও কঠোরতার সঙ্গে মোকাবেলা করা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করার অন্য কোনো উপায় নেই।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা করা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য।

সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণীত হয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৩ ধারা সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করে। নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ

দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারে। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধাদান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবে এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারে।

নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবে। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের ওপর অর্পিত। সহকারী রিটার্নিং অফিসাররাও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা পেতে পারে। রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল তৈরি করে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদান করবে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের ওপর অর্পিত হয়েছে। ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসাররা কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

আদেশের ১৭(১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত রয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে। ২০(২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোস্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে। ২১(১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং ২১(২) দারায় পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। ২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার

প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেবেন। প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা নির্ধারিত হয়। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টদের নির্দেশ দেবেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়-স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সব স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সিলমোহর ভেঙে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধাদান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর জরিমানাসহ সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যে কোনো ভোট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারে। নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করতে পারবে। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই তদন্ত পরিচালনা করবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৯০ রহিত করে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ জারি হয়। কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি কমিশন বা

ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তাঁর দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবেন না। নিয়োগের তারিখ থেকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তার চাকরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন। কোনো নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশন বা ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কোনো আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভবে লঙ্ঘন করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং ওই অসদাচরণ তার চাকরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এর মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে প্রার্থীকে আপিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতীক বরাদ্দসহ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার প্রক্রিয়া এবং প্রতীক তালিকা উল্লিখিত হয়েছে। ব্যালট পেপার তৈরির পদ্ধতি, পোস্টালব্যালট ইস্যু ও তার ভোট রেকর্ড, নিরক্ষরদের ভোট রেকর্ডের প্রক্রিয়া, পোস্টাল ব্যালটের রিটার্ন এবং রি-ইস্যু করার পন্থা বিবৃত হয়েছে। ব্যালট বাক্স রেকর্ড, ব্যালট পেপার মার্কিং এবং তা বাক্সে পূরণের পদ্ধতি বলা হয়েছে। প্রার্থী কর্তৃক ভোট চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়া, পরিত্যক্ত ব্যালট বাতিলের প্রক্রিয়া ভোট গণনা, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক বিবরণ তৈরি, ফলাফল একত্রীকরণের পদ্ধতি এবং পাবলিক ইন্সপেকশন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। নির্বাচনী প্রচারণার পোস্টার দেশ কাগজে সাদাকালো রঙের হতে হবে এবং আয়তন কোনো অবস্থাতেই ২২˝/১৮˝ পরিমাপের অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সব ধরনের দেয়াললিখন থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে। ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। কেবল পোলিং এজেন্টরা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। বিধিমালা যে কোনো বিধান লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চেয়ে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশন বরাবরে আর্জি পেশ করতে পারবেন। আর্জি কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন

তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে প্রেরণ করবে। উভয় ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি তদন্তকার্য পরিচালনা করে কমিশন বরাবরে সুপারিশ পেশ করবে।

'এক মানুষ এক ভোট' এই স্লোগান সংস্কারবাদী মেজর জন কার্টরাইট (১৭৪০-১৮২৪) চয়ন করেন ব্রিটেনে যখন বাসস্থান ছাড়াও ব্যবসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব অধিকারে লোকে ভোট দিত। পরে এই স্লোগানের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটে। শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আফ্রিকায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই স্লোগান নতুন করে ধ্বনিত হয়।

'আমার ভোট আমি দেব, যাকে ইচ্ছে তাকে দেব'—নির্বাচনের জগতে বাংলাদেশের এ এক অনুপম অবদান।

১৯৯৬ সালের জুনের সাধারণ নির্বাচনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। ১১৩ আসন পেয়ে বিরোধী দল আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এককভাবে যে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে তা আগে কখনো ঘটেনি। ৭জন মহিলা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ৮জন নির্বাচিত হন। জনজাতিদের মধ্য থেকেও কয়েকজন নির্বাচিত হন। গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচনের লড়াইয়ে অর্থের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা সারা পৃথিবীতে। যেসব দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয় সেখানে নির্বাচনে ব্যয়নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলার ব্যাপারটা বেশ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার প্রার্থী হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে বলতে শোনা গেছে—'যারা চাঁদা তোলেন তাদের কাছে যাওয়া ও তাদের করমর্দন করা ছাড়া আর আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না, কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না এবং কোনো কাজই করতে পারছি না।'

আমাদের দেশে নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে কালো টাকা ও দুর্নীতির অভিযোগ ঢালাওভাবে করা হয়। নির্বাচনের ব্যয়ের হিসাবে শুভঙ্করীর ফাঁক যে থাকে না, তা নয়। নির্বাচনপ্রার্থীকে নির্বাচন প্রচারকালীন প্রত্যেক দিনের হিসাব দিতে হবে বলে একটা কথা বলা হচ্ছে। হিসাব দেওয়ার ও নেওয়ার ব্যাপারে আইনের তেমন কড়াকড়ি নেই। নির্বাচনে অর্থব্যয় জোগানোর জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান প্রক্রিয়া খুব যে সুফল দিয়েছে তা নয়। জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রের টাকার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বিধায় ১৯৯২ সালের জার্মান সাংবিধানিক কোর্ট রাষ্ট্রের অনুদান কমিয়ে দিতে পরামর্শ দেয়। রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী তহবিলের অর্থ জোগানো সত্ত্বেও স্পেন, জার্মানি বা জাপানে চাঁদা নিয়ে কেলেঙ্কারি কিন্তু কম হয়নি। রাষ্ট্রানুকূল্য সত্ত্বেও চাঁদা নিয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতালিতে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় বহন করা বন্ধ করে দেওয়া হয় বছর কয়েক আগে।

২৩শে জুন ২০০১ অষ্টম সংসদের নির্বাচনী প্রচারে নীলফামারীর এক জনসমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন, 'এবার নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।' পরের দিন সুনামগঞ্জের এক জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, 'খালেদা জিয়া নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে চেয়েছে। আর আমি ধানের শীষ কেটে নৌকায় ভরে কৃষকের গোলায় পৌঁছে দিতে চাই।' নির্বাচনী প্রচারে ১৮ই সেপ্টেম্বরে ২০০১ উত্তরাঞ্চলের ৫

জেলার সভায় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা ট্রাক্টর দেব, পাওয়ারটিলার দেব লাঙ্গলের দরকার হবে না।' ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ খালেদা জিয়া বলেন, '৯৬ সালে তারা ভোটভিক্ষা চেয়েছিলেন। এবার মানুষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিয়ে তাদের ভোটভিক্ষা নয়, ভোট শিক্ষা দেবে।'

২৩শে আগস্ট ২০০১ দেশে মোট লোকসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন, পুরুষ ৬,৫৮,৪১,৪১৯, মহিলা ৬,৩৪,০৫,৮১৪ জন। রাজধানীর লোকসংখ্যা ছিল ৯৯,১২,৯০৮; চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ৩২,০২,৭১৭। অষ্টম সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার ছিল ৭,৫০,০১,৫৮৬। নির্বাচনী জেলা ৬৮, ভোটকেন্দ্র ২৯,৯০০ এবং ভোটকক্ষ ১,৪৯,৪২১। প্রার্থীদের জামানত লাগত ১০ হাজার টাকা।

২৭শে আগস্ট ২০০১ : ২৯৩ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ঘোষণা করে। সপ্তম সংসদে এমপি ছিলেন এমন ২৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা মনোনয়ন পাননি। সাবেক বিএনপি এমপি আবদুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগে যোগদান করেই মনোনয়ন পান। সংসদের ৩০০ আসনের জন্য প্রার্থী হন ২ হাজার ৫৬৩ জন। শেখ হাসিনা ৫টি এবং অপর ৮ জন একাধিক আসনে প্রার্থী। ১৭৫ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে ১১ দল।

নির্বাচনী সহিংসতা সারাদেশে ১০৫০ আহত এবং ৩৫ জন নিহত হন। বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে লাভ। আওয়ামী লীগের ২৮ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, ৫২ এমপি, ২৪ জন অবসরপ্রাপ্ত পরাজিত হন। ঋণখেলাপি-বিলখেলাপি হেরে যান ৪৬ জন। এগারো জেনারেলের মধ্যে ৩ জনের জয়। রাজধানীর ৮ আসনেই জোট জয়ী ৪৮ আসনে, ৩৮ মহিলা প্রার্থীর মধ্যে ৬ জন বিজয়ী। ১৯৯৬ সালের তুলনায় ভোট বেড়েছে আওয়ামী লীগের, অন্য কোনো দলের নয়। আওয়ামী লীগ ৩৯.৯৪%, জোট ৪৬.৪৭%। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বলেন, সূক্ষ্ম-স্থূল কারচুপি বুঝি না, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে।

জাতিসংঘ সচিবালয়ের সমন্বয়ক বলেন, 'কিছু অনিয়ম হলেও সামগ্রিক বিচারে নির্বাচন হয়েছে অবাধ ও নিরপেক্ষ।' ৩রা অক্টোবর ২০০১ শেখ হাসিনা বলেন, 'শপথ নেব না, সংসদেও যাব না, পুনর্নির্বাচন চাই।' কয়েকদিন পরে ৯ই অক্টোবর তিনি বলেন, 'যেখানে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে সেখানে সংসদে গেলাম কি-না তাতে কিছু যায়-আসে না।'

২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা সুষ্ঠুতার প্রত্যয়নপত্র দিলেও তার বিরুদ্ধে দেশে নানা প্রশ্ন ওঠে। যেহেতু প্রধান পরাজিত দলের শাসনকালে তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রপতি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, তাঁদের আপত্তি তেমন জোর পায়নি। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী হামলা প্রসঙ্গে নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবিসিকে বলেন, 'কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক, কিছুটা গুজব ও কিছুটা সত্য রয়েছে।' কয়েকদিন পর রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে ডেকে সংখ্যালঘুদের ওপর হয়রানি বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

২০০৬ সালে অষ্টম সংসদের মেয়াদশেষে নির্বাচন পরিচালনার ভার বিচারপতি কেএম হাসান নেওয়ার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২৮শে অক্টোবর ২০০৬

তিনি স্ব-উদ্যোগে এক ঘোষণা দেন যে, তিনি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে চান না। ২৯শে অক্টোবর ২০০৬ রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের সব বিকল্প শেষ না করেই রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে একাধিক রিট আবেদন করা হয়। চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করায় সংকট আরো ঘনীভূত হয়।

২০০৭ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নির্বাচনে অসংখ্য নামসর্বস্ব দল প্রস্তুতি নেয়। বাংলাদেশ দরিদ্র পার্টি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ইয়াং পার্টি, খাদেমুল ইসলাম যথাক্রমে থালা, মোটরসাইকেল, ঘণ্টা এবং বালতি মার্কা পেয়েছে। এছাড়া হুক্কা, ক্রিকেট ব্যাট, ঘোড়া, করাত, তলোয়ার, কলসি, ময়ূর, গাভী, উট, হরিণসহ অসংখ্য অপরিচিত প্রতীক দেখা যাবে ব্যালট পেপারে। পরিচিত প্রতীক থাকবে ধানের শীষ, দাঁড়িপাল্লা, বাইসাইকেল, নৌকা নির্বাচন বর্জন করে।

৭ই জানুয়ারি ২০০৭ নির্বাচনবিরোধী অবরোধের প্রথম দিনে ব্যাপক সংঘর্ষে আহত হয় ৪০০, গ্রেফতার ২০০ হয়।

মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে পারে। তার আগে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারটা সরকার বিবেচনা করবে। আবার সরকার গঠন করতে পারলে তাঁদের প্রধান কাজ হবে একটি বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা ও ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি করা।'

৯ই জানুয়ারি ২০০৭ বঙ্গভবনের আশপাশে পুলিশের সঙ্গে মহাজোটের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দেশে ভোটের তারিখ বর্ধিত করার জন্য সতেরো জন বিশিষ্ট নাগরিক রাষ্ট্রপতিকে খোলা চিঠি লেখেন। ভারপ্রাপ্ত সিইসি বলেন, 'সংঘাত বা হানাহানির দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিতে হবে।'

২৯শে জানুয়ারি ২০০৭ সংসদ নির্বাচন ৩ মাস স্থগিত করে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। ১. ভোটার তালিকা কেন '৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও সুপ্রিমকোর্টের রায় পরিপন্থী নয়? ২. ভোটার আইডি ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স তৈরির আগে কেন নির্বাচন?

৩১শে জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতির কাছে 'ভারপ্রাপ্ত' সিইসি বিচারপতি মাহফুজুর রহমান, কমিশনার জাকারিয়া, হাসান মনসুর, মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ও সাইফুল আলম পদত্যাগপত্র জমা দেন।

অবশেষে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করে জাতির উদ্দেশে বলেন, 'গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করেছি।' পরের দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করেন।

২২শে নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এক বিবৃতিতে জানায়, 'নির্বাচনের সঙ্গে যে ১১০৭ জন আমলা জড়িত তারা নিরপেক্ষ না থাকলে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধ করা যাবে না। তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে : ভোটার যেন নিজের ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারে, ভোট গণনার কাজ যেন স্বচ্ছ হয় এবং গণনাকৃত ভোট প্রকাশে যেন কোনো কারসাজি না হয়।'

দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সংস্কারের কথা আলোচিত হচ্ছে। ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৭ উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন করে। কমিশনের সাতটি সুপারিশের মধ্যে তিনটি গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন মন্ত্রণালয় বিভাগ বা দফতরের আওতাভুক্ত থাকবে, সচিবালয়ের জন্য আলাদা বাজেট থাকবে এবং কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ও জনবল নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে। চারটি বিষয় অনুমোদিত অধ্যাদেশে রাখা হয়নি। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, কমিশন সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের চাহিদা মানা এবং সচিবালয়কে নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়বদ্ধ রাখা প্রসঙ্গ। এছাড়া জনবল নিয়োগ ও কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয় অনুমোদনের ক্ষমতা সরকারের হাতে না রেখে রাষ্ট্রপতির হাতে রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনী আইন সংস্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয় বলে একাধিকবার উল্লেখ করে এবং জাতিকে আশ্বস্ত করে যে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নবম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান শেষ পর্যন্ত টিকবে কি-না, তা এবং দেশ কী–কী সাংবিধানিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচার

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামকে মার্কিন গৃহযুদ্ধ ও নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধী ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ অচল বলে সাফাই গাওয়া হলেও তাদেরকে মানবতাপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া যায় না। ১৯৭২ সালে যুদ্ধাপরাধের পরিবর্তে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মানবতাপরাধের অভিযোগের ওপর যদি অধিকতর জোর দেওয়া হতো, তাহলে যুদ্ধপরাধের বিচার ক্ষেত্রে যে পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের তার কি কোনো ব্যত্যয় ঘটত? মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করা নানা কারণে একটা ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্য এমন একটা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের প্রয়োজন যা তার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

১৯৯৮ সালের জুন মাসে রোমে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ১২০টি দেশ এক আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সাতটি দেশ সেই প্রস্তাবের বিপক্ষে যায়। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত স্থাপনের পক্ষে বাংলাদেশসহ ১৩৯ দেশ সম্মতিস্বাক্ষর দিয়েছে।

সাধারণত দরিদ্রের পক্ষে বিচার পাওয়া যেমন কঠিন, শক্তিমান-বিত্তমান রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচার করাও তেমনি সুকঠিন। গণআদালত বিক্ষোভ প্রকাশের একটি চমকপ্রদ মাধ্যম হলেও তার রায় যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের নির্বাহী বিভাগ নিজের বলে আপন করে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা অকার্যকর থাকে। সাধারণ আদালতের সমান্তরালে এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক বিকল্প আদালত থেকে ফল লাভের তেমন সম্ভাবনা থাকে না।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জীবন ব্যতিব্যস্ত তখন পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে বাজেট সমন্বয় করা ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। সেই সংকটকালে বাংলাদেশ অন্য দেশের মতামতকে অগ্রাহ্য করা সমীচীন মনে না করে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ লোক পাকিস্তানে আটকে পড়েছিল যুদ্ধের সময় এবং কয়েক সহস্র বাঙালি কর্মচারী পাকিস্তান সরকার আটক করে রেখেছিল। এই আটকে-পড়া ও আটক-হওয়া বাঙালিদের ফেরত নিয়ে আসার লবি বাংলাদেশ সরকারের উপর এক দারুণ চাপ সৃষ্টি করে। পাকিস্তান তা ভালোভাবে বুঝে তাদের যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তা পুরো কাজে লাগায়।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১ মুজিবনগর মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থানীয় সদস্যবৃন্দ রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলছেন—"তার দুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে দুটো বিষয়ে কথা হয়েছিল। একটি ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার

প্রসঙ্গ ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসরদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়। তিনি বলেছিলেন, 'চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কাজটি সহজ হবে না।' আমি জানতে চাই, কেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাউকে বিচার করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি মনে করেন না। আমি আবার জানতে চাই, কেন।' তিনি বলেন, "মার্কিনদের চাপ আছে। তারা পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে, ভারতকে চাপ দিচ্ছে যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধবন্দিদের বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, এমনকি, ভারতও উৎসাহী নয়। এই অবস্থায় কার জোরে আপনি বিচার করবেন? আর মূল অপরাধীদের বিচার না করতে পারলে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিচারের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।"

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীরা বিচারের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।' ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার অসামরিক লোকদের হত্যা, নারীধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।' এ সম্পর্কে ফখরুদ্দীন আহমদ তাঁর *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি*-তে লিখেছেন 'কিন্তু সেটা ছিল একটা বিবৃতি মাত্র।' তাঁর কথা, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্রে কোনো নীতিমালাই আমি খুঁজে পাই নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের আগে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে কোনো সমঝোতা হয়ে থাকতে পারে।'

১৯শে মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে বৈঠকশেষে যে যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল তার মধ্যে বলা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাসদস্য এবং বেসামরিক সরকারি কর্মচারী যারা যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল তাদের দ্রুত বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন যে, ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত জঘন্যতম গণহত্যার জন্য দায়ী সব দোষী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচারের সম্মুখে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২-এর জুলাইয়ের মধ্যে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের সংখ্যা ৪০০ থেকে ১৯৫-তে কমিয়ে ফেলে।

জে এন দীক্ষিত তাঁর *লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড*-এ বলেন, 'এমনকি এই স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ কিংবা মামলার নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে তেমন তৎপর ছিল না। 'মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হাকসারকে বলেছিলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধার কারণে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে চান না। তিনি এমন কিছু করতে চাননি যাতে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি-প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপমহাদেশে শান্তি ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার বৃহত্তর স্বার্থে শেখ

মুজিবের এ মনোভাব ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে সিমলায় ভুট্টো ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক আয়োজনে সাহায্য করে।'

বাংলাদেশে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য যে-কোনো সশস্ত্রবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ বা দণ্ডদান করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন (১৯৭৩ সালের ১৯নং আইন) পাস করা হয়। সংবিধানের কোনো মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হওয়ার কারণে উক্ত আইন অসাংবিধানিক বলে সুপ্রিম কোর্ট যেন ঘোষণা না দিতে পারে, তার জন্য সংবিধান (প্রথম) সংশোধন আইন (১৯৭৩ সালের ১৫নং আইন)-ও পাস করা হয়।

১৯৭৩ সালের আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠন, অপরাধীকে আটক, ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ, দণ্ডদান এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনি সাহায্যেরও বিধান দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ষাট দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার অধিকার সেই আইনে সংবলিত থাকে। 'যুদ্ধাপরাধ'-এর সংজ্ঞায় যুদ্ধের আইন বা রীতির লঙ্ঘনে সীমিত না রেখে খুন, নিপীড়ন, বাংলাদেশের রাজ্যসীমায় দাসশ্রমিক হিসাবে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বেসামরিক লোককে দেশ হতে বিতাড়ন, যুদ্ধবন্দির খুন বা নির্যাতন, পণবন্দি বা আটক ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যক্তিগত বা সাধারণ সম্পত্তি লুণ্ঠন, শহর, নগর বা গ্রামের, সামরিক প্রয়োজনে যথার্থ নয়, এমন সীমাহীন ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ন্যূনতম যে দক্ষতা ও নিবেদিতপ্রাণ প্রসিকিউটরের প্রয়োজন ছিল তার বড়ই অভাব ছিল। যুদ্ধাপরাধ ট্রায়ালের জন্য যাঁদের সরকারি কৌসুলি নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের শীর্ষস্থানীয় একজন যখন আমাকে বললেন, 'আমার... কে আমাকে বাঁচতে হবে' তখন আমার মনে হয়েছিল যুদ্ধাপরাধের আর বিচার হচ্ছে না। আমি আমিনুল হককে (পরে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হন) বলেছিলাম, 'আপনারা ওয়র ক্রাইমের ট্রায়াল করতে পারবেন না।'

অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞ আইনজীবীর অভাব, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে দোদুল্যমানতা এবং সর্বোপরি উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে কোনো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের কোনো বিচার সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে বিচার তাড়াতাড়ি যে করা যায় না তা নয়। ১৩ই নভেম্বর ১৯৭২ দালাল আইনে পাকিস্তানি গভর্নর ডা. মালেকের বিচার শুরু হয়। ১৯শে নভেম্বর তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ডা. মালেকের যারা মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের সকলের বিচার হয় নি। কারো কারো জাতীয়তা বাজেয়াপ্ত করা হলেও অনেকের জাতীয়তা ফেরত দেওয়া হয়। এবং এ সম্পর্কে সরকার স্বীয় ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত নেয়। যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৮)-এর বলে ঢালাও অভিযোগ ও ফৌজদারি আদালতে অনিয়মিত সোপর্দের জন্য মোকদ্দমা বৃদ্ধি পায়। ১৬ই মে ১৯৭৩ দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। যাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা বা অনুরূপ গর্হিত অপরাধের অভিযোগ ছিল সেইসব মামলায় সরকার পক্ষ থেকে তেমন তদবির করা হয়নি। ওই আইনে প্রায় ৩৪,৬০০

আসামি অভিযুক্ত হয়। বেছে বেছে জঘন্য অপরাধের জন্য বিচার বিবেচিত সীমার মধ্যে না রাখার ফলে আইনের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সরকারকে প্রায় উদারভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করতে হয়। এটা সেই সময় করা হয় যখন সরকারবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতা প্রায় আত্মঘাতী পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৯ই এপ্রিল ১৯৭৪ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিল : উপমহাদেশে শান্তি, সৌহার্দ্য ও আপস প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক মনোভাব নিয়ে তিনজন মন্ত্রী ১৯৫জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির বিষয় আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এইসব যুদ্ধবন্দি যেসব বাড়াবাড়ি ও অপরাধ করেছে তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে, এবং এই সার্বজনীন ঐকমত্য রয়েছে যে, যাদের বিরুদ্ধে ১৯৫জন যুদ্ধবন্দির মতো অপরাধের অভিযোগ তাদের বিচার বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার স্বার্থেই হওয়া উচিত। পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী জানান যে, এ ধরনের কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে তাঁর সরকার সেজন্য গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে এবং এর নিন্দা করছে।' শেষ বাক্যটি ছিল একটি অকার্যকর, অস্পষ্ট ও আন্তরিকতাহীন এক মামুলি কথা।

উক্ত চুক্তির ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল : "এ প্রসঙ্গে তিনজন মন্ত্রী আরো বলেন যে, 'আপসের মনোভাব অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তিন সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহের আলোকেই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।' মন্ত্রীত্রয় আরো বলেন যে, 'স্বীকৃতিদানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই সফরের লক্ষ্য হলো অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ভুলে গিয়ে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা।' অনুরূপভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত নির্মমতা ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি জনগণকে অতীত ভুলে গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ জানে কী করে ক্ষমা করতে হয়।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, 'বাংলাদেশ সরকার ক্ষমার মনোভাব নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ চালিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মর্মে ঐকমত্য হয় যে, দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর যে প্রক্রিয়া চলছে তার সঙ্গে এই ১৯৫ বন্দিকেও পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।'

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যাঁরা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। ২৬শে মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি বললেন, 'ভায়েরা, বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। আমরা ভেবেছিলাম, পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে, আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি,

তাদের আমি বিচার করি নি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এ জন্যে যে, এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।'

জুলফিকার আলী ভুট্টো শক্তির ভাষা সহজে বুঝতেন। শীর্ষস্থানীয় কিছু পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রকাশ্য বিচার হলে বাংলাদেশ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বিহারিদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব এবং বিভাগোত্তর দেনা-পাওনার প্রশ্নে বাংলাদেশের আরো সুরাহা হতো এবং বাংলাদেশকে সিমলা চুক্তির আগেই হয়তো পাকিস্তান স্বীকৃতি দিত।

বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক মহলে যে সহানুভূতি ছিল তা ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পর সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। যুদ্ধাপরাধের বিচার হলো না বলে কখনো সখনো আক্ষেপ শোনা গেলেও সামরিক ও আধাসামরিক শাসনে রাহুগ্রস্ত দেশে ১৯৯২ সালের আগে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি।

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ 'মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে' জাহানারা ইমামের আহ্বানে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ গোলাম আযম ও তাঁর সহযোগীদের বিচারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। ২৬শে মার্চ ১৯৯২ সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ই মার্চ স্মৃতিস্তম্ভের পাশে চারটি ট্রাক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নির্মিত এক এজলাস মঞ্চ থেকে ১২-৩০ মিনিটে বাংলাদেশ গণআদালত-১–এর চেয়ারম্যান হিসেবে জাহানারা ইমাম একটি রায় পড়ে ঘোষণা দেন যে, 'মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য গোলাম আযমের যথাযথ বিচার হওয়া উচিত।' পরের দিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার যদি গণরায় বাস্তবায়ন না করে তাহলে জনতাই এ রায় কার্যকর করবে।'

১৪ই এপ্রিল ১৯৯২ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'সিরু মিয়া দারোগা মুক্তিযুদ্ধের অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছে।... সেই সিরু মিয়াকেও গোলাম আযমের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল।... এই সংসদে যদি প্রশ্ন ওঠে যে গণআদালত বৈধ না অবৈধ, তাহলে জনগণকেই অস্বীকার করা হয়।... এই গণআদালত যে রায় দিয়েছে তাতে তারা কিন্তু আইন নিজে হাতে তুলে নেয় নি।... এই রায়কে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় স্পিকার, আমরা মনে করি যে প্রচলিত আইনই (আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট' ৭৩) যথেষ্ট। তবু যদি আপনি মনে করেন যে, আইনের কোনো ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতিটুকু এই মহান সংসদ অবশ্যই পূরণ করতে পারে। বিরোধীদলীয় নেত্রী নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন :

'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ, যুদ্ধ ও গণহত্যাসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসাধন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব-পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের নামে বাংলাদেশের বিরোধিতা, নিবন্ধিকৃত বিদেশী নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১৯৯২-এর ২৬শে মার্চের গণআদালতে জনগণের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক ক্রাইম (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে গোলাম

আযমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিচারের আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রসিকিউসান ও বিচারের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ জনগণের মতামত প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অসম্মানজনক মামলা দায়েরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে এবং ঐ মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।' ওই প্রস্তাব সংসদে পাশ হয়নি। ১৯ই এপ্রিল ১৯৯২ সকল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের 'প্রচলিত আইনে গোলাম আযমের বিচার হবে' প্রস্তাবটি পাশ হয়।

২২শে জুন ১৯৯৪ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাংলাদেশের জন্মসূত্রে গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে রায় দেয়। দুই দিন পর এক সমাবেশে গোলাম আযম বলেন, অতীতে ভুল করে থাকলে তিনি দুঃখিত। ২৬শে জুন জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশন ১৬জন যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারের বিরুদ্ধে দুটো প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চের মধ্যে আরো ৭ জনের ওপর যে প্রতিবেদন পেশ করার কথা ছিল তা আর প্রকাশ করা হয় নি।

ফখরুদ্দীন আহমদ তাঁর *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলিতে* বলেছেন : 'আমাকে এবং আরো অনেককে যা সবচেয়ে বেশি অবাক করেছিল তা হলো ভুট্টোর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। ঢাকার রাস্তার দুধারে সমবেত জনতা ভুট্টোকে স্বাগত জানানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। জনতা ভুট্টো ও পাকিস্তানের সমর্থনে মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে থাকে। ভারতবিরোধী স্লোগানও এ সময়ে জনতা মাঝে মাঝে দিচ্ছিল। এ ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার!'

২৭ নভেম্বর ২০০০ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের এক সেমিনারে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার ইরফানুর রহমান রাজা বললেন, 'কিসের ক্ষমা প্রার্থনা? কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা? একাত্তরে আওয়ামী লীগের দুস্কৃতকারীরাই পাকিস্তানের এক অংশে প্রথমে নৃশংসতা শুরু করে? সে সময় ৩০ লাখ নিহত হয়েছিল বলে যে তথ্য দেয়া হয় সেটি অসত্য। নিহতের সংখ্যা ২৩ হাজারের মতো হতে পারে। একাত্তরের পাকিস্তানকে দুভাগ করার জন্যই কি আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে?।'

পাকিস্তান বলে, 'ডেপুটি হাইকমিশনারের বক্তব্যকে ঘিরে সৃষ্ট বিতর্কের জন্য আমরা দুঃখিত। এই পরিস্থিতিতে হাইকমিশনারের একজন সদস্য হিসেবে এই কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন অসম্ভব হয়ে পড়ায় তাঁকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।' সরকার রাজাকে পার্সোনা নন গ্রাটা (অবাঞ্ছিত ব্যক্তি) বলে চিহ্নিত করেনি।

সরকারি দল প্রস্তাব পাস করে যে, পাকিস্তান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে একাত্তরের ধ্বংসযজ্ঞের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। যেদেশের সরকার ক্ষমাপ্রার্থনার কথায় কোনো মতেই শুনতে চায় না, সেদেশের সৎ মানুষেরা একাত্তরের সব কথা জেনেশুনে আজ তাঁদের সরকারকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো। বাঙালি নাকি কোনোদিন স্বাধীন ছিল না! যে-অর্থে আমরা 'স্বাধীন' বা স্বাধীনতার' কথা ব্যবহার করি, তা দু'শ বছর আগে সে-অর্থে ব্যবহৃত হতো না। এখনো কথাটা খুব পরিষ্কার নয়। অর্থনৈতিক অর্থে 'স্বাধীন' শব্দটা আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কখনো ভাসছে, আবার কখনো ডুবছে। এই অর্থে পৃথিবীতে কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে তা আমরা হাতের আঙুলে গুণতে পারব। ব্যাপক অর্থে সেই দেশকে প্রকৃত স্বাধীন বলা যেতে পারে, যে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বাধীনতার আশীর্বাদ সহজে পরিলক্ষিত হয়। এই অর্থে স্বাধীন হতে আমাদের বহুযুগ অপেক্ষা করতে হবে। সাধারণ অর্থে 'স্বাধীন' মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বোঝায়। বাংলার বাংলা যা অতীতে সমতট ও বঙ্গ বলে পরিচিত ছিল তা অন্যান্য অঞ্চল থেকে সবচেয়ে কম পরাধীন ছিল। রাঢ় ও বরেন্দ্রের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না, ওগুলোর ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে।

একটা দেশ স্বাধীন ছিল কি না, তা নির্ণয় করতে হয়ত এটা জানা প্রয়োজন, যাঁরা দেশে রাজত্ব করতেন তাঁরা দেশের ছেলে ছিলেন কিনা, বা দেশের রাজা দেশের ছেলে না হলেও তিনি সেই দেশে বাস করতেন কি না, তিনি সেদেশের লোকের ভাষায় কথা বলতেন কিনা, বা তাদের কথা বুঝতেন কিনা, রাজ্যে যা আয়-আমদানি হতো তা দেশে থাকত কি না, বা দেশের মুখ্য কর্মগুলো দেশে, না বিদেশে কোথাও নিয়ন্ত্রিত হতো। এত কথা বলার দরকার এই জন্যে যে, ইতিহাসে আমরা দেখছি বিদেশ থেকে রাজা এনেও কোনো কোনো দেশ নিজেদেরকে পরাধীন ভাবেনি। ইংল্যান্ডে রোমান, ডেন, নর্মান-ফ্রেঞ্চ, ডাচ ও জার্মান রাজারা রাজত্ব করেছেন। সেই ইতিহাস আলোচনা করে ইংরেজরা মাতম করে না যে তারা স্বাধীন ছিল না।

এবারে একবারে লিখিত ইতিহাসের গোড়ার দিকে যাওয়া যাক। গ্রিক বর্ণিত গঙ্গাঋদ্ধি হয়ত চারশ' পাঁচশ' বছরেরও বেশি স্বাধীন ছিল। মৌর্য, গুপ্ত ও পালদের আমলে কিছু সময় বাংলায় রাজার রাজধানী ছিল না। ত্রয়োদশ শতকে লক্ষ্ণৌতি বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর স্বাধীনতা ভোগ করে।

বাংলাদেশে ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত স্বাধীন সুলতানি আমল। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের রোম-পারি-লন্ডনের মতো এমন কোনো একক নগরী বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি যা নিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি গর্ব বা ঐকাত্ম্য বোধে করতে পারে। আমরা কূর্মনীতি ও বেতসবৃত্তি অবলম্বন করে বহু উত্থান-পতন পার হয়ে এসেছি।

বিন বখতিয়ার খলজি থেকে দায়ুদ কররানি পর্যন্ত প্রায় বাহাত্তর জন শাসকের মধ্যে প্রায় ছাব্বিশ জনের অপঘাতে মৃত্যু হয়। মুসলিম বিশ্বে খেলাফত দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর অবৈধ ক্ষমতা দখলের যে হিড়িক পড়ে তার বৈধতা সম্পর্কে ধর্মীয় নেতারা তেমন কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। বাঙালিরা সহজেই হত্যাকারীকে রাজা হিসেবে স্বীকার করে নেয় দেখে বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এদেশে রাজা আসে রাজা যায়, লোকের তেমন কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। খেটেখাওয়া

জনসাধারণ বাঘেকুমিরের লড়াইয়ে কোনো ঔৎসুক্য দেখায় না, শুধু ভয় পায় তাদের অবস্থা যেন নলখাগড়ার মতো না হয়। পলাশির কামান-দাগাদাগির পর পাঁচশ' গোরা পল্টন যখন মুর্শিদাবাদ পৌঁছে তখন এত লোক তামাশা দেখতে এসেছিল যে, ক্লাইভ ভেবেছিলেন প্রত্যেকে একটা ঢিল মারলেই ইংরেজরা খতম হয়ে যেত। প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের কতখানি অসম্বন্ধতা থাকলে এই ঔদাসিন্য জন্মে? রাষ্ট্রকর্মে বেশরিক জনসাধারণের ঔদাসিন্য বোধহয় দেশের বড় দুর্বলতা।

সংক্ষেপে, বেশ অনেক যুগ ধরে আমরা স্বাধীন ছিলাম না। তাই দেখি, আমাদের দেশের বরেণ্য ব্যক্তিরা যাঁরা পরাধীন দেশেও স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, তাঁদের মনেও পরাধীনতার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, বিদেশি প্রভুর প্রতি তাঁরা যেন কোনোমতেই বিশ্বাস হারাতে পারছেন না এবং নিজের দেশের লোকের প্রতি কোনোমতেই যেন আস্থা রাখতে পারছেন না। ঔপনিবেশিক মানসিকতার এই হচ্ছে গোড়ার কথা। এই মানসিকতা থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, আমরা কোনো দিন কি স্বাধীন ছিলাম? সন্দেহ নেই, বিশ্বাসঘাতকতা, আনুগত্যহীনতা ও পৌনঃপুনিক অভ্যুত্থানের ক্লান্তিকর ইতিহাস পড়ে যে কোনো দুর্মর আশাবাদীও শয্যাগ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এমন দুর্ঘটনা স্বাধীন দেশেও হতে পারে এবং হয়েছে। পরাধীন অবস্থায় বহুদিন বাস করায় আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে সব দোষ সেই অবস্থার ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই সহজ রোগনির্ণয় ঔপনিবেশিক মানসিকতার আর একটি লক্ষণ। কোনো দেশ একবার পরাধীন হলে আর স্বাধীন হতে পারবে না, এমন বাধা-নিষেধ দাসপ্রথা বা বর্ণাশ্রমধর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা অনেকদিন স্বাধীন ছিলাম না এটা রূঢ় সত্য, আর এই জন্যেই আত্মশাসনের সুযোগ পাওয়ার পরে আমাদের মনে নানান ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার ঢেউ খেলছে। দেশ শাসন করার মোদ্দা কথাগুলো নিয়ে সারাক্ষণ আমরা একটা নিরর্থক কসরতে মেতে আছি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নাগরিকের কর্তব্যকর্ম ও শরিকানা নির্দ্ধারণ করা কি সত্যিই খুব কঠিন?

ভিখিরির হাতে তলাফুটো ঝুড়ি, এটা একটা বাংলা প্রবচন। আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখে যখন বিদেশিরা অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করেন তখন আমরা মনের দুঃখে ভাবি, আমাদের দেশটা বুঝি চিরদিনই এমনি ছিল। যে কাল গেছে সে কালই ভালো ছিল—এই আক্ষেপে জীবনসংগ্রামে উত্ত্যক্ত মানুষ সবদেশেই অতীতকে বড় করে দেখে। সাধারণ মানুষের আবহমান দারিদ্র্যের কথা ভুলে গিয়ে আমরা ভাবতে ভালোবাসি গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ নিয়ে বাঙালি অতীতে দুধেভাতে বাস করত। 'সোনার বাংলা' 'মেরি ইংল্যাণ্ড'-এর মতো হারানো দিনের জন্যে একটি মায়াভরা নাম। বঙ্গললনার স্বর্ণপ্রীতি ছাড়াও এদেশের ভাষায়-কথায় যে 'সোনা'-র শোভাযাত্রা আমরা লক্ষ করি তাতে মনে হয় কল্পনার সবটুকু হয়ত মিছে নয়। গঙ্গাঋদ্ধির গাঙ্গে নগরীর কাছেই নাকি সোনার খনি ছিল। তাছাড়া এদেশের মাটিতে যত সোনা ফলত তার চেয়ে সোনা আমদানি হতো বেশি। ভিখিরির ঘর তো কেউ চড়াও করে না। বাংলাদেশে হরেক জাতের লোক যে এতবার হামলা করেছে সে তো সেই সোনার জন্যেই।

আড়াইশ' বছর আগেই বিদেশি বণিকদের কাছে এ দেশটি ছিল একটি নিতলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র নয়। আমদানিকারকরা দুঃখ করে বলত রাজ্যের সোনাদানা ঢেলেও

এদেশের তল পাওয়া যায় না। ঈর্ষার পরিবর্তে সেই দেশ আজ সকলের করুণার পাত্র। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে যে অবস্থা হয়, রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হয়ে আজ আমাদের হাল হয়েছে তাই।

'কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে' এটি আমাদের পুরো পরিচয় নয়। সেই গঙ্গাঋদ্ধির কাল থেকে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের প্রশংসা করে আসছেন। চাল, চিনি, লবণ, সুগন্ধিদ্রব্য, মাছ, মুক্তা, অলংকার, হরেকরকম জিনিস রপ্তানি হলেও বাংলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল সুতিবস্ত্র। পূর্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ছিল এ সুতিবস্ত্রের বাজার। রোম সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাংলার সুতিবস্ত্রের চাহিদা কমে যায়। ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাংলার সমৃদ্ধিতে তেমন ভাটা পড়েনি। সরস্বতী নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় সপ্তম শতকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন শুরু হয়। অষ্টম শতক থেকে এগার শতক পর্যন্ত মাৎস্যন্যায় ও একাধিকবার বহিরাক্রমণের ফলে, পশ্চিম-বাংলায় বাণিজ্যিক তৎপরতা কমে গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বঙ্গ ও সমতটের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। এগার ও তের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সারা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ মন্দা দেখা যায়। চতুর্দশ শতকের শুরুতেই আবার বহির্বাণিজ্য চাঙ্গা হতে শুরু করে। মুসলিম আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরেসোরে চালু হলো। সাঁতগাঁ, সোনারগাঁ, চাটগাঁ বন্দরগুলো গড়ে উঠল। বিভিন্ন টাঁকশাল ও প্রশাসনিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। পশ্চিমে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব ও ইথিওপিয়া এবং পূর্বে বর্মা, মালাক্কা ও সুমাত্রার সঙ্গে বাংলার বহির্বাণিজ্য দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। এক সময় বাংলার মুদ্রা মালাক্কায় বেশ চালু ছিল। উত্তর সুমাত্রার পাসেই-তে বাঙালি বণিকদের বড় বসতি ছিল। সেই অঞ্চলে না কি বাঙালিদের দ্বারাই প্রথম মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রুসেডের পর ইউরোপে রুচি বদলায় এবং সেখানে প্রাচ্যের মশলা, সুতিবস্ত্র ও সৌখিন দ্রব্যের বেশ চাহিদা বাড়তে থাকে। চীনা, আরবি, পর্তুগিজ, ইতালীয়, ফরাসি ইংরেজ বিভিন্ন জাতের পর্যবেক্ষকদের বর্ণনায় বাংলায় সমৃদ্ধির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। মুসলমান আমলে চরকা, কারচুব ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বয়নশিল্প অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে। বেল, জরি ও সল্‌মার কাজে, কিংখাব ও কাশিদায় এবং কলকাদার, গুলবাহার, বুটিদার ইত্যাদি বিচিত্র সূচিকর্মে বাংলার কারিগররা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। খ্রিষ্টজন্মের পূর্ব থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মসলিনের খ্যাতি ছিল অব্যাহত। মালব, উত্তর-প্রদেশ ও গুজরাটে মসলিন তৈরি হলেও বাংলার মসলিন ছিল সবচেয়ে সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও শুভ্র। জনান্তিকে মসলিনের দুঃখের কথাটি বলে রাখি। আহার-নিদ্রার বিধি-নিষেধ মেনে, তিথি-বার পালন করে, শরীর হালকা ও মন প্রফুল্ল রেখে আঠার থেকে ত্রিশ বছরের মেয়েরা মসলিনের সুতা কাটত। এই সূক্ষ্মকাজে মনোযোগের এতই প্রয়োজন হতো যে ত্রিশ বছর বয়স হলেই সুতাকাটানিরা তাদের দক্ষতা হারিয়ে ফেলত এবং চলিশ বছর পার না হতেই তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ত। একশ' বছর আগে ধামরাইয়ে না কি দু'জন মহিলা বেঁচেছিলেন যাঁরা মসলিনের সুতাকাটা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন।

বর্গীয় হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তার দেশি গোমস্তা ও দাদনদারদের অত্যাচারের ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই বস্ত্রশিল্পে ভাঙন দেখা দেয়। ইউরোপের সপ্তবর্ষি যুদ্ধ, আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসি বিপ্লবের ফলে বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা দেশের অর্থনীতি কত দেশের ঘটনা-দুর্ঘটনার ওপর যে নির্ভর করে! শিল্প-বিপ্লবের ফলে ১৭৮৩ সালে ইংল্যান্ডেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টুকরো মসলিন তৈরি হয়। মিসর ও তুরস্কে উর্দির পরিবর্তে পাগড়ি উঠে গেলে বাংলা থেকে কাশিদার রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। ১৮১৮ সালে তা নেমে এল আটষট্টি হাজারে। এই ঢাকা থেকে ১৮১৭ সালে সুতিবস্ত্র রপ্তানি হতো পনের লক্ষ টাকার উপর। সেই রপ্তানি ১৮৩৪-এ নেমে গেল চার লক্ষের নিচে। ১৭৮৭ সালে যেখানে ঢাকা থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকারও মসলিন রপ্তানি হতো, সেখানে ত্রিশ বছর পরে এক টাকারও মুসলিন আর রপ্তানি হলো না। ১৮১৩ সালে ইংল্যান্ডে বাংলার সুতোর ওপরও শতকরা ৪০ ভাগ শুল্ক আরোপ করা হলো। ১৮২১ থেকে এ দেশে মেশিনের সুতো আসতে শুরু করে এবং সাত বছর পরে সেই সুতো দেশি সুতোকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার করে এবং নবাবের কাছ থেকে উপঢৌকন ও উৎকোচ আদায় করে এক বিপুল পরিমাণ অর্থ এদেশ থেকে পাচার করে। ১৭৬৫-সালের পর দেওয়ানির রাজস্ব দিয়ে কোম্পানি বৈধভাবে প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ পেল। রপ্তানি-দ্রব্য ক্রয় করার জন্যে দেওয়ানির রাজস্ব ব্যবহৃত হওয়ায় এদেশে সোনা-রুপা আসা বন্ধ হয়ে গেল, যদিও তখন বাংলার রপ্তানি ছিল আমদানির দশগুণ বেশি। ১৭৭৩ সালে কোম্পানির বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলকাতা প্রেসিডেন্সির অধীনে আসে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ১৮২৬ থেকে আসাম নিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ঘাটতি. কোম্পানির একাধিক যুদ্ধের ব্যয় এবং চীনাদ্রব্য খরিদ, সবই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অর্থেই মেটানো হতো। মাদ্রাজে চালু 'প্যাগোডা' মুদ্রার নামানুসারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে তখন বলা হতো 'প্যাগোডা বৃক্ষ', যাকে জোরে ঝাঁকুনি দিলেই নাকি কোম্পানির জন্যে ঝুর-ঝুর করে টাকা ঝরত।

বঙ্গ প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর গ্রান্ট ১৮৬১ সালে তৎকালীন রাজস্ব আয়-ব্যয়ের প্রথা সম্পর্কে বলছেন, "প্রথাটি হলো বেঙ্গলকে ন্যায্য অংশের চাইতে অনেক বেশি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে বাধ্য করা কিন্তু মিলিটারি, পুলিশ, রাস্তা এবং পাবলিক-ওয়ার্কস-এর অন্যান্য সরকারি দায়িত্বপালনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের এক-চতুর্থাংশও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ফেরৎ না দেওয়া।" দেশের সরকারের নাম ও চরিত্র বদলালেও এই প্রথাই কিছু হেরফের হয়ে চালু ছিল ১৯৭১ পর্যন্ত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জীবনের দারিদ্র্য-সীমারেখার তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও এক নতুন অভাববোধ ও প্রত্যাশায় দেশে যে যাতায়াত, সমাজ যে চলমানতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে সুলক্ষণযুক্ত। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতার বদৌলতেই আজ বহুদিন পর ব্যাংক, লগ্নি, মূলধন, বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করার আমরা সুযোগ পেয়েছি। মাটি, পানি ও মানুষের সদ্ব্যবহার করে এখন আমাদের অর্থনৈতিক

আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে হবে। চর্যাপদকর্তা শবরীপাদ এক পদে বলছেন, "বাড়ির বাগানে কার্পাস ফুল ফুটেছে, দেখেই আনন্দ, ঘরের চারপাশ যেন আলো হয়ে গেল, আকাশের অন্ধকার গেল টুটে।" আমাদের দেশে আবার কার্পাস ফুল ফুটছে।

বাংলাদেশের নাগরিকের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! পরিচয়-জিজ্ঞাসা, মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনে। কেউ যদি নিজেকে প্রশ্ন করেন 'আমি কে?' তবে তার উত্তর নির্ভর করবে তাঁর মন ও মানসের ওপর। কিন্তু অপরে যখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি কে?' তখন প্রশ্নকর্তা এমন উত্তর আশা করেন যা দিয়ে তিনি উত্তরদাতাকে সহজে চিনতে পারেন। এ প্রশ্নের উত্তরে যদি কোনো বিশ্বপ্রেমিক বলেন 'আমি মানুষ, আমার দেশ পৃথিবী', তবে সে উত্তর সত্য হলেও যথার্থ হবে না, যদি না ইতোমধ্যে মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহের মনুষ্যসদৃশ প্রাণির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য প্রদর্শনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আমাদের 'বাঙালি' পরিচয় বেশি দিনের নয়। চতুর্দশ শতক থেকে এই পরিচয় শুরু হয়েছে। তখন এই পরিচয়ও ছিল দেশ বা অঞ্চলগত। উনবিংশ শতক থেকে এই পরিচয়কে একটা জাতিগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই জাতি ইংরেজি নেশন অর্থে এবং এর থেকে জাতীয়তা শব্দটা তৈরি হয়েছে। 'জাতীয়তা' বা 'জাতীয়তাবাদ' শব্দ বনেদি বাংলা অভিধানে দেখতে পাওয়া যাবে না। জাতি বা জাত বোঝাতে আমাদের দেশে ধর্মের পরিচয় বহুদিন থেকে চলে আসছে। স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ঐকাত্ম্যবোধ প্রত্যেক সমাজে মানুষের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এই মমত্ববোধ মানুষের মনের বেশ গভীরে। আচরণীয় ও অনাচরণীয় প্রশ্ন যে সমাজে ভিসা-পাসপোর্টের কাজ করে, সেখানে পরিচয়জিজ্ঞাসায় ধর্ম বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যাতে অবিবেচক আচরণের জন্যে শুদ্ধিকরণের হাঙ্গামা পোহাতে না হয়, বা তৈজসপত্র ফেলে দিয়ে গচ্ছা না দিতে হয়। আবার আমরা দেখি, ধর্ম অনেক সময় মানুষের সপ্তরিপু হয়ে দাঁড়ায়, যখন পরধর্ম কেবল ভয়াবহ মনে হয় না, হননযোগ্যও বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান দুনিয়ায় ধর্ম যার-যার তার-তার হয়েও রাষ্ট্র সকলের হতে পারে, রাষ্ট্র যদি সকলকে সমান চোখে দেখে।

বর্তমানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিচয় সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ধর্মের পরিচয় দিয়ে নিজের সীমানাও পার হওয়া যায় না, ভিনদেশের সীমানা তো দূরের কথা। আমি বাঙালি না মুসলমান?—এই প্রশ্ন পরিচয়জিজ্ঞাসায় প্রাসঙ্গিক নয়। আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারও মনে দ্বিধা থাকলেও, দেশের মানুষের পরিচয় তার দেশ দিয়ে। পরিচয়টা বিদেশির স্বার্থে। ইতিহাসে তাই দেখা যায় বহু দেশের নামকরণ হয়েছে বিদেশির হাতে। আমরা নিজেদের বাঙালি বলার বহু আগে থেকেই বিদেশি বণিক-সদাগর আমাদের বাঙালি বলে চিহ্নিত করেছে। মুসলমানদের মধ্যে নিজের দেশ দিয়ে পরিচয় দেওয়ার রেওয়াজ বহুদিনের, তাই নামের শেষে দেখা যায় দেশের নামটাও জুড়ে গেছে। শেখ নূর কুতব আলম যিনি রাজা গণেশকে উৎখাত করার জন্যে জৌনপুরের ইব্রাহিম শার্কিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি শেক নূর বাঙালি বলেই পরিচিত ছিলেন। 'ভদ্রলোক' শব্দের সঙ্গে 'বাঙালি' নামটা যখন বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় একশ'-দেড়শ' বছর আগে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে, তখন থেকে বাঙালি মুসলমানের একাংশের মনে বাঙালি পরিচয়ে যে দ্বিধা ছিল তা প্রকট হয়ে দেখা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণে ও বঙ্গোপসাগরের উত্তরে যে ভূখণ্ডটি রয়েছে সেখানে যারা বাস করে বা করবে ইতিহাস-ভূগোলে তাদেরকে বাঙালি বলেই চিহ্নিত করা হবে। মুসলমান

রাজা-আমিরদের কাছে বিলায়েত (স্বদেশ) ছিল ইরান ও তুরান। ইংরেজদের সময় বিলাত হলো গ্রেট ব্রিটেন। স্বদেশ সম্পর্কে আমাদের মনে পূর্বে যে দ্বিধাই থাক না কেন, আমাদের বর্তমান প্রতীতি, বাংলাদেশ ছাড়া আমাদের আর কোনো বিলায়েত নেই।

ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগ শেষে বাঙালি ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের নাগরিকের ওপর বর্তেছে। মুক্তি-আন্দোলনের সময় 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' বলে যে শ্লোগান দেওয়া হয় তা বাঙালির ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭ সালের মৃতবৎসা অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের চেতনা স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, যার মধ্যে অবশ্য পুরানো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেও রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ' প্রথম উচ্চারিত হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম জাতীয়তাবাদের কথা উলেখ করেন ১৯৭২-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। তাঁর কথায় Bengala irridenta (অমুক্তবাংলা) জাতীয় কোনো ভাবনা ছিল না। বলাবাহুল্য, একাত্তরের মুক্তি আন্দোলন যে আত্মসম্প্রসারণ দ্বারা চালিত তা উল্লেখযোগ্যভাবে আত্মরক্ষামূলক এবং এক স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের সীমানায় আত্মসন্তুষ্ট। শেখ মুজিব তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭২ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করেন, "আমার সোনার বাংলা আমার থাকবে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভারতে আছে, ভারতেই থাকবে।" আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এক জাতির লোক বা এক ভাষার লোক ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে বাস করছে। আর ব্যবহারিক দিক থেকে অন্য কোনো আনুগত্যের চেয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদের পাত্র। আমাদের চেতনায় যে তারল্য রয়েছে তা এই পাত্রেরই আকার ধারণ করবে। জাতীয় উত্তরাধিকারের সঙ্গে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বিশ্বমানবের কল্যাণকর উত্তরাধিকারের সমন্বয়ে সাধন করে এই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশের নাগরিককে বড় হতে হবে। নিজের পরিচয় সম্পর্কে বাংলাদেশের নাগরিকের মনে তেমন কোনো ভাবনা নেই, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি চিন্তান্বিত হলেও।

এক সময় ছিল যখন অহংকার করে বলা হতো, আজ বাংলা যা ভাবে বাকি ভারত তা আগামীতে ভাববে। বর্তমানে আমাদের সে অহংকার করার কিছুই নেই। যাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন এবং যে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ মুক্তিযুদ্ধের তদারকি করেন তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যথাসময়ে তার বিচার হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্র ওয়াকআউটের কারণে অচল হয়ে যায়। সংসদের পরিবর্তে রাজপথে সব সমস্যার ফয়সালা করার চেষ্টা হয়। ভাবাবেগে আত্মগর্বের অতিরঞ্জন এবং নেতৃবৃন্দের স্তাবকতা আমাদের কোনো সাহায্য করেনি। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা কোনো দেশ গ্রহণ করেনি। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড দীর্ঘায়িত ও জটিল করে ফেলেছি। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নবম সংসদের সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করে যদি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তবে আপাতত দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

নির্বাচিত কালপঞ্জি

এই কালনির্ণয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনেকাংশ এবং চর্তুদশ শতকের কিয়দংশ আনুমানিক।

খ্রিষ্ট-পূর্ব

৪৫০০-৩৫০০ দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষি সভ্যতার বিকাশ

২২০০ সিন্ধু সভ্যতা ১৩০০-১২০০ ইন্দো-আর্যদের আগমন

৫২৭ মহাবীরের নির্বাণ

৫৬৩-৪৮৩ বুদ্ধচরিত রচনাকাল

৩২৭-৩২৫ সেকান্দার শাহের ভারত আক্রমণ। বাংলাদেশে গঙ্গাঋদ্ধিরাজ্য

৩১৭-২৩২ মৌর্য রাজবংশ

২৬৮-২৩২ অশোক

খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে, বাংলাদেশে গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্য

৭৮ শকাব্দের সূচনা। কণিস্কের কুষাণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

৩২০ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

৩৮০-৪১০ দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত। চন্দ্রবর্মার পরাজয়

৫০৭ সমতটে বৈন্যগুপ্ত

৫১০-৫৩০ বঙ্গে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

৫৪৩-৫৪৪ উত্তরবঙ্গে গুপ্তশাসন অব্যাহত

৫৬৭-৫৯৭ চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের বঙ্গ অভিযান

৫৮১-৬০০ তিব্বতরাজ স্রং-সানের উত্তর বঙ্গে অভিযান

৬০৫-৬৩৭ গৌড় শশাঙ্কের উত্থান

৬২২ হিজরি অব্দের সূচনা

৬৩৮ য়ুয়ান চোয়াঙের বাংলাদেশ পরিভ্রমণ

৬৪৭-৬৪৮ তিব্বতরাজ ওয়ান হিয়েন সে'র আক্রমণ

৬৫০ বঙ্গে খড়্গ রাজবংশ। সমতটে ও ত্রিপুরায় রাত রাজবংশ

৬৫০-৭৫০ উত্তরবঙ্গে মাৎস্যন্যায়

৬৫৩-৬৫৪ তিব্বতরাজ স্রং-সান-গাম্পো'র গৌড় বিজয়

৭৫০-৮০০ বঙ্গে দেব রাজবংশ

৭৫৬-১০৪৫ পাল রাজবংশ

৭৫৬-৭৮১ গোপাল

৭৮১-৮২১ ধর্মপাল

৮২১-৮৬১ দেবপাল

৮৬১-৮৬৬ শূরপাল

৮৬১-৮৬৮ মহেন্দ্রপাল

৮৬১-৮৬৬ বিগ্রহপাল

৮৬৬-৯২০ নারায়ণপাল

৯২০-৯৫২ রাজ্যপাল

৯৬৯-৯৯৫ বিগ্রহপাল

৯৯৫-১০৪৩ মহীপাল(প্রথম)

১০৪৩-১০৫৮ নয়পাল

১০৫৮-১০৭৫ বিগ্রহপাল(তৃতীয়)

১০৭৫-১০৮০ মহীপাল(দ্বিতীয়)

১০৮০-১০৮২ শূরপাল(দ্বিতীয়)

১০৮২-১১২৪ রামপাল

১১২৪-১১২৯ কুমারপাল

১১২৯-১১৪৩ গোপাল(তৃতীয়)

১১৪৩-১১৬২ মদনপাল

১০৯৭-১২২৩ সেন রাজবংশ

১১৭৮-১২০৬ লক্ষণ সেন

১২০৪-০৫ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণ

১২০৬-১২২৩ বঙ্গে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন

১২১৩-১২২৭ গিয়াসুদ্দিন ইওজ খলজি

১২২০-১২২৫ রণবঙ্কমল শ্রীহরিকালদেব

১২২৭-১২৮৭ লক্ষ্মৌতি দিল্লির অধীন

১২৮২-১২৯১ বুগরাখান (নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ)

১২৫৮ বাগদাদে খেলাফতের পতন

১২৯১-১৩০১ রুকনুদ্দিন কাউকাউস

১৩১০-১৩২৭ ফিরোজশাহি সুলতানগণ

১৩০৩ সিলেট বিজয়

১৩১৩ জাফরখান গাজী কর্তৃক সাতগাঁ বিজয়

১৩২৫-১৩৩৮ মুহম্মদ তোগলোকের অধীনে লক্ষ্মৌতি সাতগাঁ ও সোনারগাঁ

১৩৩৮-১৫৩৮ স্বাধীন সুলতানি আমল

১৩৩৮-১৩৫২ বঙ্গে ফখরুদ্দিন মুবারকশাহি সুলতানগণ

১৩৪২-১৪৫২ শামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহি সুলতানগণ

১৩৪৫-৪৬ ইবনে বতুতার বঙ্গ পরিভ্রমণ

১৩৯৩-১৪১০ গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ

১০৪৫-১৪০৯ বাংলা-চীন দূত বিনিময়

১৪১২-১৪১৪	বায়জিদশাহি সুলতানগণ
১৪১৫	রাজা গণেশের উত্থান
১৪১৫-১৪৩৩	জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ (রাজা গণেশের পুত্র)
১৪১৮	মহেন্দ্রদেব (রাজা গণেশের পুত্র)
১৪৩৩-১৪৬৩	শামসুদ্দিন আহম্মদ শাহ
১৪৩৬-১৪৮৭	মাহমুদ শাহি সুলতানগণ
১৪৮৬-১৫৩৩	চৈতন্য
১৪৮৭-১৪৯৩	হাবশি রাজত্ব
১৪৯৩-১৫৩৮	হোসেন শাহি বংশ
১৪৯২	কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার
১৪৯৮	ভারতে পর্তুগিজ অনুপ্রবেশ
১৫২৬	প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভ
১৫২৯	
মে	বাবরের কাছে বাংলা বাহিনীর পরাজয়
১৫৩৯	চৌসার যুদ্ধে শের শাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়
১৫৩৯-৪০	শেরশাহের গৌড় বিজয়
১৫৫৩-১৫৬৩	মুহাম্মদ শাহি রাজত্ব
১৫৬৪-১৫৭৬	কররানি রাজত্ব
১৫৭৫	মোগল সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনশুরু
১৫৮০	মোগলবিরোধী বিদ্রোহ
১৫৮৪-১৬১২	বারো ভুঁইয়াদের ব্যর্থ বিদ্রোহ
১৫৮৫	বাংলা ফসলি সন প্রবর্তন
১৬৩২	পর্তুগিজ হুগলি বন্দরের পতন
১৬৩৯-৬০	শাহ সুজার সুবেদারি
১৬৫৮-১৭০৭	আওরংজেব
১৬৬২	মিরজুমলার আসাম বিজয়
১৬৬৪-৭৮ ও	
১৬৭৯-৮৮	শায়েস্তা খানের সুবেদারি
১৬৬৬	
২৭ জানু.	মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়
১৬৮১	আসামে মোগল আধিপত্যের অবসান
১৬৯০	যোব চানক্যের কলকাতা পত্তন
১৬৯৮	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর ক্রয়
১৭১৭	কোম্পানিকে ফখরুখসিয়ারের ফরমান দান
১৭১৭-৫১	বর্গির হাঙ্গামা
১৭৫১	আলিবর্দির সঙ্গে মরাঠাদের সন্ধি
১৭৫৬-১৭৫৭	সিরাজুদ্দৌলা
১৭৫৬	
২০ জুন	ফোর্ট উইলিয়ামের পতন
১৭৫৭	
২ জানু.	ক্লাইভ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ামের পুনর্দখল
৮ ফেব্রু.	আলিনগরের সন্ধি
২৩ জুন	পলাশির যুদ্ধ
১৭৬৪	বক্সার যুদ্ধে মির কাসিমের পরাজয়
১৭৬৫	কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ
১৭৭০	এগারো শ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
১৭৭৩	রেগুলেটিং অ্যাক্ট
১৭৭৪	ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল
১৭৭৬	
৪ জুলাই	আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ
১৭৭৮	হুগলিতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন
১৭৮৪	পিটের আইন
১৭৮৯	
১৪ জুলাই	ফরাসি বিপ্লব
১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৮১৩	কোম্পানির সনদ নবায়ন
১৮১৮	প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ
১৮২৮	ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন
১৮২৮-১৮৬২	ফরায়েজি আন্দোলন
১৮২৯	সতীদাহ প্রথা রহিত
১৮৩১	তিতুমীরের মৃত্যু
১৮৩৩	কোম্পানির সনদ নবায়ন
১৮৩৫	ফারসির পরিবর্তে সরকারি ভাষা ইংরেজি
১৮৫৫	সাঁওতাল বিদ্রোহ
১৮৫৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৮৫৭	সিপাহি বিদ্রোহ
১৮৫৮	কোম্পানি শাসনের অবসান ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন রানি ভিক্টোরিয়া'র ঘোষণা
১৮৫৯-৬২	নীল বিদ্রোহ
১৮৬০	দণ্ডবিধি আইন
১৮৬১	কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা
১৮৬৩	মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
১৮৭২-৭৩	পাবনা-বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ

১৮৭৭	রানি ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা
১৮৮৭	সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা
১৮৮১	কারখানা আইন
১৮৮৫	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন। বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন
১৯০৪-০৫	রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ
১৯০৫	
১৬ অক্টো.	বঙ্গভঙ্গ। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন
১৯০৬	
৩০ ডিসে.	নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা
১৯০৮	সন্ত্রাসবাদের প্রসার
১৯০৯-১০	মর্লি-মিন্টো সংস্কার
১৯১১	
১২ ডিসেম্বর	বঙ্গভঙ্গ রদ
১৯১২	রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তর
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ
১৯১৪-১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
১৯১৬	কংগ্রেস-লীগ লক্ষ্ণৌ চুক্তি
১৯১৭	রুশ বিপ্লব
১৯১৯	মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার
১৯২১	অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন
জুলাই	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৯২৩	স্বরাজ্য পার্টির হিন্দু-মুসলিম চুক্তি কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান
১৯২৪	কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ, ডেপুটি মেয়র সোহরাওয়ার্দি ও প্রধান কর্মধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র বসু
১৯২৫	ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা
১৯২৬–৩০	ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর ও বরিশালে দাঙ্গা
১৯২৯	জিন্নাহর চৌদ্দদফা
১৯৩০	অসহযোগ আন্দোলন
১৯৩০	
১৮ এপ্রিল	চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন
১৯৩০-৩২	গোলটেবিল বৈঠক
১৯৩২	সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ পুনা অ্যাক্ট
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন
১৯৩৭	
১ এপ্রিল	প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন
১৯৩৯–৪৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
১৯৪০	
২৩ মার্চ	মুসলিম লীগের প্রস্তাব
১৯৪২	সিঙ্গাপুরের পতন। ক্রিপস্‌মিশন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন
১৯৪৩	সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠা
১৯৪৩	তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ
১৯৪৪	গান্ধী–জিন্নাহ আলোচনা ব্যর্থ
১৯৪৬	
১৮ ফেব্রু.	রাজকীয় নৌ–বাহিনীতে বিদ্রোহ
৯ এপ্রিল	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের কনভেনশনে এক পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন
১৬ মে	ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ঘোষণা
১৬ আগস্ট	কলকাতায় দাঙ্গা। পরে নোয়াখালি ও বিহারে দাঙ্গার প্রসার
১৯৪৭	
৩ জুন	ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা
জুলাই	ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ
আগস্ট ১৪-১৫	পাকিস্তান ও ভারত–দুটি রাষ্ট্রের জন্ম
১৯৪৮	
ফেব্রু.	পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবি প্রত্যাখ্যান
২১ মার্চ	জিন্নাহর 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, ঘোষণার বিরুদ্ধে 'না' উচ্চরণ
৩১ ডিসে.	ড. শহীদুল্লাহর ঘোষণা, 'আমরা বাঙালি'
১৯৪৯	চীন বিপ্লব
১৯৫০	
ফেব্রু.	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে কনভেনশন
১৯৫২	
২৬ জানু.	একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা

২১ ফেব্রু.	রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত ও অহিউল্লাহ্ শহীদ
১৯৫৪	প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার জয়
৮ মার্চ	গভর্নর–শাসন প্রবর্তন ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল
১৯৫৭	
৮ ফেব্রু.	মওলানা ভাসানির কাগমারী সম্মেলন
১৯৫৮	
সেপ্টে.	প্রাদেশিক পরিষদে আহত শাহেদ আলীর মৃত্যু
১৯৫৯	
৭ অক্টো.	পাকিস্তান সংবিধান বাতিল। সামরিক শাসন জারি
১৯৬২	আয়ুব খান প্রদত্ত সংবিধান প্রবর্তন
১৯৬৫	পাক–ভারত যুদ্ধ
১৯৬৬	
১০ জানু.	তাসখন্দ ঘোষণা
৫ ফেব্রু.	লাহোরে শেখ মুজিবের ছয়দফা দাবি উত্থাপন
১৯৬৮	
১৯ জুন	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু
১৯৬৯	
২০ জানু.	ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত
১৫ ফেব্রু.	সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা
১৮ ফেব্রু.	ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা
২২ ফেব্রু.	আগরতলা মামলা প্রত্যাহার
২৫ মার্চ	ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক আইন জারি
১৯৭০	
১২ নভে.	সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষের মৃত্যু
১৭ ডিসে.	প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ
১৯৭১	
৩০ জানু.	লাহোরে ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক
৩ ফেব্রু.	ভারতের ওপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ
১ মার্চ	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত
৩ মার্চ	ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন
৭ মার্চ	মুজিবের ভাষণ,‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’
মার্চ	অসহযোগ আন্দোলন
২৫ মার্চ	পাকিস্তান বাহিনীর হত্যালীলা
২৬ মার্চ	স্বাধীনতার জন্যে শক্তি সংহত করার উদ্দেশ্যে মুজিবের বাণী
২৭ মার্চ	মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা
১১ এপ্রিল	বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা
৩ ডিসে.	পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ
১৬ ডিসে.	পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ
১৯৭২	
১০ জানু.	শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
১৫ মার্চ	ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ
১৬ ডিসে.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তন
১৯৭৩	
০১ জানু.	ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ ঢাকায় ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ জন নিহত ও ৬ জন আহত
০৫ জানু.	মোজাফ্ফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ
০৭ জানু.	সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা
০৮ জানু.	প্রথম শিল্প বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা। অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রতিষ্ঠান আগামী ১০ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত না করার সিদ্ধান্ত
১৩ জানু	জরুরি ভিত্তিতে কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য নির্দেশ
২৬ জানু.	মিসরের আল-আহরাম পত্রিকার সম্পাদক হাসনাইন হেইকল ঢাকায়
২৮ জানু.	শ্রমিক অসন্তোষজনিত কারণে ৪টি বস্ত্রমিলে লকআউট
০২ ফেব্রু.	রাষ্ট্রায়ত্ত ১৬টি শিল্প ইউনিট সেনাকল্যাণ সংস্থার নিকট হস্তান্তর। বঙ্গবন্ধু দুইটি আসনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
০৬ ফেব্রু.	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের ৯টি আসন লাভ
০৯ ফেব্রু.	জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের ২৪ ঘন্টার সফরে ঢাকা আগমন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক

১৩ ফেব্রু.	পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'দেশের সকল লোক বাঙালি বলে বিবেচিত হবে'
১৮ ফেব্রু.	বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের স্বীকৃতি
০৩ মার্চ	রাজস্ব বোর্ড বিলোপ ঘোষণা
০৭ মার্চ	প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
০৮ মার্চ	নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের ২৯২টি আসন লাভ
১০ মার্চ	২০ মার্চের মধ্যে বেআইনি অস্ত্র জমাদানের জন্য নির্দেশ
১২ মার্চ	মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। ৪ দিনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন
১৬ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা
২১ মার্চ	পাকিস্তান আমলে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল। পাকিস্তান আমলে রেজিস্ট্রিকৃত সকল ট্রেডমার্ক বাতিল
২৫ মার্চ	মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য ৫৪৬টি খেতাব প্রদান। যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি. জামাল বিজেডিক ঢাকায়
২৮ মার্চ	বাংলাদেশকে লেবাননের স্বীকৃতি
০৮ এপ্রিল	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত
১০ এপ্রিল	জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ
১১ এপ্রিল	পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রশ্নে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট বঙ্গবন্ধুর জরুরি বার্তা
১৩ এপ্রিল	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৭ এপ্রিল	ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আটক বাঙালি বিনিময়ের প্রস্তাব। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার সিদ্ধান্ত
০১ মে	ভারতে ছাপা ১০ টাকা ও ৫ টাকার নোট প্রত্যাহার
০২ মে	ঘাটতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের নিকট জাতিসংঘের মহাসচিবের আহবান
০৫ মে	বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের নিকট খাসজমি বন্টনের সিদ্ধান্ত
১৩ মে	দৈনিক '*স্বদেশ*' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা
১৫ মে	৩ দফা দাবিতে মওলানা ভাসানীর অনশন ধর্মঘট
১৬ মে	অনশনরত মওলানা ভাসানীর শয্যাপার্শ্বে বঙ্গবন্ধু
১৭ মে	ত্রাণমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর পদত্যাগ
১৯ মে	বেতন কমিশনের রিপোর্ট পেশ
২২ মে	বিরোধীদলীয় নেতাদের অনুরোধে মওলানা ভাসানীর অনশন প্রত্যাহার
২৩ মে	ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন। বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পদক দান
২৬ মে	পাকিস্তানে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ডাকে প্রতিবাদ
০১ জুন	প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মচারীরূপে মর্যাদা দান
০৬ জুন	কর্নেল শফিউল্লাহ ও কর্নেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত
০৭ জুন	সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনী গঠিত
১৪ জুন	অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশ। রেশনে চাল ৪০ টাকা, গম ৩০ টাকা, চিনি ৪ টাকা ও সয়াবিন ৫ টাকা নির্ধারণ
১৭ জুন	সান্ধ্য আইন জারি করে শহরে ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার অভিযান
২৭ জুন	৫ হাজার কোটি টাকার প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা খসড়া
৩০ জুন	জুলাই-ডিসেম্বর বাণিজ্যনীতি
০১ জুলাই	বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ
০৫ জুলাই	তিন বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি
১০ জুলাই	জাতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ। ১০টি স্কেল
১৩ জুলাই	বাংলাদেশকে মরক্কোর স্বীকৃতি
১৪ জুলাই	সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল ২৫৪–০ ভোটে গৃহীত
১৬ জুলাই	গঙ্গানদীর পানিবন্টন নিয়ে দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ মন্ত্রী বৈঠক। আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া ও

	মৌরিতানিয়ার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি
১৭ জুলাই	আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন পাশ
১৮ জুলাই	ভারত-বাংলাদেশ একমত না হওয়া পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ চালু না করার সিদ্ধান্ত
১৯ জুলাই	চা-নীতি ঘোষণা
২০ জুলাই	দেশব্যাপী তল্লাশি অভিযানে সেনাবাহিনী তলব
৩১ জুলাই	ট্যারিফ কমিশন গঠন। বাংলাদেশকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বীকৃতি
০১ আগস্ট	নয়া পাসপোর্ট বিধি জারি
০৪ আগস্ট	বাংলাদেশ-বার্মা বাণিজ্য চুক্তি
১১ আগস্ট	চট্টগ্রামের *দেশবাংলা* অফিসে তালা এবং ১০জনকে গ্রেফতার
১২ আগস্ট	ভাঙনে চাঁদপুরের পুরানবাজারের একাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত
২৭ আগস্ট	বাংলাদেশ-ভারত পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি
২৮ আগস্ট	প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডার বাতিল। প্রিন্টিং অর্ডিন্যান্স
০১ সেপ্টে.	চট্টগ্রামে *দেশবাংলা* বন্ধের বিরুদ্ধে ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রতিবাদ মিছিল
০৩ সেপ্টে.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন পণ্ড
০৪ সেপ্টে.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা
০৬ সেপ্টে.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রসংসদ পুনর্বহাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে ৪জনকে ব্রাশফায়ারে হত্যা
০৭ সেপ্টে.	বেসরকারি স্কুল-শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান
১৫ সেপ্টে.	বাংলাদেশকে মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতি
১৮ সেপ্টে.	মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন
১৯ সেপ্টে.	জাতিসংঘের বিমানে আটক বাঙালিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু
২০ সেপ্টে.	রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতাদানের বিল পাশ
২৪ সেপ্টে.	বাংলাদেশকে নাইজারের স্বীকৃতি
২৭ সেপ্টে.	পুনঃনির্মাণের পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ভৈরবের রেলসেতুর উদ্বোধন। পাঁচ হাজার লোককে হজ্জব্রত পালনের সুযোগদানের সিদ্ধান্ত
৩০ সেপ্টে.	বাংলাদেশকে গিনিবিসাউয়ের স্বীকৃতি
০৩ অক্টো.	বাংলাদেশকে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নে চীনের পুনরায় বিরোধিতা
০৬ অক্টো.	বাংলাদেশকে ক্যামেরুনের স্বীকৃতি। বাংলাদেশকে গিনির স্বীকৃতি
১৪ অক্টো.	আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যজোট
১৬ অক্টো.	বাংলাদেশকে জর্দানের স্বীকৃতি। শিল্প-শ্রমিক-মজুরি কমিশন
২২ অক্টো.	বাংলাদেশকে ডাহোমির স্বীকৃতি
২৬ অক্টো.	ঈদ উপলক্ষে দালাল আইনে ক্ষমাপ্রাপ্ত ৪শত বন্দির মুক্তি
০১ নভে.	বাংলাদেশের জন্য ৫৬টি সি-ট্রাক। গৃহ ও প্রতিষ্ঠান শুমারি শুরু
০৪ নভে.	বাংলাদেশকে কুয়েতের স্বীকৃতি
০৫ নভে.	বাংলাদেশকে ইয়েমেনের স্বীকৃতি
১৪ নভে.	সেনাবাহিনী কর্তৃক সুন্দরবনে দুর্বৃত্তদের গোপন ঘাঁটি ঘেরাও
১৫ নভে.	খাদ্যশস্য অভিযান শুরু
১৬ নভে.	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-শ্রমিক অর্ডিন্যান্স
২৩ নভে.	সরকারি কর্মচারীদের অবসর-গ্রহণসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স
২৭ নভে.	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচি ঘোষণা
৩০ নভে.	দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা
০৬ ডিসে.	চট্টগ্রামের *দেশবাংলা* পত্রিকার পুনঃপ্রকাশের অনুমতিদান
০৯ ডিসে.	দক্ষিণাঞ্চলের ৪টি জেলায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। শতাধিক নিহত, বহু নিখোঁজ, শতকরা ৬০ ভাগ ফসল ও কাঁচা ঘরবাড়ি নষ্ট
১৯ ডিসে.	ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন
২৯ ডিসে.	আন্তর্জাতিক বাজারদরে ভারত বাংলাদেশ থেকে ৬ লক্ষ বেল কাঁচা পাট কিনবে

১৯৭৪

০১ জানু.	ছয়মাসের জন্য ৩২৩ কোটি টাকার আমদানি নীতি ঘোষিত। নিউজিল্যান্ড-এর প্রধানমন্ত্রী নরম্যান কার্ক-এর ঢাকা আগমন
১৩ জানু.	সরকার কর্তৃক ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে সকল জনসভা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা
০১ ফেব্রু.	১৯৭৩ সনে বিভিন্ন সহিংসতায় ১৮৯৬ জনের প্রাণহানি ঘটে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
০৫ ফেব্রু.	জাতীয় সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন'৭৪ পাস
১৯ ফেব্রু.	ঢাকা মিউনিসিপালিটিকে করপোরেশন হিসেবে রূপান্তর
২২ ফেব্রু.	বাংলাদেশকে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের স্বীকৃতি
২৭ ফেব্রু.	বাংলাদেশকে নাইজেরিয়ার স্বীকৃতি
০৪ মার্চ	বাংলাদেশকে কাতারের স্বীকৃতি
১০ মার্চ	বাংলাদেশকে সম্মিলিত আরব আমিরাতের স্বীকৃতি
১১ মার্চ	প্রধানমন্ত্রীর কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম মিলিটারি একাডেমি উদ্বোধন
২১ মার্চ	বাংলাদেশকে কঙ্গোর স্বীকৃতি
০২ এপ্রিল	১.৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত
০৫ এপ্রিল	সূর্য সেন হলে ৭জন ছাত্র নিহত
০৯ মে	১০১ জনের নাগরিকত্ব বাতিল
৩০ মে	কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পেশ
০৭ জুন	প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ
০৩ জুলাই	বাংলাদেশ-ভারত আকাশপথ চুক্তি স্বাক্ষরিত
২২ জুলাই	সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন গৃহীত
০৫ আগস্ট	সরকার কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত
১৭ সেপ্টে.	জাতিসংঘে ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি
২৫ সেপ্টে.	জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের প্রথম বাংলায় ভাষণ
২৭ নভে.	সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি

১৯৭৫

০৩ জানু.	সরকার চোরাচালানি কালো-বাজারিদের মৃত্যুদণ্ড দেবার লক্ষ্যে জরুরি ক্ষমতা আইন '৭৫
২৫ জানু.	সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী গৃহীত। শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট
২৪ ফেব্রু.	প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে নতুন জাতীয় দলের ঘোষণা। অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত। শেখ মুজিবুর রহমান নতুন জাতীয় দলের চেয়ারম্যান
০৫ এপ্রিল	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা
২২ মে	বাংলাদেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যকরী বোর্ডের সদস্য
০৬ জুন	জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র—এই চার মূলনীতি নিয়ে বাকশালের সংবিধান ঘোষিত
১৬ জুন	সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স '৭৫ ঘোষিত। কেবল ৪টি দৈনিক, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা ও ১২২টি ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে
২৭ জুলাই	১ লক্ষ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বাকশাল সদস্যপদের জন্য আবেদন
১৫ আগস্ট	সামরিক বাহিনীর একটি অংশের অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ নিহত। খন্দকার মুশতাক আহমেদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। দেশে সামরিক আইন জারি
১৬ আগস্ট	সৌদি আরব ও সুদানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি
৩১ আগস্ট	চীনের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি
০১ সেপ্টে.	একদলীয় (বাকশাল) পদ্ধতি রহিত
১২ সেপ্টে.	দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ
০৫ অক্টো.	রক্ষিবাহিনী বাংলাদেশ আর্মিতে একীভূত
২১ অক্টো.	১৯ জেলায় সামরিক কোর্ট

০৩ নভে. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মো. মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং এ. এইচ. এম কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা

০৫ নভে. প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমেদ কর্তৃক প্রধান বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েমের কাছে স্বীয় দায়িত্বভার অর্পণ

০৭ নভে. সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ। অন্যান্যের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নিহত। জাসদ মে. জে. জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায়। এক বেতার ঘোষণায় জিয়াউর রহমান চিফ মার্শাল-ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা বলেন। পরে বিচারপতি সায়েমের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বগ্রহণ করেন

২০ নভে. বিদেশে প্রশিক্ষণশেষে দেশে ফিরে মেজর জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক বাহিনীর উপপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

২৩ নভে. জিয়াউর রহমান বর্তমান সরকারকে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক বলে অভিহিত করেন। এ সরকারের লক্ষ্য সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা

১১ ডিসে. পাকিস্তানে বাংলাদেশের ১ম রাষ্ট্রদূত জনাব জহিরউদ্দীন

১৯৭৬

০৪ জানু. ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব দিবস

০৪ জানু. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

০৮ জানু. সামরিক বিধির ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংশোধনী জারি

২১ জানু. আমর্ড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গঠন

০২ ফেব্রু. বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত। সশস্ত্রবাহিনীর জন্য স্বতন্ত্র কমিশন

০৭ ফেব্রু. রেশনে চাল ও গমের মূল্যবৃদ্ধি

০৮ ফেব্রু. কক্সবাজারে খনিজ বালু প্রকল্প উদ্বোধন

১১ ফেব্রু. ননগেজেটেড কর্মচারীদের পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি

১৮ ফেব্রু. কবি নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান

০১ মার্চ বাঙালির পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তা আখ্যায়িত

২৫ এপ্রিল অভ্যন্তরীণ ধান-চাল সংগ্রহনীতি

০৪ মে প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় ঘোষণা (৬ষ্ঠ সংশোধনী) জারি

১৯ মে শিশু অপহরণে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

২৮ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট পৃথিকীকরণ

৩০ মে সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক দল গঠনের অনুমতি

১৪ জুন বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইবুনাল

২১ জুন শিশু একাডেমী ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত

২৪ জুন জরুরি ভিত্তিতে একশত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কর্মসূচি

৩০ জুন সংবাদপত্র ডিকলারেশন বাতিল আদেশ রহিত ঘোষণা

০৭ জুলাই বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-করাচি ফ্লাইট শুরু

১৭ জুলাই বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার রায়। কর্নেল তাহেরের প্রাণদণ্ড। জলিল-রবসহ কয়েকজন জাসদ নেতার বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

১৯ জুলাই চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর ট্রেনিং একাডেমী উদ্বোধন

৩০ জুলাই ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু। রাষ্ট্রবিরোধী ও নাশকতামূলক কাজে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডদানের বিধি

০৪ আগস্ট রাজনৈতিক দল গঠনের নীতিমালা। কোনো দল কোনো মৃত বা জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভক্তিবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারবে না

০৭ আগস্ট সরকার-উৎখাতের ষড়যন্ত্রে সামরিক আদালতে একজন বিদেশিসহ ১৭ জনের বিচার

১১ আগস্ট নৌচলাচল আদেশ জারি

১৪ আগস্ট রাঙামাটিতে বিধিবদ্ধ রেশনিং

১৫ আগস্ট প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব-পালনের বিধি জারি

১৭ আগস্ট	ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মাছ রফতানি বৈঠক
২৫ আগস্ট	২৯টি চা-বাগান থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত
২৮ আগস্ট	দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন
২৯ আগস্ট	কবি কাজী নজরুল ইসলাম (৭৬)-এর মৃত্যু
০২ সেপ্টে.	ম্যাজিস্ট্রেটদের সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা দান
০৪ সেপ্টে.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নজরুল চেয়ার' স্থাপন
০৬ সেপ্টে.	সমবায় বিধি জারি
১৩ সেপ্টে.	ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সরকারি শ্বেতপত্র
১৪ সেপ্টে.	খুলনা পৌরসভা বাতিল
২০ সেপ্টে.	প্যাকেট চায়ের উপর থেকে শুল্ক হ্রাস
২১ সেপ্টে.	ষড়যন্ত্র মামলায় একজন বিদেশিসহ ৭জনের ১৬ বছর কারাদণ্ড। ভাসানী ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ ও পিপলস্ লীগ ৪টি রাজনৈতিক দলের সরকারি অনুমোদন
২২ সেপ্ট.	ডেমোক্রেটিক লীগের অনুমোদন
০৩ অক্টো.	হবিগঞ্জের ৪০ হাজার একর জমিতে প্রথম আমন চাষের প্রকল্প
০৭ অক্টো.	ঢাকায় তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পাট সম্মেলন শুরু। ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান পদে বাংলাদেশ
১৩ অক্টো.	জাসদ ও সাম্যবাদী দলের অনুমোদন লাভ
১৬ অক্টো.	বৈদেশিক মুদ্রাবিধি সংশোধন
২৪ অক্টো.	রাজনৈতিক দলগঠনের শর্তপূরণের প্রশ্নে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা
২৫ অক্টো.	পশ্চিম জার্মানির সাথে কারিগরি চুক্তি
৩০ অক্টো.	উপগ্রহের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে তার যোগাযোগ উদ্বোধন
০২ নভে.	পাউন্ডের সাথে টাকার পুনর্মূল্যায়ন
০৪ নভে.	রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অনুমোদন
১৭ নভে.	মওলানা ভাসানী (৯৬)-এর মৃত্যু
২২ নভে.	ঢাকায় তৃতীয় বর্মা-ভারত-বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া-উচ্ছেদ সম্মেলন
২৯ নভে.	প্রেসিডেন্ট সায়েম কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রাশাসকের দায়িত্ব মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর
১০ ডিসে.	লন্ডনে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে থেকে রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম ফ্রিগেট রণতরী ওমর ফারুক গ্রহণ
১৩ ডিসে.	ঢাকায় মানব প্রতিবেশ ৪র্থ কমনওয়েলথ সম্মেলন
১৭ ডিসে.	জিয়া কর্তৃক ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদ পুনর্খনন কাজ উদ্বাধন
২০ ডিসে.	ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন
২৮ ডিসে.	সামরিক বিধির ২৩তম সংশোধনী
২৯ ডিসে.	খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে দুটি দুর্নীতি মামলা দায়ের

১৯৭৭

১৯ জানু.	শহীদ মিনার উন্নয়নে সাতটি প্রকল্প গৃহীত
২৪ জানু.	বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রাম উপকূলে জেগে ওঠা ৫০ মাইল ভূমির সন্ধানলাভ
১১ ফেব্রু.	পাট থেকে নয়া তন্তু, জুট প্লাস্টিক আবিষ্কার
১৫ ফেব্রু.	'বাংলাদেশে মানববসতি শুরু হয় ১০ হাজার বছর আগে' প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত
২৫ ফেব্রু.	কুমিল্লার ময়নামতিতে তেরোশো বছর আগের স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান
২২ মার্চ	জোটনিরপেক্ষতার প্রতি ঢাকা-কলম্বো দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা
০২ মে	৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য সামরিক আইন আদেশ
১৬ মে	বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামি নীতিমালা সংযোজন করায় প্রেসিডেন্টের প্রতি সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদের অভিনন্দন
১৮ মে	বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ চালানোর দায়ে ২নং বিশেষ সামরিক আদালতে এক ব্যক্তির ফাঁসি

৩০ মে সারাদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত

৩১ মে গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফলের হ্যাঁ-সূচক ভোট শতকরা ৯৮.৮৭ ভাগ। না-সূচক ভোট শতকরা ১.১৩ ভাগ

৩ জুন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত

১ জুলাই জুন মাসে ময়মনসিংহে ৩৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত। ৭৪ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ

২ আগস্ট পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে জিয়া, 'পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখন আমরা স্বাধীন'

১৭ আগস্ট বিশেষ ক্ষমতা আইন সংশোধন

২৫ সেপ্টে. দীর্ঘ ১৩ বছর পর ঢাকা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত

২৮ সেপ্টে. ছিনতাইকৃত জাপানি বিমানের ঢাকা অবতরণ। ১৫৬জন আরোহী জিম্মি

০২ অক্টো. ঢাকা সেনানিবাসে সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময়। ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান বাহিনীর ১১জন ও সেনাবাহিনীর ১০ ব্যক্তি নিহত। সেনাবাহিনীর ৪০জন আহত

১৮ অক্টো. বগুড়া ও ঢাকার ঘটনায় অভিযুক্ত ৪৬০জনের বিচার সম্পন্ন। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ৩৭জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, ২০জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৬৩জন খালাস। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড

২৬ অক্টো. দু'জন বিচারপতি নিয়ে বগুড়া ও ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন। বগুড়ার ঘটনার বিচার সম্পন্ন : ৫৫জনের মৃত্যুদণ্ড, ১৪জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ১৪জন খালাস

০৫ নভে. ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফারাক্কা চুক্তি, ডিসেম্বর ১৯৭৭

১৪ ডিসে. বাংলাদেশ গুটিবসন্তমুক্ত

১৫ ডিসে. প্রেসিডেন্ট জিয়ার নয়া রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত

১৬ ডিসে. ঢাকার সেনানিবাসে জিয়ার 'শিখা অনির্বাণ' উদ্বোধন

১৯৭৮

১১ জানু. ঢাকায় সামরিক আদালতে ৮জনের মৃত্যুদণ্ড

১৮ ফেব্রু. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলিকে নাগরিকত্ব প্রদান

০৩ মার্চ জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা

২৫ এপ্রিল বিতাড়িত ২৫ হাজার বর্মি উদ্বাস্তুর বাংলাদেশে প্রবেশ

০৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিয়াউর রহমানের জয়

১৪ জুন বাংলাদেশ আইএলও গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত

২৩ জুন বৌদ্ধ জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম চীন থেকে ঢাকায় আনয়ন

২৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'পিসকোর' চুক্তি

৩০ জুলাই পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্য-জাহাজ চলাচল চুক্তি

০১ সেপ্টে. জিয়ার নতুন রাজনৈতিক দল

১৫ সেপ্টে. সীমান্ত অপরাধ দমনে ভারতের সাথে চুক্তি

২৯ সেপ্টে. মার্কিন সাহায্যে ঢাকায় আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন

৩০ সেপ্টে. ঢাকা পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তর

০৭ অক্টো. 'মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র' পুস্তক বাজেয়াপ্ত

২৬ অক্টো. বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জিয়ার আগমনে অপ্রীতিকর ঘটনা

১০ নভে. নিরাপত্তা পরিষদে এশীয় আসনে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত

১৭ নভে. রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার

০১ ডিসে. মহিলাবিষয়ক বিভাগকে মন্ত্রণালয়ে উন্নীত

০২ ডিসে. আইনসংস্কার অডিন্যান্স জারি

১৯৭৯

০৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বিল গৃহীত

২৩ মে বর্মার সাথে সীমান্তচুক্তি স্বাক্ষর

০১ আগস্ট বহুতল ভবন নির্মাণে ঋণদান বন্ধ ঘোষণা

১৫ আগস্ট একটি রাজনৈতিক মহলের ১৫ আগস্ট পালন এবং অপর রাজনৈতিক মহলের নাজাত দিবস পালন

১৫ অক্টো. পাকিস্তানের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি

১৭ নভে. ঢাকা-পিকিং কৃষি ও বিজ্ঞান চুক্তি

২৭ নভে. ১৯৭৪ সালে ঘোষিত জরুরি অবস্থার অবসান। মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল

২৮ ডিসে. ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন

১৯৮০

২০ ফেব্রু. মুক্তিযোদ্ধা চাকরিজীবীদের দুই বৎসরের সিনিয়ারিটি দান

০৮ মার্চ ২০ মার্চের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র জমাদানের ঘোষণা

১৩ মার্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০ ভাগ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের নির্দেশ

১৬ এপ্রিল স্বনির্ভর গ্রামসরকার চালুর সিদ্ধান্ত

২১ মে রংপুর জেলে গুলি, ১২ জন আহত

২৩ জুলাই সংসদে ফৌজদারি দণ্ডবিধি গৃহীত

০১ আগস্ট বেসরকারিখাতে ব্যাংকপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত

০২ আগস্ট একটি মাত্র শিক্ষা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত

০১ সেপ্টে. ১৪টি ক্যাডারের নতুন চাকরি-কাঠোমো ঘোষণা

০৩ অক্টো. স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা

১২ ডিসে. জাতীয় সংসদে যৌতুকবিরোধী বিল পাস

১৯৮১

২০ জানু. মাদার তেরেসার ঢাকা আগমন

১৬ ফেব্রু. শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ-এর সভানেত্রী নির্বাচিত

২১ এপ্রিল দক্ষিণ এশিয়া ফোরাম সার্ক গঠন

১৭ মে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ ৯জন নিহত

১ জুন চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমন। জেনারেল মঞ্জুর গ্রেফতার ও সৈনিকদের হাতে নিহত। রাঙ্গুনিয়া পাহাড় থেকে জিয়ার লাশ উদ্ধার ও ঢাকায় আনয়ন

১২ জুন শেখ হাসিনার নিকট বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হস্তান্তর

১ জুলাই সংসদ ৬ষ্ঠ সংশোধনী বিল উত্থাপন, বিরোধীদলের ওয়াক আউট

৮ জুলাই সংসদে সংবিধানের ৬ষ্ঠ সংশোধনী বিল পাস

১১ আগস্ট চট্টগ্রামে বিদ্রোহের দায়ে ১২জন সামরিক অফিসারের প্রাণ দণ্ডাদেশ

১৫ আগস্ট চট্টগ্রামে বিদ্রোহী ও জিয়াহত্যার দায়ে সেনাবাহিনীর ৩১জন অফিসার অভিযুক্ত

২২ সেপ্টে. বিভিন্ন কারাগারে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত ১২জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

১৫ নভে. বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ড. কামাল হোসেন ব্যতীত সকল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

২৭ ডিসে. শীতে রংপুরে ৪জনের মৃত্যু

১৯৮২

০১ জানু. প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে সামরিক ও বেসামরিক ৯ সদস্যের নিরাপত্তা কাউন্সিল

১১ ফেব্রু. রাষ্ট্রপতি সাত্তার কর্তৃক দুর্নীতিবাজ মন্ত্রিসভা বাতিল

২৪ মার্চ সামরিক আইন জারি

০১ জুন নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা

১০ জুলাই গ্রাম সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত

০১ সেপ্টে. সাপ্তাহিক *ইত্তেহাদ* প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা

১৩ সেপ্টে. রবিবারের পরিবর্তে শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা

০৫ অক্টো. ঢাকার ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka-এ পরিবর্তন

১৯৮৩

০৩ জানু. মসজিদ-মন্দির উপাসনালয় করমুক্ত ঘোষণা

১৫ ফেব্রু. ঢাকা ও চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

১২ এপ্রিল সাপ্তাহিক *খবর* ও *সোনার* বাংলা-র প্রকাশনা নিষিদ্ধ

২২ মে ময়মনসিংহের কারাঅভ্যন্তরে রাজ-সাক্ষী খুন

২৫ মে ঢাকায় তিনদিনব্যাপী ভারত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক পরিষদের বৈঠক শুরু

১৪ জুন — ৮ বৎসর পর রাজধানী থেকে সম্পূর্ণভাবে কারফিউ প্রত্যাহার
২৯ জুন — নয়া রফতানি নীতি ঘোষণা
২১ জুলাই — টঙ্গিতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
১২ আগস্ট — পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা চুক্তি
০৫ সেপ্টে. — দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধনী আদেশ জারি
০৩ অক্টো. — পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা
১১ ডিসে. — এরশাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ, বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরীর পদত্যাগ

১৯৮৪

১৬ ফেব্রু. — লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর ইন্তেকাল
০১ এপ্রিল — সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার
১৭ এপ্রিল — ১৯ নম্বর সামরিক আইন বাতিল
০৪ আগস্ট — এরশাদের বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত
০২ সেপ্টে. — আদমশুমারি রিপোর্ট। জনসংখ্যা ৯ কোটি ৬০ লক্ষ। বৃদ্ধির হার ২.৪

১৯৮৫

০১ ফেব্রু. — কাবা শরিফের ইমামের আগমন
২১ মার্চ — গণভোটে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আস্থা লাভ
০৭ মে — নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদার তেরেসার ঢাকা আগমন
২৪ মে — নোয়াখালীর দক্ষিণ চরাঞ্চল ও সন্দীপের উড়িরচরে ভয়াবহ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে এগারো হাজার লোকের প্রাণহানি
০৭ অক্টো. — ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ ঘোষণা
১৫ অক্টো. — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে ৩৬জন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু। দুই শতাধিক আহত। তিনদিনের জাতীয় শোক
২২ নভে. — গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে ঢাকা-দিল্লি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
০৭ ডিসে. — ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

১৯৮৬

০১ জানু. — নয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠিত
১৫ মার্চ — সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীর একসঙ্গে ৫টির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার অধ্যাদেশ জারি
১০ এপ্রিল — টঙ্গিতে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন
০৭ মে — তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
০৭ জুলাই — সংসদের ৩০জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত
২৬ জুলাই — সাভারে দেশের প্রথম আণবিক চুল্লি স্থাপন
সেপ্টেম্বর — প্রেসিডেন্ট এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান
১৫ অক্টো. — বিপুল ভোটে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত
২৪ ডিসে. — সিলেটের হরিপুরে তেলের সন্ধান লাভ

১৯৮৭

০৭ জানু. — চীনা গণ-ফৌজের প্রধান জেনারেল ইয়াং দে ঝি'র আগমন
০১ জানু. — ঢাকায় এশীয় কবিতা উৎসব
০৩ ফেব্রু. — নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়িনী মাদার তেরেসার ঢাকা আগমন
২৬ ফেব্রু. — সংসদে বাংলা ভাষা প্রচলন বিল
২৩ মার্চ — সংসদে বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) বিল পাস
০৫ মে — পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর জাতিসংঘের শান্তি পুরস্কার লাভ
০৭ মে — খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ্জী হুজুর (১০০)-র ইন্তেকাল
১০ জুলাই — পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতের ঢাকা আগমন
১৩ আগস্ট — *বাংলার বাণী*-র প্রকাশনা নিষিদ্ধ
০৩ সেপ্টে. — বঙ্গভবনে আহূত বৈঠকে বিএনপির যোগ দিতে অস্বীকৃতি
০৬ সেপ্টে. — ফেঞ্চুগঞ্জে তেলের সন্ধান লাভ
২৮ অক্টো. — দুই বিরোধী নেত্রী খালেদা-হাসিনার বৈঠক
০৮ নভে. — ঢাকায় পাঁচ বা ততধিক লোকের সমাবেশ ও মিছিল ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা
১০ নভে. — বিরোধী জোট ও দলের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, পুলিশের গুলিতে নূর

	হোসেনসহ ৪জন নিহত, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর শহরে অঘোষিত হরতাল
১১ নভে.	বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা গৃহে অন্তরীণ
০৩ ডিসে.	সাপ্তাহিক *রোববার*-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ

১৯৮৮

২৪ জানু.	চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলের মিছিলে গুলিতে ৯জন নিহত
০১ ফেব্রু.	ভুয়াপুরে যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
০৪ মার্চ	সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ
১২ এপ্রিল	'৮৭-র ২৭ নভেম্বর জারিকৃত জরুরি আইন প্রত্যাহার
০৭ জুন	ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। ৮ম সংশোধনী বিল সংসদে পাস
১৯ জুন	বাংলা একাডেমী বাংলা পঞ্জিকা সর্বত্র অনুসরণের নির্দেশ
০৭ জুলাই	মৃত্যুদণ্ড সম্বলিত নারী নির্যাতন ও মাদকদ্রব্য বিল পাস

১৯৮৯

০৩ এপ্রিল	নয়া বেতন কমিশন ঘোষণা। জুলাই থেকে মহার্ঘভাতা ১০ ভাগ বৃদ্ধি
১০ জুলাই	সংবিধানের নবম সংশোধনী
০১ সেপ্টে.	রাজধানীর বাইরে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ অবৈধ, সুপ্রীম কোর্টের রায়
০১ অক্টো.	সংবিধানের ৯ম সংশোধনী বলবৎ
০৭ অক্টো.	সরকারি অফিসে ৯ট-৪টা অফিস চালু
০৭ ডিসে.	সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস উদ্বোধন

১৯৯০

২২ ফেব্রু.	ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ ও মাদাম দানিয়েল মিতেঁরা ঢাকায়
০১ মে	জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোশিকো কাইফু ও মাদাম শাচিও ঢাকায়
০৫ ডিসে.	তিন বিরোধী জোট ৮,৭ ও ৫ দলের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ

১৯৯১

১২ জানু.	অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত এরশাদ গ্রেফতার
২৮ ফেব্রু.	২৯৪টি আসনের প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৮৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াত ১৮টি, সিপিবি ৫টি, বাকশাল ৪টি ও ন্যাপ ১টি আসন পায়
০৫ জুন	জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন 'সরকার পদ্ধতি মীমাংসা করে আমাকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিন'
১০ জুন	বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় সংসদীয় পদ্ধতির সিদ্ধান্ত
১২ জুন	অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে এরশাদের ১০ বছর জেল
৩০ জুলাই	বাকশাল আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত
১৩ আগস্ট	রাত ২টা ৪৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন বিল বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পাস হয়। সাংসদদের প্রকাশ্য ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা
০৪ অক্টো.	রাষ্ট্রপতি পদে দু'জন প্রার্থী গোলাম আযমের দোয়া চান
০৮অক্টো.	সাংসদদের প্রকাশ্য ভোটে ১৭২ ভোট পেয়ে আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ৯২ ভোট পান
০৯ অক্টো.	আবদুর রহমান বিশ্বাসের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ। শপথ-অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন না
২৯ ডিসে.	গোলাম আযমের জামায়াতের আমির হিসেবে আত্মপ্রকাশ

১৯৯২

০৯ জানু.	বাংলাদেশে প্রথম ও বিশ্বের বিরল ঘটনা। সংসদে বিভক্তি ভোটে সরকারি দলের হার
১১ ফেব্রু.	গোলাম আযম ও তাঁর সহযোগীদের বিচারের লক্ষ্যে জাহানারা ইমামকে আহবায়িকা করে জাতীয় সমন্বয় কমিটি
২৪ মার্চ	বিদেশি নাগরিক আইনের অধীনে গোলাম আযমকে আটক এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ

২৮ মার্চ — জাহানারা ইমামসহ ২৪জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

১৬ এপ্রিল — গোলাম আযম ইস্যুতে সংসদে জামায়াত ছাড়া সব বিরোধী সাংসদদের ওয়াক-আউট

২১ জুন — প্রেসক্লাবে সাংবাদিক-জনতার ওপর পুলিশের লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস

২৬ জুন — ভারতের বাংলাদেশের কাছে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর সম্পন্ন

১৭ সেপ্টে. — ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচদল নেতা সংসদ-সদস্য রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ

১১ নভে. — মার্কিন সিনেট উপকমিটির প্রধান ক্যারি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৫২ কোটি ডলার বিদেশে পাচার করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে'

১৯৯৩

০১ জানু. — বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরিশাল বিভাগের উদ্বোধন

১০ এপ্রিল — সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু। খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত

১৯৯৪

১৫ ফেব্রু. — চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু

১০ এপ্রিল — প্রধানমন্ত্রীর ৭০ কোটি মার্কিন ডলার (দুই হাজার আটশ কোটি টাকা) ব্যয়সাপেক্ষে ৪.৮ কিলোমিটার যমুনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২২ জুন — গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল, সুপ্রিম কোর্টের রায়

১৯৯৫

১০ অক্টো. — ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির ঢাকা আগমন

০২ নভে. — প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত

১৯৯৬

৩১ জানু. — প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধনের প্রতিবাদ করায় ২ শতাধিক আহত। জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলা

২৪ ফেব্রু. — অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশ

১১ মার্চ — রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকশেষে খালেদা জিয়া '১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল সম্ভব নয়'

২১ মার্চ — তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন

২২ মার্চ — রাজধানীতে মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর উদ্বোধন

৩০ মার্চ — প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার। রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেন। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

১৩ জুন — আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

২৩ জুন — শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীসহ ২০ সদস্যের মন্ত্রিসভার শপথ

১৪ আগস্ট — রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রথম জাতীয় শোকদিবস পালন

০৮ অক্টো. — বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ

১২ মার্চ — বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু

১৯৯৭

০৭ মার্চ — বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণস্থলে প্রধানমন্ত্রীর 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্বলনের উদ্বোধন

১২ নভে. — সংসদে ইনডেমনিটি বাতিল বিল পাস

৩০ মে — শনি ও রোববার ২ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা

৩১ আগস্ট — দিনাজপুরের ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়ে অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্যের ফাঁসি

২৪ সেপ্টে. — একাত্তরের ডিসেম্বরে সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা দায়ের

০২ নভে. — বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই সংসদের ৭ম অধিবেশন শুরু

০২ ডিসে. — সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৯৮

০৩ মে — রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার বিল ১৯৯৮ পাস

৩১ মে — প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টুঙ্গিপাড়ায় দেশের প্রথম বয়স্ক-ভাতা কর্মসূচির উদ্বোধন

১৮ জুন — পাঁচ বছরের জন্য বন্য পশুপাখি শিকার নিষিদ্ধ

০৫ জুলাই — ঢাকায় মিটারযুক্ত ট্যাক্সিক্যাবের উদ্বোধন

০৬ আগস্ট — বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ আদায় একবছর বন্ধ–প্রধানমন্ত্রী

০৭ সেপ্টে. — হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি পানি, ১৫.৪ মিটার–এর রেকর্ড অতিক্রান্ত

০৮ নভে. — বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার-আদালত কর্তৃক ১৫ জনকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। ৪ জন খালাস। আসামি বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আনয়ন

১৯৯৯

১৯ জানু. — রাত দশটায় চাঁদ দেখার খবর, দেশে একদিনে ঈদ হলো না

০৭ মার্চ — মধ্যরাতে যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শক্তিশালী টাইমবোমার বিস্ফোরণ, নিহত ৮, আহত দেড়শত

০১ মে — স্বাধীনতার পর মে দিবসের মিছিলের ওপর প্রথম পুলিশি হামলা, জখম ১৫

০৭ আগস্ট — 'মিরপুরে মুসলিম বাজারে পাওয়া হাড় বাঙালি ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের'—এ যাবৎ ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল

১৪ অক্টো. — বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত, ২০০০ সালের ১ জানু. থেকে দু'বছরের জন্য

১৭ নভে. — ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব করে ২৭টি দেশ

১৮ ডিসে. — ২৯ বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান

২০০০

০১ জানু. — বাংলাদেশের দশম প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের শপথ গ্রহণ

০৬ ফেব্রু. — বঙ্গবন্ধু হত্যার ডেথ রেফারেন্স আগাম শুনানির দিন নির্ধারণে হাইকোর্টের দুটো বেঞ্চে অপারগতা। ১৯৯৬ সালের পুরোনো ডেথ রেফারেন্সের শুনানির পর ক্রমান্বয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার শুনানি হবে

০৭ ফেব্রু. — গ্রামীণ ব্যাংকের আমন্ত্রণে স্পেনের রানি সোফিয়া ঢাকায়

২১ ফেব্রু. — প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

০২ মার্চ — ক্লিনটনের আগমন উপলক্ষে রাজধানীতে রেড অ্যালার্ট

০৯ মার্চ — ক্লিনটনের নিরাপত্তায় ৫১ সদস্যের মার্কিন নিরাপত্তা টিম ঢাকায়

০৩ মে — শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামে এলিফ্যান্ট রোডের নামকরণ

১০ মে — বেসরকারি টেলিভিশন 'একুশে টিভি'র উদ্বোধন

২৫ মে — হাইকোর্ট বিভাগে পাঁচজন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ। প্রথম মহিলা বিচারপতি নাজমুল আরা সুলতানা। ১৯৭৫ সালে দেশের প্রথম মহিলা মুন্সেফ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন

০৭ জুন — ছয়দফার স্মৃতিবিজড়িত ৭ জুন রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত

০৮ জুলাই — বিশ্বের ১৯১ দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশের স্থান ৮৮ তম এবং সার্ক দেশের মধ্যে তা দ্বিতীয়

০৯ জুলাই — কপিরাইট আইন ২০০০ পাস

২১ জুলাই — কোটালিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নির্মিত জনসভা মঞ্চের ৫০ গজের মধ্যে ৭৬ কোটি ওজনের একেবারে নতুন ধরনের বোমা উদ্ধার

২০ সেপ্টে. — পুরুষসঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বাংলাদেশে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়, ৪৭%।–বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০-এর প্রতিবেদন

১৪ নভে. — জাতীয় সংগীতের প্যারোডি প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় ইনকিলাব-এর পরিচালক গ্রেপ্তার। গভীর রাতে হাইকোর্টের

	বেঞ্চ থেকে সম্পাদকের জামিন লাভ
২৩ নভে.	বিচারপতি লতিফুর রহমানের পদত্যাগ

২০০১

১০ জানু.	দিনে রাজধানীতে ট্রাক চলাচল বন্ধ জ্যেষ্ঠতা অতিক্রম করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি রুহুল আমিনকে নিয়োগ
০৯ ফেব্রু.	দেশে শিক্ষকদের মানববন্ধন ও প্রতীক অনশন পালন
১১ ফেব্রু.	ঢাকা মহানগরীর রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে হাইকোর্টের নির্দেশ। এই আদেশ পালিত হচ্ছে কিনা তিনমাস পরপর তা আদালতকে জানানোর জন্য পুলিশের আইজির প্রতি নির্দেশ
১৩ ফেব্রু.	২০০৪ জানু. থেকে ইপিজেড–এ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুবিধা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত
০১ মার্চ	পতাকা বিধিমালায় পরিবর্তন। প্রধানমন্ত্রী বিমানে এবং প্রধান বিচারপতি গাড়িতে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করবেন
০২ মার্চ	গাবতলী কোরবানির হাটে উটের পাশে চিত্রল হরিণ। ৪টি হরিণের দাম ১ লাখ ৬০ হাজার
০৫ এপ্রিল	শনিবার সরকারি ছুটি বাতিল
০৮ এপ্রিল	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন
১৭ এপ্রিল	৩০ বছর পর ভারতের দখল থেকে পাদুয়া গ্রাম পুনরুদ্ধার। সীমান্তে উত্তেজনা
২৭ মে	নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ
৩০ মে	দেশের প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম। মা ফিরোজা বেগম (৩২), পিতা আবু হানিফ
০৪ জুলাই	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
২৮ জুলাই	২১ জেলায় নতুন ডিসি, ৪ কর্মকর্তা ওএসডি
০২ আগস্ট	২৭ এসপি ও ১০৮ ইউএনও বদলি
০৪ আগস্ট	সারা দেশে পুলিশের ৪৫৩ ইন্সপেক্টর বদলি
১৯ আগস্ট	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা
২৮ আগস্ট	১ জানু. ২০০১ তারিখ থেকে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল
০৬ সেপ্টে.	এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয়। গড় পাসের হার শতকরা ২৮.৪১ ভাগ
২২ সেপ্টে.	সারা দেশে ৫৫ হাজার সেনা মোতায়েন
০১ অক্টো.	বিএনপিসহ চারদলের বিপুল বিজয়
০৪ অক্টো.	নির্বাচনের সহিংসতায় আ. লীগ ও সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত
০৬ অক্টো.	আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় নিহত ৪। লালমনিরহাট ও নীলফামারীতে নিহত ৮
১০ অক্টো.	খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী। ২৮ মন্ত্রী, ২৮ প্রতিমন্ত্রী, ৪ উপমন্ত্রী মোট ৬০ জনের বিশাল মন্ত্রিসভা
১৫ অক্টো.	৭ নভেম্বর সরকারি ছুটি
২১ অক্টো.	সারাদেশে নিরানন্দ পরিবেশে শারদীয়া দুর্গাপূজা শুরু
২৪ অক্টো.	অর্থ বছরের প্রথম ৩ মাসে ৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ কমেছে
২৮ অক্টো.	আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে অষ্টম সংসদের যাত্রা শুরু
০৫ নভে.	সাপ্তাহিক ছুটি শুধু শুক্রবার। নতুন অফিস সময়। শনি থেকে বুধবার ৯টা-৪টা। বৃহস্পতিবার ৯-২টা
০২ ডিসে.	সংসদে জাতির পিতার পরিবার-সদস্যদের নিরাপত্তা (রহিত করণ) বিল ২০০১ পাস। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতির সম্মতিদান
০৫ ডিসে.	
২৬ ডিসে.	এইচ.এস.সি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রছাত্রী ১শ টাকা বৃত্তি পাবে

২০০২

০১ জানু.	আজ থেকে রাজধানীতে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ। আট বছরের

	পুরোনো বেবি ট্যাক্সি, ২০ বছরের পুরোনো বাস এবং ১৫ বছরের পুরোনো ট্রাক রাজধানীতে চলবেনা
১৯ জানু.	বোর্ডের স্কুল পাঠ্যে পরিবর্তন: '৭১-এ সুপ্রিম কামান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা
ফেব্রু.	"বিশ্বে কেবল বাংলাদেশের জনগণকেই মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে রক্ত দিতে হয়েছে।"–ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী
১৩ মার্চ	সংসদে অ্যাসিড অপরাধ দমন বিল পাস
২৪ মার্চ	পানি সংকট মোকাবিলায় রাজধানীতে সেনাবাহিনী
০১ এপ্রিল	প্রশাসনে প্রচলিত রীতি ভেঙে এই প্রথম একজন চুক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীকে, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে দায়িত্ব দান
০২ এপ্রিল	জননিরাপত্তা আইন বাতিল, দ্রুত বিচারের নয়া আইন অনুমোদন
০৮ এপ্রিল	জনতার মঞ্চ থেকে সরকার উৎখাতের অভিযোগে মহিউদ্দিন আলমগীর ও সফিউর রহমান সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের
২৬ এপ্রিল	বাংলাদেশের ৩২ বছরের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তারেক মাসুদ নির্মিত 'মাটির ময়না'-র কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ
২৭ মে	প্রধান বিচারপতির পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনজন অতিরিক্ত বিচারপতি স্থায়ী না করায় আইন মন্ত্রীর বক্তব্য, 'কোনো নীতি লঙ্ঘিত হয়নি'
১১ জুন	১ম মেয়াদ শেষের আগেই সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. হারুনকে ১৬ই জুন থেকে বাধ্যতামূলক অবসর। নতুন সেনাপ্রধান মে. জে. মাশহুদ চৌধুরী
১৭ জুলাই	বাংলাদেশ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামের 'শহীদ জিয়া অডিটোরিয়াম' নামকরণ
২৩ জুলাই	ইউএনডিপির মানব দারিদ্র্যসূচক ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। সার্কের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন
০২ আগস্ট	ঢাকা মহানগরীতে পাঁচশতাধিক লোক ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত, ১২ জনের মৃত্যু
২৬ সেপ্টে.	ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে চারদিনব্যাপী প্রথম সার্ক বইমেলা শুরু
২৪ অক্টো.	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ জারি। 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
৩০ অক্টো.	লুই কানের নকশা পরিবর্তন করে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাড়ি নির্মাণ স্থগিত
০৭ নভে.	২১ জেলায় ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়, মানুষ দিশেহারা
০৮ নভে.	মাগুরায় ১২ হাজার চকলেট বোমা উদ্ধার
১০ নভে.	ছয় ডিভিশনে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠিত
১১ নভে.	চাঁদা তোলার সময় ফেনীতে দুই পুলিশ কন্সটেবল আটক
১৪ নভে.	দেশে সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষণা
১৫ নভে.	একমাস অপারেশন ক্লিনহার্টে ৫ হাজার ৭৭২ জন গ্রেপ্তার। সেনা হেফাজতে ও পরবর্তীকালে ২৪ জনের মৃত্যু। ৮৫৮টি অস্ত্র, ২৩ হাজার ২৯ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার
১৭ নভে.	পাকশি নর্থবেঙ্গল পেপার মিল বন্ধ ঘোষণা
২৫ নভে.	মাঠ প্রশাসনে ১৪০০ কর্মকর্তা কর্মস্থলে থাকেন না
১৭ ডিসে.	দেশে আনুমানিক ৩১৭ শিশু এইডস আক্রান্ত। — ইউনিসেফ
২৩ ডিসে.	২৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর শুরু

২০০৩

৯ জানু. — ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি। হত্যার দায় থেকে সেনাদল মুক্ত। উপমহাদেশের শত বছরের ইতিহাসে এই অধ্যাদেশটি ৪র্থ ইনডেমনিটি

২৩ জানু. — ৩৪ বছরের ইতিহাসে তীব্র শীত। রাজশাহীতে তাপমাত্রা ৩.৪

০১ মার্চ — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৭০০ জালিয়াতি

২৩ এপ্রিল — বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের অন্যতম রুট। লন্ডনের বাঙালিরা এ দেশ থেকে পাচার হওয়া হেরোইন সেবন করে

২২ মে — মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন, ৩ মন্ত্রী ও ৩ প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ,১১ জনের দপ্তর পুনর্গঠিত

২৪ মে — অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চারটি শিশুসহ ঢাকার মতিঝিলে মডেল হাইস্কুলের শিক্ষিকা মর্জিনা বেগম গ্রেপ্তার

৩১ মে — দেশে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। ৫০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং

৪ জুন — দেশে মিঠা পানির অভাব তীব্র হচ্ছে। পানি সংকটে ৩ কোটি মানুষ। সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ, সারাদেশে সরবরাহ সমস্যা

০৭ জুন — ৪০০ কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সরকারি পরিকল্পনা। একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় ১১১ কোটি টাকা

০৮ জুন — ঢাকায় নারী ট্রাফিক পুলিশের প্রথম কর্মদিবস

১৯ জুন — বাংলাদেশ ৪৬টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। — সংসদে প্রধানমন্ত্রী

২৫ জুন — বাংলা একাডেমীর বটমূলে নজরুল মঞ্চ উদ্বোধন

৮ জুলাই — জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনে মাঝারি মানব উন্নয়নের দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

২৯ আগস্ট — জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের ১১ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত

১৯ অক্টো. — দেশে বাঘ ৩৬০টি

১৪ নভে. — প্লাস্টিক শিল্প বছরে ৬ বিলিয়ন টাকার জিনিস রপ্তানি করছে

০১ ডিসে. — গতবছর ডিসেম্বর পর্যন্ত এইডস রোগীর সংখ্যা ছিল ২৪৮। এ বছর আরো ১৩ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশের অর্ধেক মানুষ এইডস ঝুঁকির মধ্যে

২০০৪

১ ফেব্রু. — ঢাকায় যুব বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন

১৭ ফেব্রু. — দুর্নীতিদমন কমিশন বিল পাস

১৪ এপ্রিল — বিবিসি বাংলা সার্ভিসের এক জনমত জরিপের ফলাফলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষিত

১১ মে — খুলনার কুখ্যাত খুনি এরশাদ শিকদারের ফাঁসি

১২ মে — ১১ মাস সংসদ বর্জনের পর আ. লীগ এমপিরা সংসদে

২৩ মে — মেঘনায় দুটি এবং পাটুরিয়া ঘাটে দুটি লঞ্চ ডুবে শতাধিক নিহত

০৪ জুন — ঢাকার শাহবাগে একটি দোতলা বাসে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগে নয়জনের প্রাণহানি

০৫ জুন — ১৪ ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত সফরে আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ঢাকায়

০৬ জুন — মুন্সিগঞ্জ-১ উপনির্বাচনে বিকল্প ধারা-র প্রার্থী মাহী বি চৌধুরীর জয়লাভ

১০ জুলাই — দেশের চৌষট্টিটি জেলায় বন্যার ভয়াবহ প্রকোপ। ছয়জনের মৃত্যু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভাটা, সন্তান গ্রহণের হার ৯ বছর ধরে কমছে না

১৫ জুলাই — মানব উন্নয়নসূচকে বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে ১৭৭ দেশের মধ্যে ১৩৮ নং। মধ্য উন্নত দেশ। জীবন প্রত্যাশা লাফিয়ে ৬১.১ বছর

৪ আগস্ট — 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বৈধ।' হাইকোর্টের এক পূর্ণ বেঞ্চের রায়

২১ আগস্ট — বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সমাবেশে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেনেড হামলায় নিহত ১৭, আহত ৪০০০

২৪ আগস্ট — গ্রেনেড হামলায় আহত আইভি রহমানের মৃত্যু

০১ সেপ্টে. — গ্রেনেড হামলার তদন্তে ঢাকায় এফবিআই এবং ইন্টারপোলের আরো দুই কর্মকর্তা। ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ২ পুলিশের ফাঁসি কার্যকর

১৪ সেপ্টে. — উচ্চকণ্ঠে কোরানশরিফ তেলাওয়াত না করার জন্য বগুড়ার এক মাদ্রাসার কারি আব্দুল মজিদ সরদার ১৭ জন শিশু ছাত্রের কান কেটে দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা তাঁকে গণধোলাই দেয়

১৭ সেপ্টে. — বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ। প্রায় ৫১ বছরের মধ্যে ২৪ ঘন্টায় ঢাকায় ৩৪১ মিলিমিটার বৃষ্টি। সর্বোচ্চ রেকর্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য অচল। সরকারি ছুটি

২০ অক্টো. — জেলহত্যা মামলায় ৩১ সেনা-সদস্যের ফাঁসি, ১২ জনের যাবজ্জীবন, রাজনীতিক আসামিরা সব খালাস

২৩ অক্টো. — ১৯ জন নবনিযুক্ত বিচারক থাকলে সৌজন্যবিনিময় অনুষ্ঠান বর্জন করবেন আইনজীবীরা

২৫ অক্টো. — র‍্যাবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের রিট আবেদন

৩০ ডিসে. — ৯ থেকে ১১ জানু.তে আহূত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত

২০০৫

৩১ মার্চ — বিটিটিবির মোবাইল নিয়ে হুলস্থূল, পুলিশের লাঠিচার্জ, প্রথমদিনে মাত্র ১৯০০ ফরম বিতরণ

২২ মে — রূপসা নদীর ওপর প্রধানমন্ত্রীর খান জাহান আলী সেতু উদ্বোধন

২৩ মে — বিচারপতি এম এ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত। সারাদেশে আদালত প্রাঙ্গণে সভা মিছিল আন্দোলন নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট ডিভিশনের এক অন্তর্বর্তী-কালীন আদেশ

৩১ মে — ঢাকায় নতুন দৈনিক 'সমকাল'-এর আত্মপ্রকাশ। মইন উ আহমদ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

০৪ আগস্ট — শান্তি পুরস্কারের জন্য নোবেল কমিটির ১৬জন বাংলাদেশী নারীকে মনোনয়ন

০৬ আগস্ট — দেশে ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস আছে।— জ্বালানি উপদেষ্টা

১৭ আগস্ট — ৩৫টি উপজেলায় বন্যার ক্রমাবনতি। বিশ্বের প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে খালেদা জিয়ার স্থান ২৯ নম্বরে। কণ্ডোলিৎসা রাইস সবার উপরে

১৫ সেপ্টে. — ২০১৫ সালে ঢাকা হবে বিশ্বের সপ্তম জনবহুল শহর

০৯ অক্টো. — জোট সরকারের চার বছরে ক্রসফায়ারে বিশ্বরেকর্ড, হত ১৪০০

২০ অক্টো. — বিচার বিভাগ আলাদা করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সরকারের সময় প্রার্থনা নাকচ। এ পর্যন্ত সময় নেওয়া হয় ২১ বার

২৭ অক্টো. — ১০ ট্রাক অস্ত্রমামলার আসামি হাফিজুরের হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ

১১ নভে. — জন্মভূমিতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন, দেড়শ কোটি মানুষের নেতাদের সমাবেশ, বিমানবন্দর থেকে শেরাটন হোটেল পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটারে ১২ হাজার নিরাপত্তাকর্মী

০১ ডিসে. — আইনজীবীদের ডাকে সারাদেশে হরতাল

২২ ডিসে. — 'পরিবেশ সংরক্ষণের নামে ফালতু আবেগের দোহাই দিয়ে অতিথি পাখি শিকার বন্ধ করা হয়েছে। তাদের কি আমরা দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছি। তা হলে আবার অতিথি কিসের ?'

২০০৬

১২ ফেব্রু. — আড়ি পাতার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ সংশোধন আইন পাস

০৬ এপ্রিল — কানসাটে বিদ্যুৎ আন্দোলন-কারীদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘাত, নিহত ৪,আহত শতাধিক

৬-১৬ এপ্রিল — কানসাটে বিদ্যুৎ আন্দোলন-কারীদের কাছে সরকারের নতি স্বীকার

২১ এপ্রিল — সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ টি বাংলা গানের মধ্যে ১৩ তম জয় বাংলা, বাংলার জয়

০১ মে — ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ উন্নতি, এবার ১৯ তম

৩ মে — সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গান, আমার সোনার বাংলা

১২ মে	সারা দেশে ঝড়- বৃষ্টি বজ্রপাত। নিহত ১০। কানসাটে পুলিশের গুলিতে নিহত ৪
২৬ মে	৪৮ ঘণ্টায় ক্রসফায়ারে মারা গেছে ছয় জন
২৭ মে	দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্যপ্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে ডিম পাড়ছে রুইমাছ, জেলে পল্লীতে উৎসব
৩০ মে	ঝালকাঠির দু'জন বিচারক হত্যার মামলায় জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান, সেকেন্ড ইন কমান্ড বাংলাভাই এবং অন্য পাঁচ শুরা সদস্যসের মৃত্যুদণ্ড
১৬ জুন	প্রতিরক্ষা রীতি নেই, সশস্ত্র বাহিনী চলছে ওয়ারবুক দিয়ে
২২ জুন	এস.এস.সি-তে ৭ বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৯.৪৭। জিপিএ পেয়েছে ২৪৩৮৪। দাখিলের পাসের হার ৭৫.৮১, ভোকেশনালে ৬১.৩৭ ভাগ
২৭ জুন	সংসদের কোরাম সংকটে গত ৫টি অধিবেশনে প্রায় তিন কোটি টাকা অপচয়
২৬ জুলাই	বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক বন্দর চট্টগ্রাম
১৭ আগস্ট	কবি শামসুর রাহমান (৭৭)-এর মৃত্যু
১৬ সেপ্টে.	দেশের ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠান কাজের উপর্যুক্ত লোক পায়না। — বিশ্বব্যাংক
০৬ অক্টো.	দেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ভালো হচ্ছে, স্ট্রবেরির চাষও সম্ভব হচ্ছে
২৮ অক্টো.	বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হতে নারাজ
২৯ অক্টো.	রাষ্ট্রপ্রতির স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ
১১-১৫ নভে.	অবরোধে দেশ অচল
২৩ ডিসে.	আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী সমঝোতা

২০০৭

১১ জানু.	দেশে জরুরি অবস্থা। রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ। সংসদ নির্বাচন স্থগিত
১২ জানু.	বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমদ নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা
০১ মার্চ	দেশের পঞ্চদশ প্রধান বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন
১৫ মার্চ	৭ টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'টিফা' সই করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ
১৮ মার্চ	বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু
২১ মার্চ	জরুরি বিধি সংশোধন, জামিন আবেদন করা যাবে না
৩০ মার্চ	৬ শীর্ষ জঙ্গি শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, আতাউর রহমান সানি, আব্দুল আউয়াল, ইফতেখার-হাসান আল মামুন ও খালেদ সাইফুল্লাহর ফাঁসি কার্যকর
০৩ এপ্রিল	চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত
২৪ এপ্রিল	দশ জেলায় কাল বৈশাখী
০১ মে	দেশে এক কোটি শিশু অতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত
২৫ মে	মধ্যপাড়া কঠিন শিলা পাথর খনিতে উত্তোলন শুরু
[illegible] জুন	দেশে বজ্রাহত হয়ে নিহত ১৬
২২ জুন	পলাশি যুদ্ধের আড়াইশ বছর পালিত
৭ নভেম্বর	৮ জেলায় ৬ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প
১৫ নভে.	সিডর (সিংহলি ভাষায় চক্ষু) সাইক্লোনে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত

২০০৮

৩১ ডিসে.	সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার শেষ সময়সীমা

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কাল)
উয়ারী-বটেশ্বর

ধূসর মৃৎপাত্র, মহাস্থানগড়
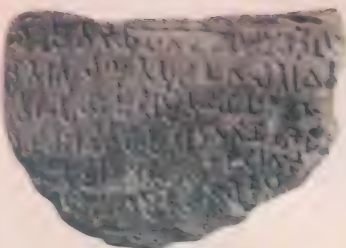
ব্রাহ্মীলিপি (খ্রিষ্টপূর্ব ৩ শতক)
মহাস্থানগড়

মৃৎপাত্র, সঞ্চয়াধার
মহাস্থানগড়

মৃৎপাত্র, পাহাড়পুর

মৃৎপাত্র, সঞ্চয়াধার
মহাস্থানগড়

মৃৎপাত্র, বরেন্দ্র

সুসজ্জিত ভাস্কর্য
পোড়ামাটির ফলক
(আদি-ঐতিহাসিক কাল)
চন্দ্রকেতুগড়, পশ্চিমবঙ্গ

বজ্রসত্ত্ব অষ্টধাতু
ময়নামতি,
কুমিল্লা

দুর্গপ্রাচীর, মহাস্থানগড় (আদি-ঐতিহাসিককাল)

অবলোকিতেশ্বর.
ব্রোঞ্জ.
ময়নামতি.
কুমিল্লা

ব্রোঞ্জ স্তূপ.
(ময়নামতি)

স্তূপ, সত্যপীর ভিটা, পাহাড়পুর, নওগাঁ

কেন্দ্রীয় মন্দির, সোমপুর বিহার (৮-৯ শতক), পাহাড়পুর

বৌদ্ধ ব্রোঞ্জ, পাহাড়পুর
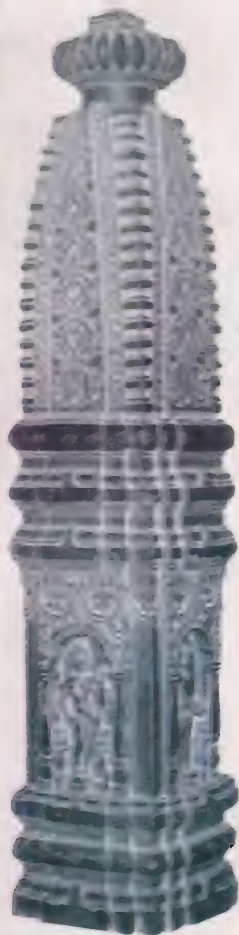
নিবেদন মন্দির
(১০ শতক)
নিমদীঘি,
রাজশাহী

নাগ দরওয়াজা (১০-১১ শতক)
বানগড়, পশ্চিমবঙ্গ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
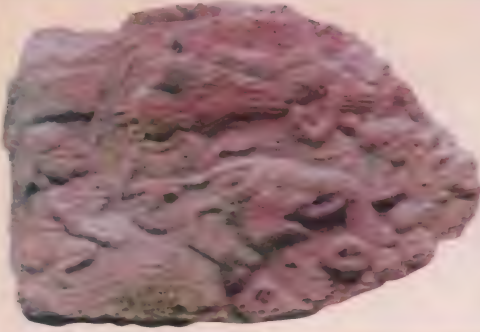
হাতির পিঠে ভ্রমণরত নারী,
পোড়ামাটির ফলক
(খ্রিষ্টপূর্ব ১ শতক)
চন্দ্রকেতুগড়

ত্রিরত্ন স্তূপ
(কোটিলা মুরা)

ধীবর দীঘি স্তম্ভ
(৮৫৪-৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ)
নওগাঁ

আদিনা মসজিদের ঈওয়ান ও তৎসন্নিহিত অংশ

সমাধি, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (১৪ শতক), সোনারগাঁও

দরাসবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০৩-১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ), চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ষাটগম্বুজ মসজিদ (১৫ শতক), বাগেরহাট

বাবা আদম শহীদ মসজিদ (একলাখী রীতি), ১৫ শতক, মুন্সিগঞ্জ

আতিয়া মসজিদ (১৬০৯-১০), টাঙ্গাইল
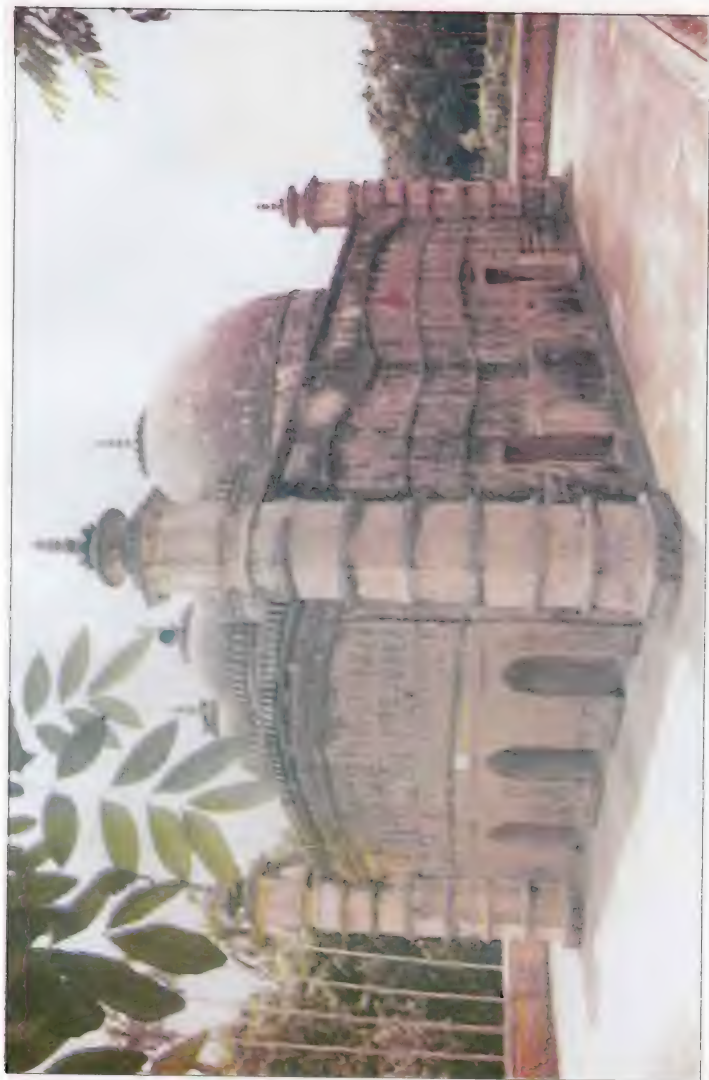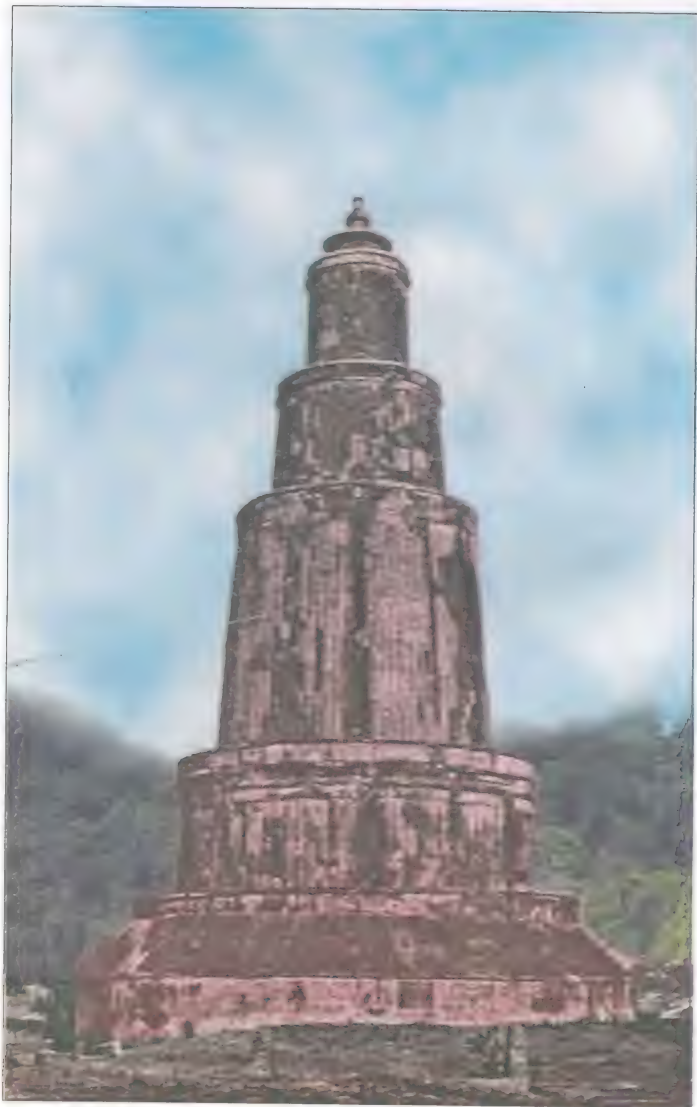
ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার (১৩ শতকের শেষার্ধ)

বখতিয়ার খলজির স্বর্ণমুদ্রা (খ্রিষ্টাব্দ ১২০৪-০৫)

আলি মর্দানের রৌপ্যমুদ্রা
(খ্রিষ্টাব্দ ১২০৮-১৩)

ইলতুতমিসের রৌপ্যমুদ্রা
(খ্রিষ্টাব্দ ১২১০-৩৫)

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের স্বর্ণমুদ্রা (খ্রিষ্টাব্দ ১৪৯৪-১৫১৯)

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রৌপ্যমুদ্রা (খ্রিষ্টাব্দ ১৪৯৪-১৫১৯)
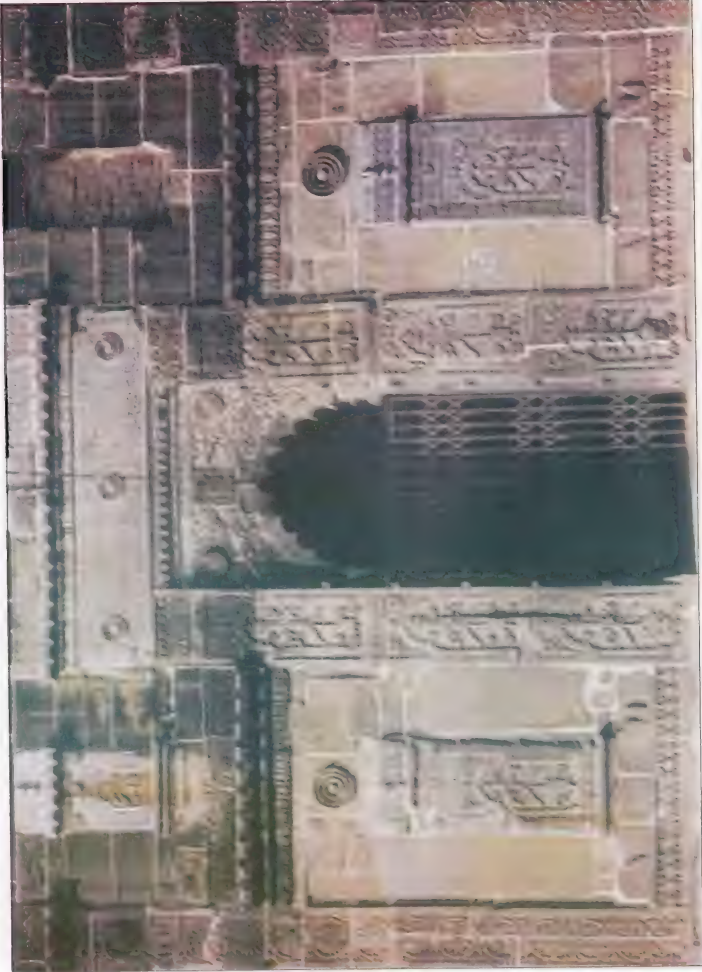
অলংকৃত খিলান, ছোট সোনা মসজিদ (১৬শ শতক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ঈদগাহ (১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ) ধানমণ্ডি, ঢাকা

কোদলা মঠ (১৭ শতক), বাগেরহাট

লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ), ঢাকা

খিয়াং, বৌদ্ধ মঠ, (১৮ শতক), রামু, কক্সবাজার
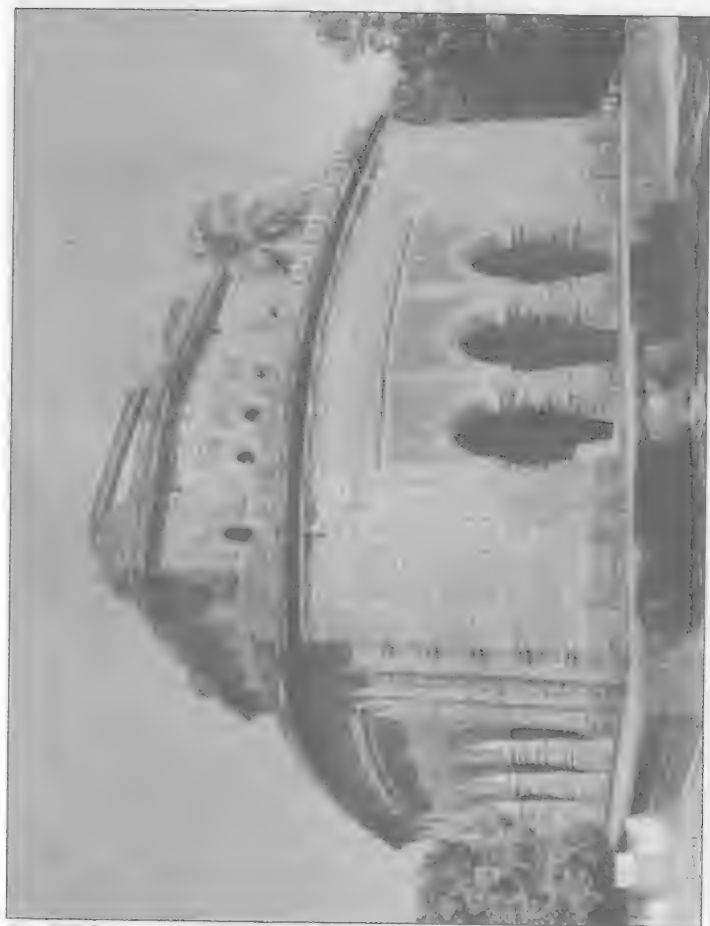
কান্তজি মন্দির (নবরত্ন রীতি) ১৮ শতক, দিনাজপুর
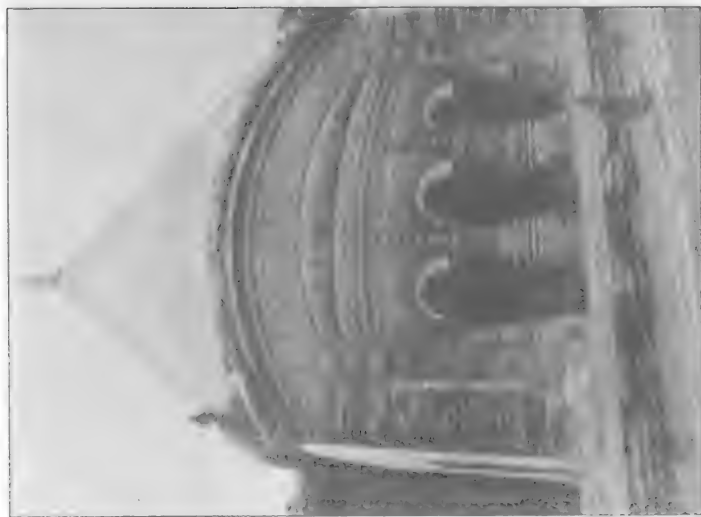
রাসমঞ্চ রথ-মন্দির (১৯ শতক), পুঠিয়া, রাজশাহী

গোপাল মন্দির (চৌচালা রীতি), ১৮ শতক, পুঠিয়া, রাজশাহী

পানামনগর (১৯-২০ শতক)

হাইকোর্ট, ঢাকা

রৌপ্য নির্মিত প্রতিকৃতি (আদি আকৃতি), হোসেনি দালান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

সিলাডন পাত্র (১৮-১৯ শতক), বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

পোর্সেলিন পাত্র (১৮-১৯ শতক), বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বড় কাটরা, মোগল আমল, ঢাকা

সিপাহি বিদ্রোহ

ফোর্ট উইলিয়াম (১৭৩৬)
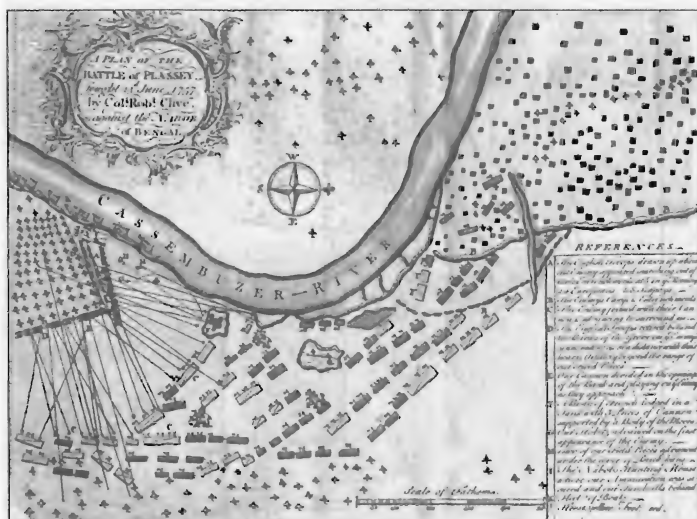
পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রের নক্‌শা

৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্র সমাবেশ

পুলিশী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে '৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে নির্মাণ করা হয় শহীদদের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার

১৯৫৪ সাল : সামনের সারিতে– খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, শরৎচন্দ্র মজুমদার, মাহমুদ আলী, পেছনের সারিতে– হাসিম উদ্দীন আহমদ, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, মশিউর রহমান (যশোর) প্রমুখ

৫৮ সালের মার্শাল ল

২০ মার্চ ১৯৬৬ : ঢাকায় ইডেন হোটেল মাঠে ৬-দফার মঞ্চ থেকে জনগণকে ৬-দফা ব্যাখ্যা করছেন

ঐতিহাসিক ৬-দফাসহ ছাত্র সমাজের ১১-দফার আন্দোলনও প্রবল হতে থাকে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রদের বজ্রকঠিন শপথ (১৯৬৯ সাল)
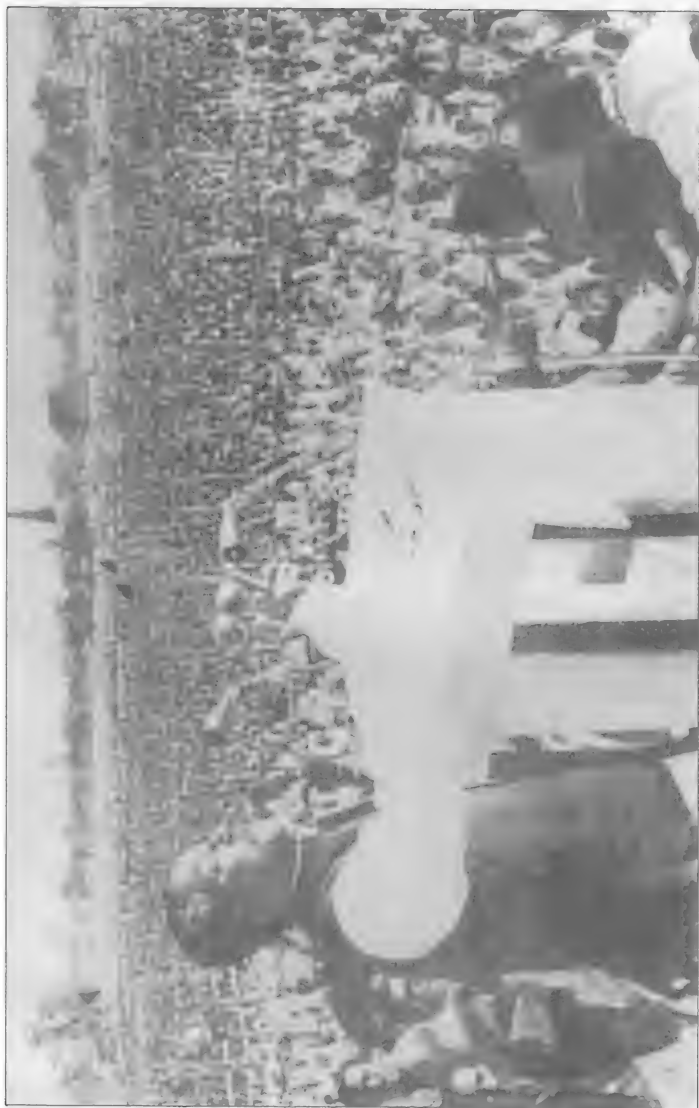
৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের মহাসমুদ্রে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, টাঙ্গাইলে ছাত্র হত্যা, ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার এবং মিলিটারি অত্যাচারের প্রতিবাদে ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে সর্বপ্রথম কলা ভবনে নতুন জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব, জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও জিএস শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে এক বিরাট ছাত্র-জনতার উত্তাল মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে
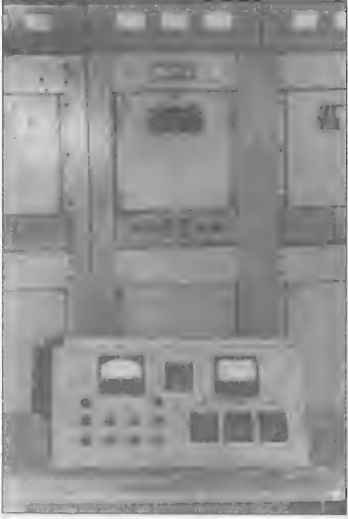
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকাগার কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৬ মার্চ ৭১ দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানের কণ্ঠে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। একই ট্রান্সমিশন যন্ত্রের মাধ্যমে ২৭ মার্চ ৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন মেজর জিয়া

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকাগার চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ভবন

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ : (উপর ও নিচের চিত্র) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। চুয়াডাঙ্গার আম্রকাননে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। পরে এ স্থানের নাম হয় মুজিবনগর। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রি। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করেছিল ধ্বংসযজ্ঞ ও নিধনপর্ব

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: বিকাল সাড়ে ৪টায় আত্মসমর্পণ দলিলে প্রথম স্বাক্ষর দিচ্ছেন পাকবাহিনীর জেনারেল নিয়াজী। পাশে জেনারেল অবোরা পিছনে বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার ও মেজর হায়দারসহ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অফিসারবৃন্দ

শহীদ মিনার

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা – যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে ;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য ;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

বাংলাদেশের সংবিধান (হস্তলিখিত একটি পাতা)

TABVLA
SCYTHIAE EXTRA IMAVM MONTEM PARS
DECIMVS PARALLELVS PER RHODVM
CLIMA QVARTVM
NONVS PARALLELVS
INDIAE
EXTRA
GANGEM
OCTAVVS PARALLELVS PER ALEXANDRIA
CLIMA TERTIVM
SEPTIMVS PARALLELVS
PRASIACA
MANDALAE
INDIA INTRA GANGEM FLVVIVM
PARALLELVS PER SYENEN
COCCONAGAE
CLIMA 2
QVINTVS PARALLELVS
GANGARIDAE
CLIMA 1
INDICVM
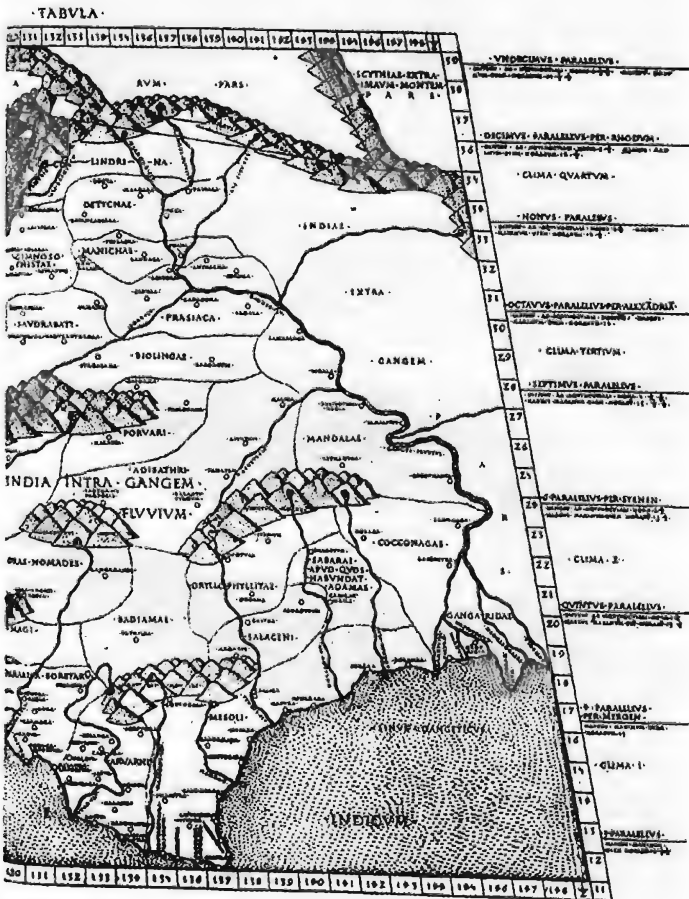
টলেমির মানচিত্র
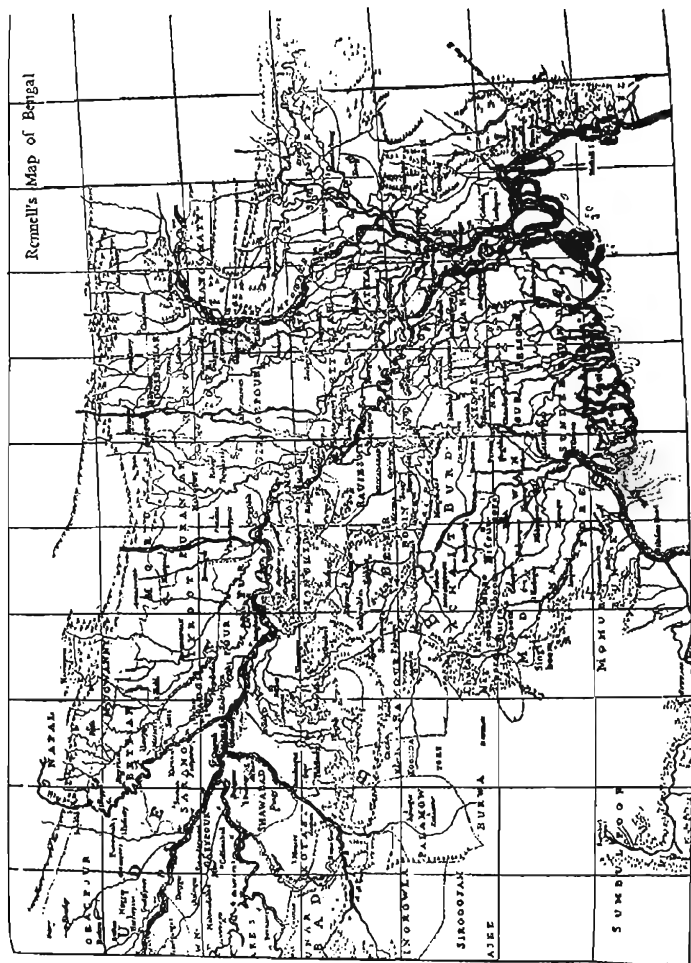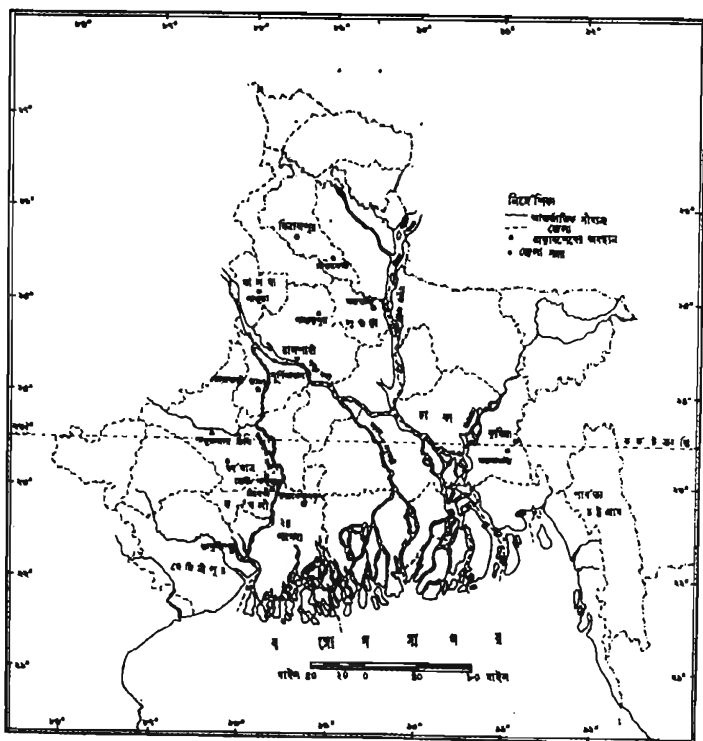
রেনেলের মানচিত্র

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ: প্রত্নাবশেষের অবস্থান
(খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক-খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক)

প্রাচীন বাংলা : সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অবস্থান
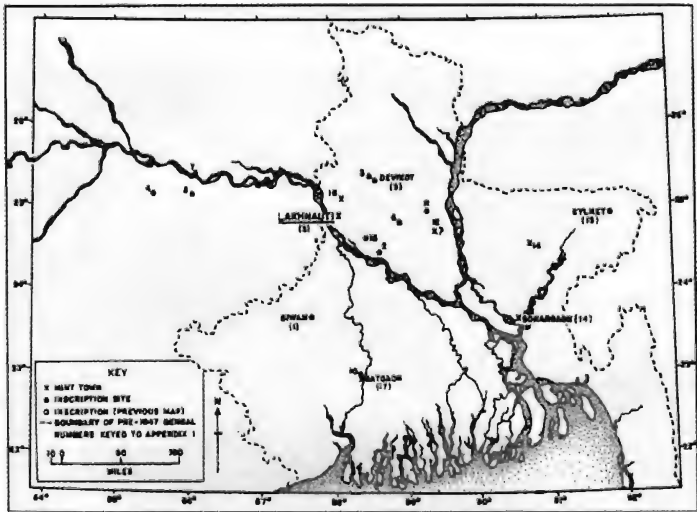
বলবনি শাসক আল-দীন ফিরোজ এবং তাঁর
উত্তরসূরীদের শাসন আমল (১২০৪-৮১, ১২৮১-১৩০০)
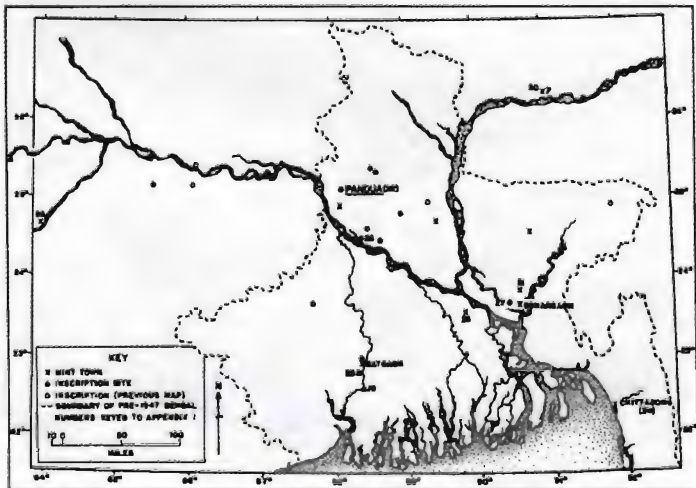
ইলিয়াস শাহ এবং রাজা গণেশের রাজত্বকাল (১৩৪২-১৪৩৩)
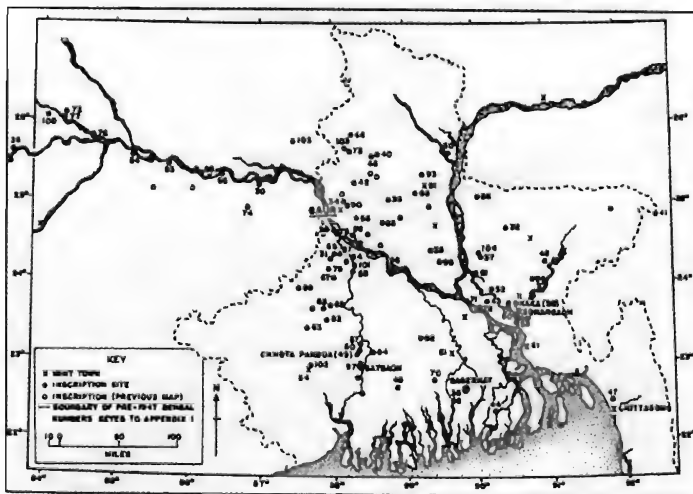
ইলিয়াস শাহ, আবিসিনিয়ান রাজা এবং হুসেন শাহের আমলে
বাংলার মানচিত্র (১৪৩৩-৮৬, ১৪৮৬-৯৩, ১৪৯৩-১৫৩৮)
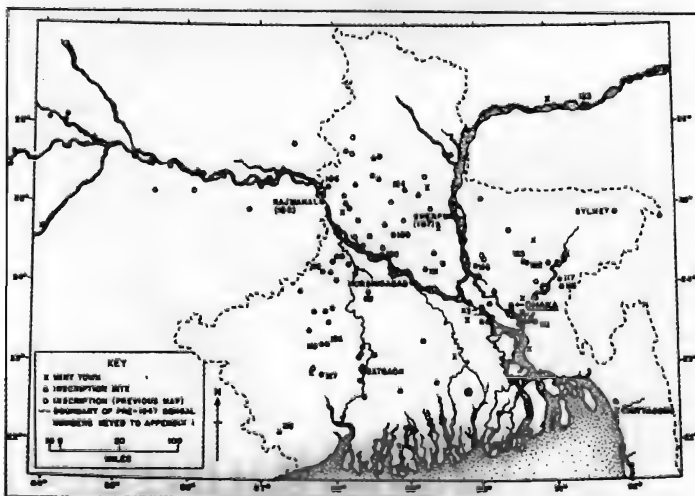
আফগান এবং মোগল শাসনকাল (১৫৩৮-৭৫, ১৫৭৫-১৭৬০)

ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্র

ভূমির উচ্চতা এবং বন্যার গভীরতা
(জুন - অক্টোবর)
০ ৫০ ১০০ ২০০ কিমি
উঃ
মানচিত্র সংকেত
১ পাহাড়ী এলাকা
২ উঁচু সোপান ভূমি
৩ মাঝারি এবং অগভীর বন্যাপ্রবণ ভূমি
৪ মিশ্র মাঝারি, অগভীর এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের বন্যাপ্রবণ ভূমি
৫ মিশ্র মধ্যবর্তী পর্যায়ের এবং ব্যাপক বন্যাপ্রবণ ভূমি
৬ অতিরিক্ত বন্যাপ্রবণ ভূমি
৮৯°০'০" ৯০°০'০" ৯১°০'০" ৯২°০'০"

বাংলাদেশের মানচিত্র

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ও

ক